সূচীপত্র।

তৃতীয় অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

বিষয়		পৃষ্ঠা

সূচীপত্র।

তৃতীয় অধ্যায়

বিষয়		পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

বিষয়		পৃষ্ঠা

ভূমিকা

সদ্‌গুরু ও সাধনতত্ত্ব গ্রন্থ এক বৎসরের উর্দ্ধকাল হইতে কলিকাতা সাম্যপ্রেসে ছাপা হইতেছে। সমগ্র গ্রন্থ ছাপা হইতে আরও এক বৎসর অতীত হইত। পাঠক ও পাঠিকাগণের গ্রন্থপাঠের আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা দেখিয়া প্রকাশক ইহা দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া দুইটি প্রেসে ছাপাইতে আরম্ভ করেন।

প্রথম খণ্ডে ভক্তি-তত্ত্ব, প্রেম-তত্ত্ব, সাধন-তত্ত্ব, দীক্ষা, কলি-পাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ ধর্ম্মের সহিত শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুপাদের প্রচারিত ধর্ম্মের ঐক্য, ঐ ধর্ম্মের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের পার্থক্য এবং আনুষঙ্গিক আর আর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে সদ্‌গুরুর মহিমা, সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুপাদের শিষ্যগণের জীবনে তাঁহার অত্যদ্ভুত লীলা, এবং ধর্ম্মজীবন-লাভের আনুষঙ্গিক দুই-চারিটি কথা এবং প্রচলিত বৈষ্ণবধর্ম্মের কিছু কিছু ত্রুটি বর্ণিত হইল।

গোস্বামী মহাশয়ের অত্যদ্ভুত লীলার ভাণ্ডার, তাঁহার কোন এক শিষ্যের মধ্যে নাই। তাঁহার সমস্ত শিষ্যের জীবনে তাঁহার অদ্ভুত লীলা হইয়াছে, এখনও হইতেছে। এই সমস্ত লীলা সংসার প্রতপ্ত জনগণের হৃৎকর্ণরসায়ন। ইহা শ্রবণ করিলে

অনেকে পরিতৃপ্ত হইবেন এবং অনেকের মধ্যে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হইবে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমি লীলা-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় আমার প্রায় সমস্ত সতীর্থ আমার সহিত একমত হইতে পারেন নাই। এই অবিশ্বাসের যুগে গোস্বামী মহাশয়ের অত্যদ্ভুত কার্য্য জনসমাজে প্রকাশিত হওয়া উচিত নহে মনে করিয়া তাঁহারা আমাকে লীলার ভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে দেন নাই। সুতরাং আমার নিকট অতি সামান্য যাহা কিছু ছিল, তাহাই আমি পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার দিলাম।

আমার নিজের জীবনে শ্রীগুরুদেব যে সমস্ত লীলা করিয়াছেন তাহার অধিকাংশ আমি "মহাপাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুর লীলা" নামক গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছি। এবারও যৎসামান্য কিছু বর্ণন করিলাম। আমার জীবনে এখনও অনেক লীলা হইতেছে। নির্লজ্জের ন্যায় নিজের কথা আর কত লিখিব? সেইজন্য বেশী কিছু লিখিলাম না। তবে এইমাত্র বলিতেছি, আমার ন্যায় একজন নাস্তিক পাষণ্ডকে কেবলমাত্র একটি নাম দিয়া যে বৈষ্ণব করিয়া তুলিয়াছেন ও অতীব গুরুতর অপ্রাকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করাইয়াছেন ইহা অপেক্ষা প্রভুর অত্যদ্ভুত লীলা আর কি হইতে পারে?

আশা করি ভক্তিমান পাঠক ও ভক্তিমতী পাঠিকাগণ দ্বিতীয় খণ্ড পাঠে তৃপ্তিলাভ ও জীবনে উপকৃত হইবেন।

আমি এই গ্রন্থ রচনা করিয়া বন্ধুবর অঘোরনাথ চট্টোপা-

ধ্যায়কে পুস্তক সম্পাদন ও মুদ্রণের ভার দিয়াছিলাম। গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি আবশ্যক মত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন কিন্তু অসুবিধা বশতঃ প্রুফ দেখিতে পারেন নাই। আমাকেই প্রুফ সংশোধনের ভার লইতে হইয়াছিল। নূতন প্রেস, নূতন লোক একারণ ছাপাকার্য্যে কিছু কিছু বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে, সহৃদয় পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

শ্রীহরিদাস বসু।

প্রকাশকের নিবেদন

বন্ধুবর গ্রন্থকার "সদ্‌গুরু ও সাধনতত্ত্ব" গ্রন্থ রচনা করিয়া সমগ্র গ্রন্থখানি সম্পাদন মুদ্রণ ও প্রকাশ করিবার জন্য আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। আমি যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া উহা সংশোধন করিয়া দিয়াছি।

আমি নিজে উহার প্রুফ সংশোধন করিয়াছি কিন্তু মধ্যে মধ্যে পীড়িত হওয়ায় কোন কোন ফর্ম্মার প্রুফ নিজে দেখিতে পারি নাই, একারণ কিছু কিছু বর্ণাশুদ্ধি থাকিয়া গিয়াছে।

ছাপার কার্য্যে অত্যন্ত বিলম্ব ঘটায় ও পাঠকপাঠিকাগণ পুস্তক পাঠ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হওয়ায়, পুস্তকখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রেসে ছাপাইতে বাধ্য হইয়াছি।

দ্বিতীয় খণ্ড শান্তিনিকেতন প্রেসে ছাপা হইয়াছে। আমি নিকটে না থাকায় উহার প্রুফ সংশোধন করিতে পারি নাই, একারণ দ্বিতীয় খণ্ডে অনেক বর্ণাশুদ্ধি ও ছাপার ভুল থাকিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামধর্ম্ম, তাঁহার সহিত প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সদ্‌গুরু প্রচারিত ধর্ম্মের একতা, সদ্‌গুরু মহিমা ও লীলা, বর্ত্তমান বৈবষ্ণধর্ম্মের ত্রুটি ও আনুষঙ্গিকরূপে আর আর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

প্রচলিত বৈষ্ণবধর্ম্মের ত্রুটি এই গ্রন্থে বর্ণিত হওয়ায় কেহ কেহ দুঃখিত ও বিরক্ত হইতে পারেন।

"সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"

সত্য কথা বলিবে, প্রিয় কথা বলিবে, অপ্রিয় সত্য বলিবে না, ইহাই নীতি বাক্য। যেখানে অপ্রিয় সত্য না বলিলে চলে সেখানে না বলাই কর্ত্তব্য। কিন্তু যেখানে সত্য কথা বলা প্রয়োজন, সেখানে সে কথা অপ্রিয় বলিয়া কি চুপ করিয়া থাকা উচিত ?

আবশ্যক স্থানে সত্য না বলিলে সত্য জয়যুক্ত হয় না অসত্যেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এই জন্য গ্রন্থকারকে বাধ্য হইয়া কিছু কিছু অপ্রিয় সত্য কথা লিখিতে হইয়াছে।

গ্রন্থকার বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বহু অবস্থার ভিতর দিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার গুরু বৈষ্ণব, তিনিও একজন-বৈষ্ণব। বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নতি ও প্রচারের জন্য চারিদিকে আন্দোলন হইতেছে দেখিয়া তিনি বড়ই প্রীত হইয়াছেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নতি হয়, ত্রিতাপদগ্ধ লোকসকল এই ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় শান্তিলাভ করে, ইহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামধর্ম্ম চাপা পড়িয়া গিয়াছে, ইহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হইলে বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নতির আশা নাই। একারণ তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামধর্ম্ম ও তাহার সহিত বর্ত্তমান বৈষ্ণবধর্ম্মের পার্থক্য দেখাইতে বাধ্য হইয়াছেন।

যে সকল ত্রুটির জন্য বৈষ্ণবগণ বহু সাধন করিয়াও উপযুক্ত অবস্থা লাভ করিতে অসমর্থ হইতেছেন, গ্রন্থকার সেই ত্রুটিগুলি দেখাইয়া দিয়াছেন।

পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে দেশ দিন দিন ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমভক্তির উপর শিক্ষিত সমাজের আস্থা নাই। এই প্রেমভক্তিকে তাঁহারা ভাবপ্রবণতা বলেন এবং নানা প্রকারে ইহাতে দোষারোপ করেন।

তাঁহারা বলেন, এই ভাবপ্রবণত-প্রাযুক্ত শেষাবস্থায় মহাপ্রভুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইয়াছিল, ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়াছিল এবং বহু ক্লেশ ভোগ করিয়া তাঁহাকে আকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছিল।

শিক্ষিত সমাজের এইরূপ ভুল ধারণা দেশের পক্ষে কল্যাণকর নহে। একারণ গ্রন্থকার শিক্ষিত সমাজের ভুল ধারণা দূর করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত প্রেমভক্তির কথা লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন।

প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে কোন কথা কহিলে লোকে চটিয়া যায়। প্রাণের বন্ধুও পর হয়। একারণ সহৃদয় পাঠকগণকে বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছি যেন সংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরপেক্ষভাবে এই পুস্তক পাঠ করেন। নিবেদন ইতি।

নিবেদক
শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।
নলহাটি ই, আই, আর, লুপ লাইন।

২৯শে কার্ত্তিক ১৩২৬।

সদ্‌গুরু ও সাধনতত্ত্ব

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

———০———

প্রথম পরিচ্ছেদ।

———ঃ———

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের কটাক্ষ।

যদিও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধা ভক্তিই গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্ম, যদিও তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম যথাশাস্ত্র পালন করিয়া গিয়াছেন, তথাপি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় তাঁহার প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। গোস্বামী মহাশয়ের বেশ, তাঁহার দীক্ষা-প্রদান, ও সাধন-প্রণালী দেখিয়া বৈষ্ণবগণ মনে করিতেন, তাঁহার পন্থা স্বতন্ত্র; শ্রীমন্মহাপ্রভুর পন্থা নহে। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণকে দেখিয়াও তাঁহারা মনে করেন, ইঁহাদের স্বতন্ত্র পন্থা। এই ধারণা যে তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রমমূলক, তাঁহারা নিজেই যে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা আমি ক্রমে ক্রমে দেখাইব। সাম্প্রদায়িকতার দারুণ বিষ মহাপ্রভুর ধর্ম্মকে বৈষ্ণব-সমাজ হইতে একবারে বিতাড়িত করিয়াছে, এই জন্যই গোস্বামী মহাশয়ের আবির্ভাব ও ধর্ম্মসংস্থাপন।

ভেকাশ্রিত না হইলে বৈষ্ণবেরা কোন সাধুকেই সাধু বলিয়া মনে করেন না। গোস্বামী মহাশয় ভেকাশ্রিত হন নাই, সুতরাং বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে কেমন করিয়া সাধু বলিয়া মনে করিবেন? শ্রীবৃন্দাবনের গৌরদাস শিরোমণি মহাশয়ের ন্যায় সাধুপুরুষও তাঁহাকে ভেকাশ্রিত হইবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন। মহাপুরুষগণ অশাস্ত্রীয় কোন কায করেন না। তাঁহারা শাস্ত্রের মর্য্যাদা কখনও লঙ্ঘন করেন না। ভেক গ্রহণ করিবার শাস্ত্রীয় বিধান নাই। সনাতনের পূর্ব্ব বেশ পরিত্যাগ ও নূতন বেশ ধারণ হইতে ভেকের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কাশীধামে শ্রীসনাতন মিলন এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।—

"তবে বারাণসী আইলা গোসাঞি কত দিনে।
শুনি আনন্দিত হইলা প্রভু আগমনে॥
চন্দ্রশেখরের ঘরে আসি দুয়ারে বসিলা।
মহাপ্রভু জানি চন্দ্রশেখরে কহিলা॥
দ্বারে এক বৈষ্ণব হয় বোলাহ তাহারে।
চন্দ্রশেখর দেখে বৈষ্ণব নাহিক দুয়ারে॥
দ্বারেতে বৈষ্ণব নাহি প্রভুরে কহিল।
কেহ হয়? করি প্রভু তাহারে পুছিল॥
তিঁহ কহে এক দরবেশ আছে দ্বারে।
তাঁরে আন প্রভু বাক্যে কহিল আসি তাঁরে॥
প্রভু তোমারে বোলায় আইস দরবেশ।
শুনি আনন্দে সনাতন করিলা প্রবেশ॥
তাঁহারে অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাঞা আইলা।
তাঁরে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হইলা॥
প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হইলা সনাতন।

মোরে না ছুঁইও কহে গদগদ বচন ॥
দুইজনে গলাগলি রোদন অপার।
দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার ॥
তবে প্রভু তাঁরে হাতে ধরি লইয়া গেলা।
পিড়ির উপর আপন পাশে বসাইলা ॥
শ্রীহস্ত করেন তাঁর অঙ্গ সম্মার্জ্জন।
তিঁহো কহে মোরে প্রভু না কর স্পর্শন ॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে ॥
"তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি গাই তোমার গুণ।
সর্ব্বেন্দ্রিয় ফল এই শাস্ত্র নিরূপণ ॥
এত কহি কহে প্রভু শুন সনাতন।
কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিতপাবন ॥
মহারৌরব হইতে তোমারে করিল উদ্ধার।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার ॥
সনাতন কহে কৃষ্ণ আমি নাহি জানি।
আমার উদ্ধার হেতু তোমা কৃপা মানি ॥
কেমনে ছুটিলা বলি প্রভু প্রশ্ন কৈলা।
আদ্যোপান্ত সব কথা তিঁহ শুনাইলা ॥
প্রভু কহে তোমার দুই ভাই প্রয়াগে মিলিলা।
রূপ অনুপম দোঁহে বৃন্দাবন গেলা ॥
তপন মিশ্রেরে আর চন্দ্রশেখরে।
প্রভু আজ্ঞায় সনাতন মিলিলা দোহারে ॥
তপন মিশ্র তবে তারে কৈলা নিমন্ত্রণ।

প্রভু কহে ক্ষৌর করাহ, যাহ সনাতন ॥
চন্দ্রশেখরেরে প্রভু কহে বোলাইয়া।
এই বেশ দূর কর, যাহ ইহা লঞা ॥
ভদ্র করাইয়া তাঁরে গঙ্গাস্নান করাইল।
শেখর আনিয়া তাঁরে নূতন বস্ত্র দিল ॥
সেই বস্ত্র সনাতন না কৈল অঙ্গীকার।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার ॥
মধ্যাহ্ন করি প্রভু গেলা ভিক্ষা করিবারে।
সনাতনে লঞা গেলা তপন মিশ্রের ঘরে ॥
পাদ প্রক্ষালন করি ভিক্ষাতে বসিলা।
সনাতনে ভিক্ষা দেহ মিশ্রেরে কহিলা ॥
মিশ্র কহে সনাতনের কিছু কৃত্য আছে।
তুমি ভিক্ষা কর, প্রসাদ তাঁরে দিব পাছে ॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু বিশ্রাম করিলা।
মিশ্র প্রভুর শেষ পাত্র সনাতনে দিলা ॥
মিশ্র সনাতনে দিল নূতন বসন।
বস্ত্র নাহি নিল তিঁহো কৈলা নিবেদন ॥
মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন।
নিজ পরিধান এক দেহ পুরাতন ॥
তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিল।
তিহ দুই বহির্বাস কৌপীন করিল ॥'১

চৈ চ ম, ২০ প,

সনাতনের এই বেশ ধারণ হইতে ভেকের সৃষ্টি। এখন ভেক না লইলে বৈষ্ণবসমাজে সাধু বলিয়া পরিগণিত হইবার উপায় নাই। সনা-

তনের এই বেশ ধারণের পূর্ব্বেই কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়াছিলেন।

সন্ন্যাসগ্রহণই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ভেকাশ্রিত হন নাই।

"চব্বিশ বৎসরের শেষ যেই মাঘ মাস।
তার শুক্ল পক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥

চ চ, ম, ৩, প,

গোস্বামী মহাশয় যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িকতার বিষে বৈষ্ণবগণ জর্জ্জরিত হওয়ায় তাঁহারা এখন সন্ন্যাসের নাম শুনিলে চমকিয়া উঠেন। কিন্তু মহাপ্রভু স্বয়ং যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা একবারও ভাবেন না। তাঁহারা মনে করেন সন্ন্যাস অদ্বৈতবাদিগণের গ্রহণীয়।

গোস্বামী মহাশয়ের প্রতি অনাস্থায় আর একটি কারণ এই যে, তাঁহার পরিধানে গৈরিক বসন ও মস্তকে জটাভার। গৈরিক বসন যে সন্ন্যাসীর পরিধেয় তাহার আর কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। সন্ন্যাসিমাত্রেরই গৈরিক বসন পরিধান করা কর্ত্তব্য। এই বসন পরিধান করিবার আর কাহারও অধিকার নাই। গৃহস্থগণের পক্ষে ইহা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। গৈরিক বসনে রেতঃপাত হইলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবার ব্যবস্থা আছে।

মহাপ্রভু স্বয়ং গৈরিক বসন পরিধান করিতেন, একথাটা বৈষ্ণবগণ এখন আর মনোমধ্যে স্থান দেন না। শান্তিপুরে মহাপ্রভুর আগমন হইলে কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করিতেছেন—

"শান্তিপুরের লোক শুনি প্রভুর আগমন।
দেখিতে আইলা লোক প্রভুর চরণ॥

হরি হরি বলে লোক আনন্দিত হঞা।
চমৎকার পাইল প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া॥
গৌর দেহ কান্তি, সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
অরুণ বস্ত্র কান্তি তাহে করে ঝলমল॥"

চৈ চ, ম, ৩, প,

দশনামা সন্ন্যাসিমাত্রেই গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন। যদি বৈষ্ণবেরা তাহাই পরিধান করিবে, তবে তাঁহাদের সহিত বৈষ্ণবগণের পার্থক্য থাকে কৈ? এই পার্থক্য বজায় রাখিবার জন্য বৈষ্ণবগণ গৈরিক বসন পরিত্যাগ করিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি ব্যতীত বৈষ্ণবগণের গৈরিক বসন পরিত্যাগ করিবার আরও একটা কারণ আছে। সনাতন গোস্বামী জগদানন্দ পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন—

"রক্তবস্ত্র বৈষ্ণব পরিতে না যুয়ায়।
কোন প্রদেশিকে দিব কি কাজ ইহায়॥"

চৈ চ, অ, ১৩,

এই পাঠ হইতেই গৈরিক বসন ত্যাগ হইল। রক্তবস্ত্র মানে "গৈরিক বসন" নহে, লাল কাপড়। গৈরিক সম্পূর্ণ আলাহিদা জিনিষ। তাহা না হইলে মহাপ্রভু কখনও গৈরিক পরিধান করিতেন না। মহাপ্রভু অশাস্ত্রীয় কায করিয়াছেন, একথা কখনও বৈষ্ণবেরা বলিতে পারেন না। সুতরাং গোস্বামী মহাশয়ের গৈরিক বস্ত্র পরিধান অশাস্ত্রীয় কার্য্য নহে।

গোস্বামী মহাশয়ের গৈরিকগ্রহণ যেমন বৈষ্ণবগণের কটাক্ষের কারণ, তাঁহার রুদ্রাক্ষের মালা ধারণও তদ্রূপ। রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ বৈষ্ণবগণ সহ্য করিতে পারেন না, কারণ উহা শাক্তগণের ব্যবহার্য্য। যাহা শাক্তগণের ব্যবহার্য্য, তাহা বৈষ্ণবগণের অবশ্য পরিত্যজ্য। ইহা সাম্প্রদায়িক-

বুদ্ধি। মহাত্মাগণ কখনও অশাস্ত্রীয় কায করেন না। শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা করা তাঁহাদের জীবনের একটি বিশেষ কায। হরিভক্তিবিলাসে রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য বলিয়া লিখিত আছে। রুদ্রাক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবগণ শাস্ত্রের শাসন অমান্য করিতেছেন। শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই গোস্বামী মহাশয়ের রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ।

বেশের সহিত মহাত্মাগণের কোন সম্বন্ধ নাই। লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য বা নিজের কোন অভিসন্ধি-সাধনের জন্য তাঁহারা কোন কায করেন না। তাঁহাদের কোন বাসনা নাই, কোন অভিসন্ধিও নাই। তাঁহারা আত্মারাম। তাঁহারা বিধিব্যবস্থার অতীত। তাঁহাদের আচরণই শাস্ত্র। তথাপি, সমাজরক্ষা, শাস্ত্রের মর্য্যাদারক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য তাঁহারা শাস্ত্র-শাসন মানিয়া চলেন এবং সদাচার পালন করেন। তাঁহাদের আচরণে কখনও ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জটা-ধারণ

গোস্বামী মহাশয় মায়াতীত সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়া যখন প্রেমভক্তি বিতরণ করিতেছিলেন, তখন সকল সম্প্রদায়ের সাধুগণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আসিতেন, ধর্ম্মালাপ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন এবং পরমানন্দে তাঁহার মধুর সহবাসসুখ সম্ভোগ করিতেন।

নানকপন্থিগণ তাঁহাদের সাধনের কথা গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেন, গোস্বামী মহাশয় তাঁহাদিগকে তাঁহাদের পন্থা বলিয়া দিতেন, রামায়েত সাধুগণকে তাঁহাদের সাধনের প্রণালীর উপদেশ দিতেন, শাক্ত-গণ জিজ্ঞাসু হইলে তাঁহাদের সাধনের ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিতেন। শাক্তগণের উপাসনার জন্য তিনি সময়ে সময়ে সুরা আনাইয়া নিজে শোধন

করিয়া দিতেন। গোস্বামী মহাশয়ের নিকট মুসলমান সম্প্রদায়ের সাধু ফকিরগণও আসিয়া মহা তৃপ্তি লাভ করিতেন। গোস্বামী মহাশয়ের প্রতি ইঁহাদের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি ছিল না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সম্প্রদায়িক বুদ্ধি এতই প্রবল যে তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের সংস্পর্শে আসিতে পারিলেন না। গোস্বামী মহাশয়ের গেরুয়া বসন যেমন তাঁহাদের চক্ষু-শূল হইল, জটাভারও তেমনি তাহাদের অশ্রদ্ধার কারণ হইল। বৈষ্ণবগণের জানা উচিত যে, জটাধারণ বৈষ্ণবের নিষিদ্ধ নহে। বৈষ্ণব গুরু প্রণালী মতে সর্ব্বপ্রধান গুরুগণের জটা ছিল। ব্রহ্মার এবং শুকদেবের জটা ছিল। অধিক কি যাঁহার দোহাই দিয়া বৈষ্ণব-সমাজ চলিয়া আসিতেছে, সেই কলি-পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুরও জটা ছিল। এখন সে কথাটা চাপা পড়িয়া আছে। সন্ন্যাসের পর আর তাঁহার ক্ষৌর-কার্য্য হয় নাই। তাঁহার মস্তকে জটাভার ছিল। সংকীর্ত্তনের সময় তাঁহার জটা উর্দ্ধদিকে খাড়া হইয়া দাঁড়াইত। গোবিন্দ দাসের কড়চা পাঠ করিলে এই সব বর্ণনা দেখিতে পাইবেন। এসব কথা এখন চাপা পড়িয়া গিয়াছে। যোগিগণ জটা রাখেন, [illegible] ইহা বৈষ্ণবগণের পরিত্যাজ্য হইয়াছে।

সনাতনের ভদ্রবেশ হইতে যখন ভেকের প্রবর্ত্তন হইয়াছে, সেই সময় হইতেই গেরুয়া বসন ও জটা বৈষ্ণবসমাজ হইতে বিদায় লইয়াছে। সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির নিকট শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা পায় না।

পাঠক মহাশয়, জটা সামান্য বস্তু নহে, জটার মহিমা কে বুঝিবে? দেবাদিদেব মহাদেব এই জটা আপন শিরে ধারণ করিয়াছেন এবং ত্রিলোকপাবনী সুরধুনী এই জটার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

পতিতপাবনী গঙ্গাদেবী গঙ্গাধরের জটার মধ্যে প্রবাহিতা। এই কথাটা আমরা শাস্ত্রপাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছি, কেহ কখনও প্রত্যক্ষ

করি নাই। এবার কিন্তু একথাটা প্রত্যক্ষ করিলাম। আমাদের গঙ্গাধরের জটার মধ্যে পতিতপাবনী সত্য সত্যই প্রবাহিতা ছিলেন।

গোস্বামী মহাশয় আদৌ স্নান করিতেন না। কেবল বৎসরের মধ্যে মহাষ্টমীর দিন একবার গঙ্গাস্নান করিতেন। তাঁহর জটা সর্ব্বদাই শুষ্ক থাকিত, কিন্তু নিঙ্গাড়াইবা মাত্র তাহা হইতে জলকণা বহির্গত হইত। এজল কোথা হইতে কি প্রকারে আসিত, কেহ ঠিক করিতে পারিত না। গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

পাঠক মহাশয়গণ আপনারা মহাত্মা অর্জ্জুন দাসের নাম শুনিয়াছেন কি? তিনি একজন মায়াতীত মহাপুরুষ। তিনি অনিকেত পাগলের ন্যায় নানা স্থানে বিচরণ করিয়া থাকেন। লোকে তাঁহাকে চিনিতে পারে না। তাঁহার অনুসরণও কেহ করিতে পারে না। তিনি এই বর্ত্তমান রহিয়াছেন, আবার পরক্ষণেই নাই। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা অথচ অনেক করিয়াও ইঁহার পাণ্ডিত্যের কোন পরিচয় পাইবেন না। সমস্ত তত্ত্ব ইঁহার নিকট প্রকাশিত। ইঁহার কোন বেশ নাই। ইনি বিধিনিষেধের অতীত। যাঁহারা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের "কুম্ভমেলা" নামক পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই মহাত্মার কিছু পরিচয় পাইয়া থাকিবেন।

এই মহাত্মা গোস্বামী মহাশয়কে দেখিয়া বলিতেন, "হাম বহুত সাধু দেখা, মগর য়্যাসী সাধু হাম কভি দেখা নেহি। বৈঠ্‌ আদমিকো নাম সমাধি হোতা নেই, এ সাধু হরদম্‌ নাম সমাধি মে রহতা হ্যায়। ক্যা জটা হ্যায়? রামজী কিষণজী এহি জটাকা সেবা করতা হ্যায়।"

রামজী কিষণজী যে গোস্বামী মহাশয়ের জটার সেবা করিতেন, ঘটনা তিনি দিব্য চক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহার নিকট কিছু অবিদিত ছিল না।

অধ্যাত্মরাজ্যের ব্যাপার আমরা কি বুঝিব? আমাদের নিকট

সকলই প্রহেলিকা। কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত ভাব বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

"বলিবার কথা নয়, তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কেবা পাতি যায়"

আমিও বলিতেছি, যে এসব কথা বলিবারও নয়, বিশ্বাস করিবারও নয়। তবে ঘটনাটা প্রকৃত এই জন্য বলিবার অযোগ্য হইলেও বলিলাম, যাঁহার বিশ্বাসবৃত্তি স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে তিনিই কেবল ইহা বিশ্বাস করিতে পারিবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মন্ত্রপ্রদান

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ গোস্বামী মহাশয়ের বেশের উপরই যে কেবল কটাক্ষ করিয়া থাকেন, তাহা নহে, তাঁহারা তাঁহার মন্ত্রপ্রদান ও সাধন-প্রণালীর উপরও কটাক্ষ করেন। বর্ত্তমান বৈষ্ণব আচার্য্যগণ শিষ্যগণকে প্রায়ই কামবীজ কামগায়ত্রী যুগলমন্ত্র ইত্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন। গোস্বামী মহাশয় শিষ্যগণকে এ সকল কিছুই প্রদান করিতেন না। ধ্যান বা পূজার কোন বিধান করিতেন না। ব্রত নিয়ম স্তবপাঠ ইত্যাদির কোন ব্যবস্থা করিয়া দিতেন না। এই সকল কারণে বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন, গোস্বামী মহাশয়ের দীক্ষাপ্রদান বৈষ্ণব দীক্ষা নহে।

যে সকল মন্ত্র জপ করিয়া মানুষ ভগবানকে লাভ করিয়াছেন, সেই সকল মন্ত্রকে সিদ্ধমন্ত্র কহে। সেই সকল মন্ত্র গোস্বামী মহাশয় শিষ্য-গণকে প্রদান করিতেন; নামের সহিত নামীকে বর্ত্তমান করিয়া দিতেন। নাম করিতে পারিলে ব্রত নিয়ম স্তবপাঠ পূজা ইত্যাদির কোন প্রয়োজন

হয় না। মানুষ নাম করিতে পারে না বলিয়াই এ সব লইয়া থাকে। ইহা দ্বারা ধর্ম্মভাব বজায় থাকে ও শরীর সাধন-উপযোগী হয়; বৃথা চিন্তায় কালযাপন করিতে হয় না। যাঁহারা অধিক সময় নাম করিতে পারেন না, তাঁহাদের পক্ষে পূজাপাঠাদিতে কালক্ষেপ করা কর্ত্তব্য; গোস্বামী মহাশয় এই সকলের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি স্বয়ং প্রতিদিন প্রায় সাত আট ঘণ্টাকাল শাস্ত্রপাঠ করিতেন ও শুনিতেন। কেবল শিষ্যগণের অবস্থা ভাবিয়া প্রত্যক্ষভাবে কোন আদেশ করেন নাই। আমি এক্ষণে বেশ উপলব্ধি করিতেছি, যাঁহারা নাম করিতে সমর্থ তাঁহাদের এ সব কার্য্যে বৃথা সময় নষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে। নামেই শক্তি আছে, নাম হইতেই জীবের উদ্ধার হইয়া থাকে; নাম পরিত্যাগ করিয়া পূজা-পাঠাদিতে সময়ক্ষেপণ সময়ের অপব্যবহার মাত্র।

দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যে সকল সিদ্ধমন্ত্র শিষ্যগণকে প্রদান করিয়াছেন, যে সকল মন্ত্র জপ করিয়া প্রহ্লাদ নারদ প্রভৃতি ভক্তগণ ভগবানকে লাভ করিয়াছেন, গোস্বামী মহাশয় কর্তৃক সেই সকল মন্ত্র প্রদান যদি বৈষ্ণব দীক্ষা না হয়, তবে আর বৈষ্ণব দীক্ষা কি হইবে? যাহারা শাস্ত্র জ্ঞানহীন, যাহারা বৈষ্ণবতত্ত্ব বুঝে না, তাহারাই এইরূপ দুঃসাহসিক অশাস্ত্রীয় কথা বলিতে পারে। বর্ত্তমান বৈষ্ণব আচার্য্যগণ সিদ্ধমন্ত্র সকল ব্যবহার করেন না, এই জন্যই ইঁহারা এরূপ কথা বলিয়া থাকেন। ইঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইষ্টমন্ত্র কি ছিল। তিনি ঈশ্বর পুরীর নিকট দশাক্ষরী মন্ত্র লাভ করিয়া তাহাই সাধন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগলমন্ত্রের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। তাঁহার সম-সাময়িক বৈষ্ণবগণও ইহা ব্যবহার করিতেন না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের দীক্ষা অভিনব ব্যাপার। ইঁহারা যুগল-মন্ত্রের

অত্যন্ত পক্ষপাতী। ইঁহাদের মধ্যে আবার গৌরবাদিগণ কিন্তু গৌরবাদ-মন্ত্রের অত্যন্ত পক্ষপাতী। অনেক দিন হইতে বৈষ্ণবসমাজে ঘোর দলাদলি উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গবাদিগণ শ্রীগৌরাঙ্গ-উপাসনার পক্ষপাতী; তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ-উপাসনার পৃথক মন্ত্র ও সাধনপ্রণালীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ তাহা অস্বীকার করায় এই দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে। বহুকাল হইতে মিলনের চেষ্টা হইয়া আসিতেছে, কিন্তু মিলনের কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। উভয় দলই প্রবল। আচার্য্যগণ ও গোস্বামিগণ আপনাদের সুবিধা বুঝিয়া উভয় দলেই সমবেত।

যে স্থানে প্রকৃত ধর্ম্ম নাই, কেবল মতের ধর্ম্ম বর্ত্তমান, সেইখানেই দলাদলি। উভয় দলই প্রকৃত ধর্ম্ম হারাইয়া বসিয়াছে; সত্যের আলোক অপসারিত হইয়াছে; সুতরাং অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়া উভয় দল মারামারি করিয়া মরিতেছে। উভয় দলই আপন আপন মত সমর্থন করিতেছে। সত্য ইহাদের নিকট আচ্ছাদিত।

আমরা এই গ্রন্থের নানা স্থানে বলিয়াছি, সাম্প্রদায়িকতা বা দলবুদ্ধি ধর্ম্মের ঘোর অনিষ্টকর। সাম্প্রদায়িকতা-বিষে জর্জ্জরিত হওয়ায় ইঁহারা পরস্পরকে মর্য্যাদা দিতে পারিতেছেন না। ইঁহাদের বিচারশক্তিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রতিপক্ষের কথা ইঁহাদের মনে স্থান পায় না।

গোস্বামী মহাশয়ের দীক্ষা ইঁহাদের সাম্প্রদায়িক মতের অনুগত নহে, কেবল এই জন্যই ইঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের মন্ত্রপ্রদানকে অবৈষ্ণব দীক্ষা বলিয়া থাকেন। শাস্ত্রের ব্যবস্থা ইঁহাদের নিকট পরিত্যাজ্য। মতের গণ্ডীর মধ্যে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার প্রবেশাধিকার নাই। মতের নিকট জ্ঞান ও শাস্ত্র পরাস্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাধন-প্রণালী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় গোস্বামী মহাশয়ের সাধন-প্রণালীর উপরও কটাক্ষ করিয়া থাকেন। গোস্বামী মহাশয় মালা জপ করিতেন না, তাঁহার শিষ্যগণও মালা জপ করেন না, তাঁহাদের জপের মালা নাই ঝুলি নাই, এটা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে বিসদৃশ ব্যাপার।

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের অধিকাংশ লোকই ইংরাজিশিক্ষিত, তাঁহারা আদালতে চাকরী করিয়া বা ওকালতী, ডাক্তারী, শিক্ষকতা ব্যবসা ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া গার্হস্থ্য জীবন যাপন করেন। তাঁহাদের কোন প্রকার সাধুর বেশ নাই; একারণ ইঁহাদের যে সাধনভজন আছে, ইঁহারা যে ধর্ম্মজীবন যাপন করেন, একথাটা লোকে টের পায় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ইঁহাদিগকে অবৈষ্ণব বলিয়া মনে করেন এবং শিষ্যগণের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের গুরুর প্রতিও তাঁহাদের ঐ রূপ একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে।

বৈষ্ণবগণের শীর্ষস্থানীয় প্রভুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম বা অবৈষ্ণব হইলে, বৈষ্ণবগণের মর্ম্মযাতনার কি সীমা থাকে? গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্ম হওয়ায় শান্তিপুরবাসী গোস্বামী-বংশীয়েরা ও জনসাধারণ এবং সাধারণ বৈষ্ণবসম্প্রদায় তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য শান্তিপুরে এক ষড়যন্ত্র করিল। কেবল গোস্বামী মহাশয়ের আত্মীয় কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বাধা দেওয়ায় শান্তিপুরবাসিগণের এই দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না।

যাহা হউক গোস্বামী মহাশয় যখন সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিলেন, শাস্ত্র ও সদাচার রক্ষা করিতে লাগিলেন, দুই হাতে

প্রেম ভক্তি বিতরণ করিতে লাগিলেন, তখনও বৈষ্ণবগণ তাঁহার প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। যেমন শ্বেত ডোর-কৌপীনের অভাবে তাঁহাকে অবৈষ্ণব মনে করিলেন, তেমনি ঝুলি মালা না থাকায়—আধা ব্রাহ্ম আধা হিন্দু, কিম্ভূত-কিমাকার বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। শ্বাসে শ্বাসে নাম করা বৈষ্ণব ধর্ম্মের ব্যবস্থা নহে, গোস্বামী মহাশয় ও তাঁহার শিষ্যগণ শ্বাসে শ্বাসে নাম করিয়া থাকেন সুতরাং গোস্বামী মহাশয় বা তাঁহার শিষ্যগণ বৈষ্ণব হইতে পারেন না। বৈষ্ণবতা কেবল ভাণ মাত্র গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্ম বৈষ্ণব ধর্ম্ম নহে, মহাপ্রভুর ধর্ম্ম নহে, ইহা একটা মনগড়া প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্মধর্ম্ম। ইহাই বৈষ্ণবগণের ধারণা হইল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম কি, তাহা বৈষ্ণবগণ জানেন না। ইঁহারা মনে করেন যে, ইঁহারা মহাপ্রভুর ধর্ম্ম যাজন করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম আর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ধর্ম্ম এক্ষণে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ। মহাপ্রভুর ধর্ম্ম বহুকাল যাবৎ বৈষ্ণবসমাজ হইতে বিদায় লইয়াছে। এখন বৈষ্ণবগণ যে ধর্ম্ম যাজন করিতেছেন, তাহা ভাগবত ধর্ম্মের এক নূতন সংস্করণ মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম আর গোস্বামীমহাশয়ের ধর্ম্ম একই বস্তু ; এই দুইয়ে প্রভেদ নাই। মহাপ্রভুর ধর্ম্ম শুদ্ধাভক্তি, আর গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্মও তাহাই। মহাপ্রভুর ধর্ম্ম বৈষ্ণবসমাজ হইতে অন্তরিত হওয়ায় গোস্বামী মহাশয় মহাপ্রভুর আজ্ঞায় তাঁহারই ধর্ম্ম পুনঃসংস্থাপন করিয়া গেলেন।

শুদ্ধাভক্তি কি, তাহা আমি পূর্ব্বপ্রবন্ধে লিখিয়াছি, আর অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই। এখন এইমাত্র বলিতেছি "হরের্নামৈব কেবলং" ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম, ইহা হইতেই শুদ্ধাভক্তির অভ্যুদয়।

ঈশ্বর পুরী মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। তিনি মহাপ্রভুর মধ্যে

শক্তিসঞ্চার করিয়া তাঁহাকে শক্তিশালী দশাক্ষরী মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের রীত্যানুসারে তিনি গুরুদত্ত নাম শ্বাসে শ্বাসে জপ করিতেন। তাঁহার কোন ঝুলি বা জপের মালা ছিল না। তিনি মালায় নাম করিতেন না। কেবল শ্বাসে শ্বাসে নাম সাধন করিতেন। গোস্বামী মহাশয় ও তাঁহার শিষ্যগণ তাহাই করিয়া থাকেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তীর্থযাত্রায় বাহির হইবার কথা উত্থাপন করিলে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

"তবে নিত্যানন্দ কহে যে আজ্ঞা তোমার।
সুখ দুঃখ যেই হউক সেই কর্ত্তব্য আমার॥
কিন্তু এক নিবেদন করি আর বার।
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার॥
কৌপীন বহির্বাস আর জলপাত্র।
আর কিছু সঙ্গে নাহি যাবে এই মাত্র॥
তোমার দুই হস্ত বন্দ নাম গণনে।
জলপাত্র বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে॥

চৈ, চ, ম, ৭ম, পরিচ্ছেদ

এই পয়ার পাঠ করিয়া কেহ কদাচ মনে করিবেন না, যে মহাপ্রভুর সংখ্যা নাম ছিল এবং সেই সংখ্যা তিনি গণনা করিতেন এবং সংখ্যা গণনা করিবার জন্য তাঁহার জপের মালা ছিল। যাঁহারা শ্বাসে শ্বাসে নাম করেন, তাঁহাদের নামের সংখ্যা থাকে না। যত শ্বাস তত নাম। মহাপ্রভুর যেরূপ প্রেমোন্মত্ততা তাহাতে তাঁহার নাম গণনা করিবার সাধ্যও ছিল না।

এই পয়ারে কৌপীন বহির্ব্বাস আর জলপাত্র কেবল তিনটি বস্তু সঙ্গে যাইবার কথা আছে; আর কিছুই সঙ্গে যাইবে না, ইহাও লিখিত আছে।

মহাপ্রভুর ঝুলী বা জপের মালা থাকিলে নিশ্চয়ই তাহা সঙ্গে যাইবার উল্লেখ থাকিত, কারণ সেগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্য। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, মহাপ্রভুর ঝুলী বা জপের মালা ছিল না। "তোমার দুই হস্ত বন্দ নাম গণনে।" এই গণনে শব্দ "গ্রহণে" হইবে। "গ্রহণে" স্থলে ভ্রমক্রমে "গণনে" লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাপার ভুল মাত্র। নতুবা পূর্ব্বাপর পয়ারের সামঞ্জস্য থাকে না। কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে মহাপ্রভুর মালা বা ঝুলির বর্ণনা নাই।

যাঁহারা শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ করেন, তাঁহারা দুই হাতেই কর ধরিয়া থাকেন। কর ধরিয়া থাকিলে নাম-চলাচলের সুবিধা হয়, কর ধরা একবার অভ্যাস হইলে সাধক আর কর ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। যাঁহারা সর্ব্বদা নাম করেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই কর ধরিয়া থাকেন। মহাপ্রভু সর্ব্বদাই কর ধরিয়া থাকিতেন। এইজন্য তাঁহার দুই হস্ত বন্ধ থাকার উল্লেখ হইয়াছে। যাঁহারা মালায় নাম জপ করেন, তাঁহাদের দুই হস্ত বন্ধ থাকিবার কথা নহে।

শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ করা বড়ই কঠিন। উপযুক্ত গুরুর উপদেশ ব্যতীত কেহই শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ করিতে পারে না। উপযুক্ত গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ করিলে মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া পড়িবে, মাথায় যন্ত্রনা উপস্থিত হইবে। একারণ কেহ শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ করে না। বৈষ্ণবসমাজে উপযুক্ত গুরুর অভাব হইয়াছে, একারণ কোন বৈষ্ণবই শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ করেন না। এখন কেবল গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য ও প্রশিষ্যগণকেই শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ করিতে দেখিতেছি।

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ মালায় নাম জপ করেন না বলিয়া তাহাদিগকে অবৈষ্ণব বলা যাইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে উঁহারাই শ্রীমন্মহা

প্রভুর ধর্ম্ম যাজন করিয়া আসিতেছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মালায় "হরে কৃষ্ণ" নাম অর্থাৎ ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরে জপ করিয়া থাকেন। গোস্বামী মহাশয় শ্বাসে শ্বাসে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেন, তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যগণ শ্বাসে শ্বাসে ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া থাকেন, "হরেকৃষ্ণ" নাম জপ করেন না। এই কারণেও গোস্বামী মহাশয় ও তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যগণকে অবৈষ্ণব বলা হয়। গুরুদত্ত নাম ব্যতীত অন্য নাম জপ করিবার ব্যবস্থা কুত্রাপি নাই। কেবল গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণই গুরুদত্ত নাম সাধন না করিয়া "হরে কৃষ্ণ" নাম সাধন করিয়া থাকেন।

এ ব্যবস্থা তাঁহারা কোথায় পাইলেন, তাহা বুঝা যায় না। মহাপ্রভু দীক্ষামন্ত্রই শ্বাসে শ্বাসে জপ করিতেন, তাঁহার দোহাই দিয়া তাঁহার পন্থা ত্যাগের কারণ কি ?

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কৃষ্ণনামের মহিমা ও পদ্মপুরাণে রামনামের মহিমা বর্ণিত আছে। এই দুই পুরাণে এই দুই নামের অপার মহিমা বর্ণিত দেখিয়া বৈষ্ণবগণ "হরেকৃষ্ণ" নাম গ্রথিত করিয়া লইয়াছেন এবং পঞ্জিকাতে ঐ নাম কলিযুগের নাম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই নাম অধিক ফলদায়ক বিবেচনা করিয়া বৈষ্ণবগণ গুরুদত্ত নাম জপ না করিয়া এই নাম জপ করিয়া থাকেন। পরলোকগত চরণদাস বাবাজী বৈষ্ণবসমাজে একজন প্রতিপত্তিশালী লোক। তাঁহার বহু শিষ্য আছে। ঐ সমাজে শিষ্যগণেরও একটা প্রতিপত্তি আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া চরণদাস বাবাজী দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ নাম অপেক্ষা শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ নামের মহিমাই অধিক। একারণ তিনি হরেকৃষ্ণ নামের পরিবর্ত্তে "নিতাইগৌর রাধাশ্যাম, হরেকৃষ্ণ হরেরাম" এই নাম প্রবর্ত্তিত করিলেন। এখন চরণ দাসের শিষ্যগণ ও তাঁহাদের দেখাদেখি আরও

অনেক লোক হরেকৃষ্ণ নামের পরিবর্ত্তে এই "নিতাইগৌর রাধাশ্যাম" নামই সাধন করেন। এই সমস্ত সাম্প্রদায়িকতা ও অজ্ঞতার ফল হইতেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম এত ম্লান হইয়া পড়িয়াছে।

নাম অক্ষর বা শব্দ নহে। নামের প্রতিপাদ্য বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই নাম। মনুষ্যের রুচিভেদে শাস্ত্রে ভগবানের বিবিধ নামের উল্লেখ হইয়াছে। সকল নামই সেই এক ভগবানের নাম। "কৃষ্ণ" নামই কেবল কৃষ্ণ নাম, আর গুরুদত্ত অন্য নাম যে তাহা নহে, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। যে নামে জীবের উদ্ধার হয়, তাহাই কৃষ্ণ নাম। নামের ইতরবিশেষ বুদ্ধি, কেবল সাম্প্রদায়িকতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

মহাত্মারা সাম্প্রদায়িকতার অতীত। তাঁহাদের নিকট সকল সম্প্রদায় সমান। যে সকল নামে মানুষ সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, শিষ্যের রুচি ও প্রকৃতিভেদে মহাত্মাগণ সেই সকল নাম হইতে বাছিয়া লইয়া শিষ্যের উপযোগী একটী নাম শিষ্যকে প্রদান করেন।

শাস্ত্রে কৃষ্ণ নামের অপার মহিমা বর্ণিত থাকিলেও যতক্ষণ গুরু ঐ নামের প্রতিপাদ্য দেবতাকে অর্পণ করিয়া নামের চৈতন্যবিধান না করিয়াছেন, ততক্ষণ ঐ নাম শব্দ মাত্র, উহা সাধনা করিয়া কদাচ সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। *

কৃষ্ণ নাম স্বতঃই শক্তিসমন্বিত নহে। যে নাম শক্তি-সমন্বিত তাহাতে নামাপরাধের বিচার নাই। সহস্র অপরাধেও নামের শক্তি প্রতিহত হয় না। যে নাম শক্তি-সমন্বিত নহে, তাহাতেই নামাপরাধ থাকে। শ্রীকৃষ্ণ নামেও নামাপরাধ আছে।

---

* মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যো না জানাতি সাধকঃ
শতলক্ষ প্রযত্নোঽপি তস্য মন্ত্র ন সিদ্ধতি।
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, তৃতীয় উল্লাস, ৩৯ শ্লোক।

"কৃষ্ণ নাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিতে অপরাধের না হয় বিকার॥
এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্ব পাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ কম্প পুলক আদি গদ্গদ অশ্রুধার॥
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ নামের ফল পাই এত ধন॥
হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণ নাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥
চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।
নাম লইতে প্রেম যেন ব'হে অশ্রুধার॥ *

নামীই নামের বীজ। এই বীজ গুরুর হাতে। গুরু ইহা নামে সন্নিবেশিত করেন। কখন কখন শিষ্যকে নাম দিবামাত্র এই বীজ অঙ্কুরিত হয়; আবার কখনও সাধন করিতে করিতে অনেক বিলম্বে তাহা অঙ্কুরিত হয়। শরীরের গঠন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সাধন, শিষ্যের নিষ্ঠা, অপরাধের তারতম্য-অনুসারে কখনও শীঘ্র কখনও বিলম্বে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে।

---

* হরহরি নামের ভেদবুদ্ধি নামাপরাধের মধ্যে গণ্য। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ নামের ভেদবুদ্ধি কি নামাপরাধের মধ্যে গণ্য নহে? সাম্প্রদায়িকতা হইতে এই পয়ারের সৃষ্টি হইয়াছে জানিবেন। ইহার মূলে আদৌ সত্য নাই।

যখন কৃষ্ণ নাম স্বতঃই শক্তিশালী নহে, যখন ঐ নাম অপরাধের বিচার করে, তখন গুরুদত্ত নাম পরিত্যাগ করিয়া উহা সাধন করা কদাচ যুক্তিযুক্ত নহে।

গুরুদত্ত প্রত্যেক নাম, ভগবানেরই নাম, সুতরাং তাহা কৃষ্ণ নাম। গুরুদত্ত নাম সাধন না করিয়া শক্তিহীন হরেকৃষ্ণ নাম সাধন করা বৈষ্ণব-সমাজের ভ্রান্তি ; এই জন্যই সাধনভজন করিয়াও তাঁহারা উচ্চ ধর্ম্ম লাভ করিতে অসমর্থ হইতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ নামের মহিমাবর্ণনায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আর একটি পয়ার আছে—

"কৃষ্ণ নামে দীক্ষা পুরশ্চর্য্যার অপেক্ষা না করে।"

এই পয়ারের উপর নির্ভর করিয়াও বৈষ্ণবগণ দীক্ষামন্ত্র সাধন না করিয়া হরেকৃষ্ণ নাম সাধন করিয়া থাকেন। এই পয়ারে যে কৃষ্ণ নামের উল্লেখ হইয়াছে, ইহা শক্তিশালী নাম অর্থাৎ সদ্‌গুরুপ্রদত্ত নাম। সদ্‌গুরুদত্ত নামে তন্ত্রোক্ত কোন দীক্ষা বা পুরশ্চরণের আবশ্যকতা নাই।

বৈষ্ণবগণের গুরুদত্ত নাম সাধন না করিবার আর একটি কারণ আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে দৈন্য করিয়া বলিয়াছেন—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ॥
এতাদৃশী তবকৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনিনানুরাগঃ॥"

"অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিব অনেক নামের প্রচার॥

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধ হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।
আমায় দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥"

চৈ চ, অ, ২০ পরিচ্ছেদ।

এই শ্লোক ও পয়ার পাঠ করিয়া বৈষ্ণবেরা মনে করেন, নামমাত্রেই ভগবানের সর্ব্বশক্তি অর্পিত হইয়া আছে। সুতরাং গুরুদত্ত নাম জপ না করিলে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। এ ধারণাটি তাঁহাদের নিতান্ত ভুল। গুরুদত্ত নাম ব্যতীত আর কোন নামে শক্তি থাকে না। গুরুই নামে শক্তি অর্পণ করেন। যখন ঈশ্বরপুরী মহাপ্রভুকে দীক্ষা দিয়াছিলেন, তখনই তিনি নামে শক্তি অর্পণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শক্তিশালী নাম পাইয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি দৈন্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নহি অনুরাগ॥

এ সম্বন্ধে আমাদের আর অধিক বলিবার নাই, যাঁহারা গুরুদত্ত নাম সাধন না করিয়া শক্তিহীন হরেকৃষ্ণ নাম বহুকাল যাবৎ সাধন করিতেছেন, যাঁহারা প্রতিদিন লক্ষাধিক নাম সাধন করেন, তাঁহারা নিজে নিজে বুঝিবেন এত নাম করিয়া তাঁহারা জীবনে কি উপকার পাইয়াছেন।

এই প্রকারে নাম করিয়া যদি আসক্তি নষ্ট না হইয়া থাকে, যদি দুষ্প্রবৃত্তি নির্ম্মূল না হইয়া থাকে, যদি জল্পনা কল্পনা বাসনা কামনা দূরীভূত না হইয়া থাকে, যদি নামের মধুরাস্বাদন উপলব্ধি না হইয়া থাকে, যদি দয়াদাক্ষিণ্য পরোপকার পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল পরিবর্দ্ধিত না হইয়া থাকে, যদি হিংসা দ্বেষ নাম যশ প্রভুত্ব প্রতিপত্তি

সমভাবে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে নাম করিয়া কোন ফল হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ নাম যেমন অপরাধের বিচার করে, সেইরূপ নিতাইগৌর নাম বা ভগবানের যাবতীয় নাম অপরাধের বিচার করিয়া থাকে। ভগবানের কোন নামই অপরাধবর্জ্জিত নহে।

কবিরাজ গোস্বামী যে কহিয়াছেন,

"চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।
নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥

ইহা অত্যন্ত ভ্রান্তি, অথবা ঘোর সাম্প্রদায়িকতা। যতক্ষণ গুরু নামে শক্তি অর্পণ না করিয়াছেন, ততক্ষণ নামে কোথা হইতে শক্তি আসিবে?

গুরু কর্ত্তৃক শক্তিসমন্বিত হইবার পূর্ব্বে ভগবানের যাবতীয় নাম শক্তিশূন্য জানিবেন, উহা তখন শব্দমাত্র বুঝিতে হইবে।

নামে শক্তি অর্পিত থাকিলে গুরুকরণের আদৌ প্রয়োজন হয় না। হরেকৃষ্ণ নাম জপ কর অথবা নিতাইগৌর নাম জপ কর, ফল সমান হইবে, কিছুই তারতম্য হইবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গোস্বামী মহাশয়ের সন্ন্যাস

সন্ন্যাস আশ্রম নহে! সর্ব্বপ্রকার আসক্তির বিনাশ, সমস্ত বন্ধন-উন্মোচনের নাম সন্ন্যাস। সংসার ক্ষয় হইয়া গেলেই যথার্থ সন্ন্যাস উপস্থিত হয়। সংসারাসক্তির লেশমাত্র অন্তরে থাকিতে কাহারও সন্ন্যাস লওয়া কর্ত্তব্য নহে। কিঞ্চিন্মাত্রও আসক্তি থাকিতে সংসার ত্যাগ

করিলে সংসারে শতগুণে জড়িত হইতে হইবে। ভিতরে সংসার থাকিতে কাহারও সাধ্য নাই যে সংসার ত্যাগ করে। প্রকৃতি সংসার না করাইয়া ছাড়িবে না। একপ্রকার সংসার করিতে হইত, না হয় অন্য প্রকার সংসার করিতে হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচল গমন করিতেছেন, সঙ্গে গোবিন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ আছেন। একদিন মধ্যাহ্নকালে আহারেরর পর গোবিন্দকে মহাপ্রভু বলিলেন "গোবিন্দ; একটা মুখশুদ্ধি দাও।" গোবিন্দ মুখশুদ্ধি কোথায় পাইবে? সঙ্গে কিছু নাই। গোবিন্দ নানা স্থান ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রায় একঘণ্টার পর একটা হরীতকী ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তাহার একখণ্ড মহাপ্রভুর হস্তে দিলেন, বাকি অংশটা কল্যকার জন্য রাখিয়া দিলেন।

পরদিন মধ্যাহ্ন-আহারের পর মহাপ্রভু আবার গোবিন্দকে বলিলেন, "গোবিন্দ একটু মুখশুদ্ধি দাও"। এবার কহিবামাত্র গোবিন্দ একখণ্ড হরীতকী মহাপ্রভুর হস্তে দিলেন। মহাপ্রভু গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

মহাপ্রভু—কাল হরীতকী চাহিয়াছিলাম, তুমি একঘণ্টার পর একখণ্ড হরীতকী আমাকে দিয়াছিলে, আজ চাহিবামাত্র দিলে, এ হরীতকী তুমি কোথায় পাইলে?

গোবিন্দ—প্রভু, কাল হরীতকী ছিল না, ভিক্ষা করিয়া আনিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল, সেই জন্য কিছু রাখিয়া দিয়াছিলাম।

মহাপ্রভু—গোবিন্দ, আমার সঙ্গে তোমার যাওয়া হইবে না; তোমার সংসারবুদ্ধি রহিয়াছে; তুমি বাড়ী যাও; বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিতে থাক।

এইকথা শুনিয়া গোবিন্দ মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন "তুমি আমার পরমভক্ত,

তোমার প্রতি আমার যে ভালবাসা আছে, তাহা কিছুতেই যাইবে না। তোমাকে যেমন ভালবাসি, ঠিক তেমনি ভালবাসিব। কেবল তোমার কল্যাণের জন্য তোমাকে বিবাহ করিবার আজ্ঞা দিলাম। ভিতরে সংসার থাকিতে সংসার ত্যাগ করিতে নাই ; তাহা হইলে ধর্ম্মে বঞ্চিত হইতে হইবে। তুমি বিবাহ করিলে, তোমার কিছুমাত্র ধর্ম্মহানি হইবে না। তোমার সমস্ত কর্ম্ম শেষ হইয়া যাইবে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আদেশে পরম ভক্ত গোবিন্দ বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বিবাহ করিয়া অগ্রদ্বীপে শ্রীশ্রীগোপীনাথের সেবা প্রকাশ করিয়া সস্ত্রীক ভজনসাধনে নিযুক্ত রহিলেন। যথাকালে গোবিন্দ ঘোষের একটিমাত্র পুত্র লাভ হইল। যখন পুত্রের বয়স পাঁচ বৎসর, তখন গোবিন্দের স্ত্রী-বিয়োগ হইল।

সহধর্ম্মিণীর বিয়োগে গোবিন্দ ঘোষ বড়ই কাতর হইলেন। আর বিবাহ করিলেন না। পুত্রটিকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। যখন পুত্রের বয়স নয় বৎসর, তখন ঐ পুত্রের বিয়োগ হইল। একে স্ত্রীর শোক, তাহাতে আবার পুত্রশোক উপস্থিত হওয়ায় গোবিন্দ ঘোষ নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে গোপীনাথের শ্রীমন্দিরে পড়িয়া থাকিলেন। তিনদিন অনশনে কাটিয়া গেল। তখন গোপীনাথ স্বপ্নযোগে গোবিন্দকে বলিলেন—

গোপীনাথ—গোবিন্দ, উঠ। আমি তিনদিন অনশনে আছি, স্নানাহার কিছুই হয় নাই ; আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, আমাকে খাইতে দাও। তুমিও আহার করগে, এমন করিয়া পড়িয়া থাকিও না।

গোবিন্দ—ঠাকুর, আমি উদাসীন ছিলাম, কেনইবা আমাকে বিবাহ করাইলেন, আর কেনইবা সন্তান দিলেন? যদি বিবাহই

করাইলেন, আর সন্তান দিলেন, তবে আবার কড়িয়া লইলেন কেন? আমার একমাত্র পুত্র ছিল, জলপিণ্ডের আর সংস্থান থাকিল না।

গোপীনাথ—তুমি দুঃখ করিও না, আমিই তোমার পুত্র, আমি তোমার শ্রাদ্ধতর্পণ করিব, আমি তোমার পিণ্ডদান করিব। তোমার আর অন্য পুত্রের প্রয়োজন নাই।

ইষ্টদেবতার আজ্ঞা পাইয়া গোবিন্দ গাত্রোত্থান করিলেন, শীঘ্র স্নান করিয়া আসিয়া গোপীনাথকে স্নান করাইলেন এবং ভোগ পাক করিয়া ভোগ দিলেন। অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ এখনও কুশ ধরিয়া গোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধতর্পণ ও পিণ্ডদান করিয়া থাকেন।

অন্তরে সংসারের লেশমাত্র থাকিতে সন্ন্যাস লইবে না। গোবিন্দের ন্যায় ভক্তকেও মহাপ্রভু সংসার করাইয়াছিলেন। আম পাকিলেই যেমন বোঁটা হইতে তাহা আপনা আপনি খসিয়া পড়ে, তেমনি সংসার ক্ষয় হইবা-মাত্র সন্ন্যাস আপনি উপস্থিত হয়।

গোস্বামী মহাশয়ের সংসার ক্ষয় হইয়াছিল, তাঁহার অন্তরে আসক্তির লেশমাত্র ছিল না। তিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণের কোন প্রয়োজন ছিল না। ব্রাহ্মধর্ম্মে থাকিবার কালে তাঁহার কুলদেবতা শ্যামসুন্দর তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন এবং কথোপকথন করিয়া ছিলেন। * তাঁহার আবার সংসার কি?

যদিও গোস্বামী মহাশয়ের প্রবল বৈরাগ্য ছিল; তাঁহার সংসার-

---

* "মহাপাতকীর জীবনে সদ্গুরুর লীলা" নামক গ্রন্থে এই আখ্যায়িকা লিখিত হইয়াছে। পাঠকগণ তাহা পাঠ করিলেই ঘটনাটা জানিতে পারিবেন।

বাসনা অন্তর হইতে চলিয়া গিয়াছিল ; তথাপি যাঁহার দ্বারা ধর্ম্মসংস্থাপন হইবে, শাস্ত্র ও সদাচার রক্ষিত হইবে, তাঁহার শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। "আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখায় অন্যেরে"; নিজে আচরণ না করিলে অন্যকে শিক্ষা দেওয়া হয় না। নিজে হোটেলে বসিয়া খানা খাইব আর পরকে হবিষ্যান্ন করিতে বলিব, ইহা উপহাসজনক কথা। মহাত্মাগণ এ নীতি কখনই অবলম্বন করেন না।

কাশীধামে স্বামী হরিহরানন্দ সরস্বতী নামে এক মহাত্মা ছিলেন। গুরু-আজ্ঞায় গোস্বামী মহাশয় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামীজি গোস্বামী মহাশয়কে বলিয়াছিলেন "আপনার যে অবস্থা এ অবস্থা অনেক পরমহংসেরও সুদুর্লভ। আপনার সন্ন্যাস লইবার কোন প্রয়োজন নাই। কেবল শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আপনার সন্ন্যাস গ্রহণ।

গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মাবস্থায় উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। স্বামীজী যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া গোস্বামী মহাশয়কে পুনরায় উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত করেন। তৎপরে তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করাইয়া বিরজাহোমে শিখাসূত্র আহুতি প্রদান করাইয়া বৈদিক সন্ন্যাসাশ্রম প্রদান করেন। গোস্বামী মহাশয়ের সন্ন্যাসাশ্রমের গুরু-নাম অচ্যুতানন্দ সরস্বতী। গোস্বামী মহাশয় এই সময় হইতে আশ্রমধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কালোপযোগী ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ভক্তগণকে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করিবার উপদেশ দিতেন। গোস্বামী মহাশয়ও তাহাই করিলেন। এবার সন্ন্যাস ও সংসারের একত্র সম্মিলন হইল। গোসাঁই গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া নাম করিবার জন্য শিষ্যগণকে উপদেশ দিতেন। ম্যালেরিয়া-পীড়িত দুর্ব্বল বাঙ্গালীর দেহে ক্লেশ

সহ্য হয় না। বৈদিক সন্ন্যাসের নিয়ম রক্ষা করিতে বাঙ্গালী অপারগ। উহা কালোপযোগীও নহে।

যদিও গোস্বামী মহাশয় শিষ্যগণকে গৃহস্থাশ্রমে রাখিয়াছেন, তথাপি গুরুদত্ত মন্ত্র ইঁহাদিগকে সন্ন্যাসী করিয়া তুলিতেছে। গোস্বামী মহাশয়ের স্ত্রী পুরুষ অনেক গৃহস্থ শিষ্য দেখিলাম, তাঁহাদের অবস্থা অনেক পরমহংসের পক্ষেও দুর্ল্লভ। ইঁহারা সংসারের মধ্যে বাস করিয়াও সংসারী নহেন। স্ত্রী, পুত্র, বিষয় বৈভব যশ মানের প্রতি ইঁহাদের মন নাই। সংসার ইঁহাদের মন ভুলাইয়া রাখিতে পারে না। ইঁহারা সংসারের অতীত।

গোস্বামী মহাশয় একদিন ইঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "আমি জোর করিয়া তোমাদিগকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, একটু অবস্থা খুলিয়া দিলেই তোমরা লোটা কম্বল লইয়া জয়রাধে বলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়; কাহার সাধ্য তোমাদিগকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে? সংসারের কাজ শেষ করিবার জন্য আমি কেবল জোর করিয়া তোমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি।"

কেহ কেহ বলিবেন—গোস্বামী মহাশয় যদি সন্ন্যাসী হইবেন, তবে আবার মহানগরীতে তেতলা বাড়িতে থাকিলেন কেন? অবার পুত্র-কন্যাদিই বা তাঁহার সঙ্গে কেন? ইহার উত্তর এই যে, গোস্বামী মহাশয় আপন ইচ্ছায় এরূপ অবস্থায় ছিলেন, ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য গুরু-আজ্ঞায় তাঁহাকে এইভাবে থাকিতে হইয়াছিল। কোন নিভৃত পাহাড় পর্ব্বতে চলিয়া গেলে আর ভারতে ধর্ম্মসংস্থাপন হয় না। সুতরাং তাঁহাকে জনসমাজে বাস করিতে হইয়াছিল।

তাঁহার পুত্র কন্যা প্রভৃতি সকলেই তাঁহার শিষ্য ছিল; অন্য শিষ্যগণ যেমন তাঁহার কাছে থাকিত, ইঁহারাও তেমনি তাঁহার কাছে থাকিতেন। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছিলেন-"আমার নিকট যোগজীবনও যা আর পথের ঐ

কুকুরটাও তাই।” তিনি সহস্র সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন, কিন্তু সন্তান সন্ততির জন্য একটি পয়সাও রাখিয়া যান নাই।

সন্ন্যাস জিনিসটা কি, এবার গোস্বামী মহাশয় তাঁহার নিজের জীবনে দেখাইলেন। তাঁহার স্ত্রী পুত্র, কন্যা দৌহিত্র, দৌহিত্রী জামাতা শাশুরী আত্মীয় স্বজন সকলই ছিল। তিনি এই সমস্ত লইয়া জন-সমাজে কাল যাপন করিতেন। সকলকে পরম যত্ন ও আদর করিতেন। কিন্তু ইঁহারা যে তাঁহার নিজের লোক, আর সমস্ত পর, এ জ্ঞান তাঁহার ছিল না। গোস্বামী মহাশয়ের অন্যান্য শিষ্য যেমন তাঁহার নিকট থাকিতেন, ইঁহারাও ঠিক তেমনি তাঁহার নিকট থাকিতেন। শাস্ত্রে বলিয়াছে—

“বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবিহস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতঃ সমদর্শিনঃ॥

এই শাস্ত্রবাক্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গোস্বামী মহাশয়ের জীবনে দেখিতে পাই।

তিনি যখন আহার করিতে বসিতেন, মাকড়সা চাল হইতে সূতা ধরিয়া তাঁহার নিকট নামিয়া আসিত। তিনি তাহাকে আদর করিয়া খাওয়াইতেন। ইন্দুর গর্ত্ত হইতে মুখ বাড়াইয়া সচকিত-চিত্তে এদিক ওদিক চাহিত এবং লোক জন না থাকিলে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ছুটিয়া আসিত। তিনি তাহাকে আদর করিয়া আহার করাইতেন। আশ্রমে যে সকল কুকুর বিড়াল থাকিত, তিনি তাহাদিগকে সযতনে পালন করিতেন। প্রত্যহ প্রাতে অনেক পক্ষী তাঁহার প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইত। তিনি তাহাদিগকে নিজহস্তে আহার করাইতেন। পিপীলিকাগণকেও চিনি খাওয়াইতেন। বিষধর সর্প তাঁহার কোলে উঠিয়া খেলা করিত এবং গাত্র ও মস্তকে বিচরণ করিত।

পুরীর আশ্রমে তিনি বানরগণের একপ্রকার অভিভাবক ছিলেন।

তিনি বহু যত্নে বানরবধ নিবারণ করিয়াছিলেন। প্রত্যহ বানরগণকে প্রচুর আহার করাইতেন। বানরের বাচ্চাগুলি তাঁহার কোলে ও কান্ধে উঠিয়া খেলা করিত, জটা ধরিয়া নাড়িত, বানরগণ পার্ষদের ন্যায় চারিদিক ঘিরিয়া বসিয়া থাকিত। বানরীগণ সময়ে সময়ে সন্তানগুলিকে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে দূরে বিচরণ করিত। এই সকল বানর-বানরীগণকে তিনি প্রত্যহ প্রচুর আহার করাইতেন এবং পরম আদরে তাহাদের সহিত আলাপ করিতেন। গোস্বামী মহাশয়ের দেহ-ত্যাগ হইলে এইসকল বানরের যে শোক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া সমস্ত আশ্রমবাসীকে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। তাহারা কিছুদিন যাবৎ প্রতিদিন আশ্রমে আসিয়া প্রত্যেক ঘরে গোস্বামী মহাশয়ের অন্বেষণ করিয়া বেড়াইত। তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া শোকাশ্রু বর্ষণ করিত। তাহাদের আহারে রুচি ছিল না। গোস্বামী মহাশয়ের বিচ্ছেদে তাহারা নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সদাই বিমর্ষ হইয়া থাকিত এবং অশ্রুবর্ষণ করিত। কিছুকাল এইভাবে কাটিয়া গেলে তাহারা যখন গোস্বামী মহাশয়কে আর দেখিতে পাইল না, তখন একেবারে আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। আশ্রমে আর একটি বানরও আসিত না।

গোস্বামী মহাশয় রীতিমত প্রত্যহ অতিথি সেবা করিতেন ও গো সকলকে ঘাস দিতেন। গোস্বামী মহাশয়ের দিব্য দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছিল, কলিকাতার রাস্তা দিয়া কোন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি গমন করিলে, তিনি ঘরে বসিয়া টের পাইতেন এবং সেবক দ্বারা ঐ ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে ডাকাইয়া আনিয়া প্রচুর আহার করাইয়া বিদায় দিতেন।

গোস্বামী মহাশয়ের চরিত্রে কেবল যে প্রাণিজগৎ মোহিত হইয়াছিল তাহা নহে, বৃক্ষলতাদি পর্য্যন্ত বিমোহিত হইয়াছিল। গ্যাণ্ডেরিয়া আশ্রমে

একটি বৃহৎ আম্র বৃক্ষ ছিল, ঐ বৃক্ষের তলে বসিয়া গোস্বামী মহাশয় সময়ে সময়ে ভগবানের নাম করিতেন। তাহাতে বৃক্ষ পুলকিত হইয়া প্রচুর মধু বর্ষণ করিতেন। শ্রীবৃন্দাবনে শিরোমণি মহাশয়ের টোরে একটি কুলগাছ ছিল, সেই গাছ গোস্বামী মহাশয়কে দর্শন ও হরিনাম শ্রবণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল। সাধারণের এসকল কথায় বিশ্বাস হওয়া সম্ভবপর নহে। *

আশ্রমের বিপুল ব্যয় গোস্বামী মহাশয়কে বহন করিতে হইত। বহুশিষ্য তাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হইত। এই বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য গোস্বামী মহাশয়ের কোন আয় ছিল না। তিনি অর্থাগমের কোন চেষ্টা করিতেন না। কাহারও নিকট যাচ্ঞা করিতেন না। কাহাকেও অভাব জানাইতেন না। তিনি বলিয়াছিলেন "অভাব জানান যা, আমার পক্ষে ব্যভিচার করাও তাই।" মানুষের নিকট অভাব জানান দূরে থাকুক, ইঙ্গিতেও ভগবানের নিকট অভাব জানাইতেন না। তিনি বলিয়াছিলেন, "অভাবের কথা ইঙ্গিতেও ভগবানের গোচর করিবার ইচ্ছা হইলে, আমার মনে হয়, আমি যেন ঘোর নরকের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছি।" তিনি অভাবের জন্য কোন চিন্তা করিতেন না। তাঁহার ললাটে মুখমণ্ডলে কোন চিন্তার রেখা দেখা যাইত না। ভগবান তাঁহায় ব্যয়ভার বহন করিতেন। তিনি শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥

যে ব্যক্তি অনন্য-ভক্ত হইয়া আমার সেবা করে, সেই নিত্যাভিযুক্ত ভক্তগণের ধনাদি লাভ রক্ষা ইত্যাদি সমস্ত ভার আমি স্বয়ং বহন করি। এই শাস্ত্রবাক্যে পূর্ব্বে আমার আদৌ বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু গোস্বামী

* গ্রন্থের ৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মহাশয়ের জীবনে প্রমাণ পাইয়া আমার অন্তরে সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। যাহা প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহা আর কিপ্রকারে অবিশ্বাস করিব? ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

হে অর্জ্জুন, যে ব্যক্তি ব্রহ্মভূত এবং প্রসন্নাত্মা তিনি কখনও শোক করেন না এবং কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষাও করেন না, সর্ব্বভূতে তাঁহার সমদর্শন হইয়া থাকে এবং তিনি আমাতে পরা ভক্তি লাভ করেন।

এ শ্লোকের প্রত্যক্ষ প্রমাণ এক গোস্বামী মহাশয়ে দর্শন করিলাম। তাঁহাতে শোক, মোহ, ভয়, ভাবনা, নিন্দা, প্রতিষ্ঠা, লাভ, লোকমানের লেশমাত্র ছিল না। সর্ব্বভূতে তাঁহার সমদর্শন ছিল। সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত রিপুগণের আধিপত্য তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়াছিল। যাবতীয় হৃদয়-গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। কোথাও একটু আসক্তির লেশমাত্র দেখা যাইত না। নিদ্রা তাঁহার চক্ষুকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, বাসনা কামনা তাঁহার অন্তর হইতে চলিয়া গিয়াছিল। তিনি অহর্নিশি যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভগবৎ প্রেমে মগ্ন থাকিতেন। ভগবানের নাম ব্যতীত তাঁহার একটি শ্বাসও বৃথা গৃহীত বা পরিত্যক্ত হইত না। এমন সন্ন্যাসী কে কোথায় দেখিয়াছেন?

ভগবানের মায়াশক্তি হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয় হইতেছে। ব্রহ্মাদি দেবতাগণও এই মায়া শক্তির অধীন। এই দারুণ মায়া বশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে গোপবালক বলিয়া ব্রহ্মার ভ্রম হইয়াছিল। তিনি অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই মায়া-শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি আপন কন্যার প্রতি প্রধাবিত হইয়াছিলেন।

দেবাদিদেব মহাদেব কন্দর্প-শরে বিমোহিত হইয়াছিলেন। এবং

ভগবানের মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইয়াছিল। কোন মানুষ এই মায়াশক্তি অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছেন, শাস্ত্রপাঠ করিয়া ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় না। কিন্তু মানুষ যে মায়াশক্তি অতিক্রম করিতে পারে একথাটা শাস্ত্রে আছে ভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে॥

হে পার্থ, ত্রিগুণময়ী মায়া দুস্তরা হইলেও যাহারা আমার শরণাগত হয়, তাহারা অনায়াসে সেই মায়া উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

ভগবানের এই মায়া শক্তি দুস্তরা হইলেও গোস্বামী মহাশয় প্রগাঢ় ভক্তিবলে এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। মায়ার আধিপত্য আর তাঁহার উপরে ছিল না।

এক দিন মায়াদেবী তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় তিনটি স্ত্রীলোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা পূর্ণ যুবতী, বহু মূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিতা। ইঁহাদের অলোকসামান্য রূপলাবণ্যে চারিদিক উদ্ভাসিত। ইঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আসিয়া প্রণাম করিয়া হাত যোড় করিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন। গোস্বামী মহাশয় ইঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছিলেন; বাহিরে কোন কথা প্রকাশ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

গোসাঁই—আপনারা এখানে কিজন্য আগমন করিয়াছেন?

যুবতীগণ—আমরা দীক্ষা গ্রহণ করিব, আমাদিগকে দীক্ষা-মন্ত্র প্রদান করুন।

গোসাঁই—এবেশে দীক্ষা গ্রহণ হইবে না।

যুবতীগণ—কি করিতে হইবে ?

গোসাঁই—তোমাদের বস্ত্রালঙ্কার এবং আর যাহা কিছু আছে, সমস্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে। তার পরে মস্তক মুণ্ডন করিয়া একবস্ত্রা হইয়া আমার নিকট আসিলে দীক্ষা পাইবে।

যুবতীগণ—আমাদের বহু ধন আছে ; গ্রহণ করুন। এই বলিয়া তাঁহার বহু স্বর্ণমুদ্রা গোস্বামী মহাশয়ের সম্মুখে ধরিলেন।

গোসাঁই—আমার ধনের কোন প্রয়োজন নাই, এসব গরীব দুঃখী লোককে বিতরণ করিয়া দাও।

যুবতীগণ—গোসাঁই ! আমরা কে, চিনিতে পারিলেন না ? একসময় আপনি আমাদের যে আজ্ঞাবহ ছিলেন। আমরা যাহা বলিতাম, তাই করিতেন। আমাদের কোন কথা অবহেলা করিতেন না। এখন সব ভুলিয়া গেলেন ? আমাদিগকে আদৌ চিনিতে পারিতেছেন না ?

গোসাঁই—আপনারা কে আমাকে বলুন।

যুবতীগণ—আমরা মায়ার দাসী। আপনাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম।

গোসাঁই—যথেষ্ট পরীক্ষা হইয়াছে। এখন আপনারা এস্থান হইতে প্রস্থান করুন।

এইকথা শুনিয়া যুবতীগণ প্রস্থান করিলেন। সাধক-জীবনে প্রায়ই মায়ার পরীক্ষা হইয়া থাকে। কখনও ঘোরতর প্রলোভন, কখনও বা দারুণ নির্য্যাতন উপস্থিত হয়। এইটি বড় সঙ্কটের অবস্থা। এই অবস্থা উপস্থিত হইলে সাধক প্রায়ই সাধনভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। এই বিপদকালে একমাত্র ধৈর্য্য ও গুরুদত্ত নামই ভরসা। আত্মরক্ষার আর উপায়ান্তর নাই। পাঠক মহাশয় এই কথাটি বিশেষ করিয়া মনে রাখিবেন।

মায়ার কুহকে ভুলিবেন না। মায়া কি ভাবে আক্রমণ করিবে বুঝিয়া উঠা সুকঠিন ; সর্ব্বদা নিজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে ; সাধক সাবধান, সাবধান !

এবার সংসার ও সন্ন্যাসের একত্র সমাবেশ দেখা গেল। ধর্ম্মলাভের জন্য সংসারত্যাগের আবশ্যকতা নাই ; বরং বর্ত্তমান সমাজে সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম সাধন করাই সুবিধাজনক ; এখানে যেমন অনেক প্রতিবন্ধক ও প্রলোভন আছে, তেমনি আবার অনেক সুবিধাও আছে। মহাপ্রভুর পন্থায় কঠোরতা নাই ; তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অধিকাংশ লোকই সংসারী ; তাঁহারা সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শিষ্যগণ

গোস্বামী মহাশয়ের বহুল শিষ্য। বঙ্গদেশে এমন জেলা নাই যেখানে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য নাই। তাঁহার প্রশিষ্যগণের সংখ্যা কম নহে। ইঁহাদের মধ্যে অনেক ভাল লোক আছেন, আবার যে বিকৃতমস্তিস্ক লোক নাই এমনও নহে। বহুলোকের মধ্যে সকলেই যে সমান হইবে তাহা অসম্ভব, সকলেই যে ধাম্মিক হইবে এরূপও আশা করা যায় না। যীশু খৃষ্টের প্রিয় শিষ্য জুডা খৃষ্টকে ধরাইয়া দিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গী কৃষ্ণদাস ভট্ট মাবীর স্ত্রী লোকের মোহে পড়িয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। মাধবীর নিকট কেবল চাউল বদলাইয়া আনার জন্য করুণার সাগর মহাপ্রভু যে ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা নহে, অবশ্যই তাঁহার আরও কোন গুরুতর অপরাধ তিনি দর্শন

করিয়াছিলেন। মানুষ মায়ার দাস, কখন কোন ভূত যে তাহার ঘাড়ে চড়িবে কে বলিতে পারে? গোস্বামী মহাশয়ের কতিপয় শিষ্যের আচরণে জনসাধারণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন; তাঁহাদিগকে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিতে শুনিয়াছি, একারণ আমার এই প্রবন্ধের অবতারণা।

কেহ কেহ বলেন গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্ম, বৈষ্ণবতা তাহাদের ভাণ মাত্র। কেহ কেহ বলেন "ইহারা অনেকে ভ্রষ্ট স্বেচ্ছাচারীর দল"। কেহ কেহ বলেন, ইহারা এতই অহঙ্কৃত যে ইঁহারা বলেন "আমাদের আর ভজনসাধনের প্রয়োজন নাই, আমাদের ভগবৎ প্রাপ্তি হইয়াছে"। কেহ কেহ বলেন, ইঁহারা এত অভিমানী যে ইহারা স্বজাতীয় লোকের বাড়ীতে আহার করিতে রাজী নয়; অধিক কি ব্রাহ্মণগণের বাড়ীতেও ইঁহারা আহার করিতে নারাজ, কিন্তু ব্রাহ্মণেতর সতীর্থগণের সঙ্গে তাহাদের বাড়ীতে আহার করিতে ইঁহাদের আপত্তি নাই।

জনসাধারণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের প্রতি যে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন, ইহাতে তাঁহাদিগকে দোষ দিবার কিছু নাই। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের আচার-আচরণ যে রূপ তাহাতে ইঁহারা যে একটা ধর্ম্মসম্প্রদায় লোক ইহা জন সাধারণের বুঝিবার উপায় নাই। ইঁহাদের না আছে গলায় মালা, না আছে কপালে তিলক, ঝোলাও নাই ঝুলিও নাই, ত্রিশূলও নাই; রক্ত চন্দনের ফোঁটাও নাই; ইহাদের কোন সম্প্রদায়ী বেশ নাই। লোক কেমন করিয়া বুঝিবে যে, ইঁহারা কোন এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোক। ইঁহারা সকলেই গৃহস্থ লোক, বিষয় কর্ম্ম করিয়া গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিয়া আসিতেছেন। গোস্বামী মহাশয় সাধন দিবার সময় বলিয়া গিয়াছেন, "তোমরা আপনাদিগকে কোন দলভুক্ত মনে করিও না, নাম করিতে করিতে সত্যবস্তু আপনা আপনি অন্তরে প্রকাশিত

হইবে”। এইজন্য গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের একটা দল নাই; যিনি যে সত্য উপলব্ধি করিতেছেন, তিনি সেই মত চলিতেছেন।

পাঠক মহাশয়, গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যেরা যে কি ধাতুর লোক, তাহা আপনারা জানেন না। ইহাদের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বে উৎকট ব্রাহ্ম ছিলেন। ইঁহারা জাতি মানিতেন না, ঠাকুর দেবতা মানিতেন না, শাস্ত্র সদাচার ও সদাহার মানিতেন না। ইঁহারা গুরু পুরোহিত সাধু সন্ন্যাসী সকলের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন। কেহ বিলাত গিয়াছেন, কেহ ইংরাজি হোটেলে বসিয়া খানা খাইয়াছেন, কেহ পৈতা ছিঁড়িয়া সমাজের বুকে পদাঘাত করিয়াছেন। কেহ অসবর্ণ বিধবা বিবাহ করিয়া সমাজ-শাসন ত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহারা মাতা বা গুরুজনের ক্রন্দনে কর্ণপাত করেন নাই; যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহাই প্রাণপণে যাজন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকলের বিরুদ্ধে যিনি যাহাই বলুন, তৎ-সমস্তই ইঁহাদের নিকট অগ্রাহ্য। ইঁহারা হিন্দুসমাজের কিছুই ভাল দেখিতে পাইতেন না; ঠাকুর দেবতা শাস্ত্র সদাচার এবং হিন্দুয়ানীর যাহা কিছু, তৎসমুদয় চূর্ণবিচূর্ণ করাই ইঁহাদের লক্ষ্য ছিল।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষার ভার ভগবান স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এই হিন্দুবিদ্বেষী সমাজদ্রোহী তেজস্বিপ্রকৃতি ব্রাহ্মগণকেই ধর্ম্মরক্ষার উপযুক্ত পাত্র স্থির করিলেন, এবং ইঁহাদিগকে গোস্বামী মহাশয় দ্বারা সুকৌশলে বশীভূত করিয়া ইঁহাদের হস্তেই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার ভার সমর্পণ করিলেন। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, ইঁহারা শিষ্যপরম্পরায় বহুকাল যাবৎ এই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিবেন। আর কাহারও রক্ষা করিবার শক্তি নাই। ভারতের যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় মৃত; লোকে মৃত ধর্ম্ম যাজন করিতেছে, কেবল গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যেরা জীবন্ত ধর্ম্ম যাজন করিতেছেন।

গোস্বামী মহাশয় এই ব্রাহ্মদলের প্রকৃতি বেশ বুঝিতেন। তিনি ইঁহাদিগকে কেবল একটী বিধি দিলেন, ভগবানের নাম করিবে; আর তিনটি নিষেধ মানিয়া চলিতে বলিলেন; উচ্ছিষ্ট ও মাংস খাইবে না, আর নেশা করিবে না। আর কোন কথা বলিলেন না। নাম দিবার সময় কোন হিন্দু দেবদেবীর নাম উল্লেখ করিলেন না। উপাস্য দেবতারও পরিচয় দিলেন না। তিনি বেশ বুঝিতেন, যদি ইঁহাদের সমক্ষে হিন্দু দেবদেবীর নাম উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে ইঁহারা সহ্য করিতে পারিবেন না, গুরুকে পৌত্তলিক মনে করিয়া পরিত্যাগ করিবেন।

সাধন লইবার সময় অপর একদল লোক বলিয়া বসিল, "মহাশয় আমরা ভজনসাধনের ধার ধারি না, শান্ত শিষ্ট হইয়া ভজন করিব এ প্রবৃত্তি আমাদের নাই। আমাদের মন কুপথেই ধাবিত। আমরা যে নষ্টামি দুষ্টামি করিয়া আসিতেছি, তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিব না; ইহাতে যদি আপনি আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন, তবে অগ্রসর হউন নতুবা এইখান হইতেই বিদায় দিউন। যাঁহারা সৎলোক এবং ভজন সাধন করিতে সক্ষম, তাঁহারা নিজের গুণেই ধর্ম্মলাভ করিয়া থাকেন, নিজের গুণেই উদ্ধার হইয়া যান। আমাদের যদি সে সব গুণ থাকিত, তবে আপনার নিকট কেন আসিব? সে সব গুণ নাই বলিয়াই ত আপনার নিকট আসিয়াছি, আপনি যে বলিবেন সত্যবাদী হও, জিতেন্দ্রিয় হও শান্ত শিষ্ট সদাচারী হও, মনকে সংযত করিয়া ভজনসাধন কর, তাহা হইলে আমাদের পোষাইবে না; আমরা এ সব কিছুই করিতে পারিব না, আমরা যেমন আছি ঠিক তেমনি থাকিব। ইহাতে যদি আপনি আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন, তবে অগ্রসর হউন, আর যদি না পারেন তবে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিউন।"

গোস্বামী মহাশয় ইহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন—

গোস্বামী—তোমরা মাংস খাইতে পাইবে না, আর আমি যে নাম দিব সেই নামটি প্রতিদিন আধঘণ্টা জপ করিতে হইবে, পারিবে ত ?

আগন্তুকগণ—(কেহ কেহ বলিল) খুব পারব, (আবার কেহ কেহ বলিল) আধঘণ্টা নাম করিতে পারব না, ঠিক কথা বলাই ভাল।

গোস্বামী মহাশয়—দশ মিনিট নাম করিতে পারিবে ?

আগন্তুকগণ—(কেহ কেহ বলিল) তাহাও পারিব না।

গোসাঁই—পাঁচ মিনিট নাম করিতে পারিবে।

আগন্তুকগণ—(কেহ কেহ বলিল) তাহাও পারিব না।

গোসাঁই—পাঁচবার নাম করিতে পারিবে ?

আগন্তুকগণ—তাহা না পারিলে চলিবে কেন ? (কিন্তু কেহ কেহ বলিলেন "মহাশয় ইহাতেও সন্দেহ"।

গোসাঁই—দিনান্তে একবার নাম করিতে পারিবে ? অন্ততঃ আমার নিকট তোমরা যে দীক্ষা লইয়াছ, এ কথাটা স্মরণ করিতে পারিবে ?

এইবার সকলে চুপ করিলেন। তখন গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "তোমাদের যত ক্ষমতা তাহা জানা আছে, তোমরা আর সাধনভজন কি করিবে! এবার গুরু তোমাদের ভার গ্রহণ করিলেন। তোমরা পেট ভরিয়া খাও, আর মাঠ ভরিয়া শৌচে যাও।" ইঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এই শ্রেণীর লোক।

গোস্বামী মহাশয় তদীয় গুরুদেবের নির্দ্দেশে ব্রাহ্মভাবে অবস্থিত থাকিলেন, যখন আর এভাবে থাকিবার আবশ্যকতা রহিল না, তখন ক্রমেই বৈষ্ণব অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন।

যাহা হউক এই 'কুচ নেহি মাঙ্গতা' দল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট

দীক্ষাগ্রহণের পরও নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। তাহারা আপনাদের মধ্যে এইরূপ আন্দোলন করিতে লাগিল, "আমরা স্বাধীনচেতা সাম্যমৈত্রী ও স্বাধীনতার পক্ষপাতী; গুরুবাদ প্রকাশ্যভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি; মধ্যবর্ত্তিবাদ আমাদের অন্তরে আদৌ স্থান পায় নাই, আমরা পিতামাতা আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়াছি। সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়াছি। আবার ধর্ম্মলাভের মোহে পড়িয়া একজন মানুষের নিকট মস্তক অবনত করিলাম! তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলাম। আমরা কি ভ্রান্ত? দেখ ভাই, আমরা ২।৩ বৎসর গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষিত হইয়াছি; আমাদের মধ্যে ধর্ম্মলাভের কথা দূরে থাকুক, একাল পর্য্যন্ত কোন প্রকার পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইতেছি না, আমরা যেমন ছিলাম ঠিক তেমনি আছি। গোস্বামী মহাশয় কি আমাদিগকে প্রতারিত করিলেন? আমাদিগকে ধিক্। আমরা এই প্রতারণা কোনক্রমে সহ্য করিব না।" এই বলিয়া তাহারা একদিন দলবদ্ধ হইয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,

শিষ্যগণ—আমরা এতদিন আপনার নিকট দীক্ষিত হইয়াছি, আমাদের মধ্যে ত কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে না, আমরা যেমন ছিলাম ঠিক তেমনিই রহিয়াছি। দীক্ষাগ্রহণের ফল কি?

গোস্বামী মহাশয়—তোমাদের মধ্যে কি এ পর্য্যন্ত কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই?

শিষ্যগণ—না; কোন পরিবর্ত্তনই দেখা যাইতেছে না।

গোস্বামী মহাশয়—পূর্ব্বে সাধু সন্ন্যাসী দেখিলে তোমাদের কি মনে হইত?

শিষ্যগণ—ঠাইস্ ঠাইস্ করিয়া চড়াইয়া দিতাম।

গোস্বামী মহাশয়—আগে ঠাকুর দেখিলে তোমাদের কি মনে হইত?

শিষ্যগণ—ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া ফেলিয়া দিতাম।

গোস্বামী মহাশয়—শাস্ত্রগুলি কি মনে হইত।

শিষ্যগণ—কেবল গাঁজাখুরী আর উপন্যাস।

গোস্বামী মহাশয়—পিতামাতা গুরুজনকে কি মনে হইত?

শিষ্যগণ—মূর্খ বেকুব কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

গোস্বামী মহাশয়—এখন সাধু সন্ন্যাসী দেখিয়া কি মনে হয়?

শিষ্যগণ—ভালই লাগে।

গোস্বামী মহাশয়—ঠাকুর দেখিয়া কেমন লাগে?

শিষ্যগণ—ভাল লাগে

গোস্বামী মহাশয়—শাস্ত্রগুলি এখন কেমন লাগে?

শিষ্যগণ—মনে হয় সব সত্য।

গোস্বামী মহাশয়—পিতামাতা প্রভৃতিকে কেমন লাগে?

শিষ্যগণ—তাঁহাদিগকে দেখিলে ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়; মন পুলকিত হয়।

গোস্বামী মহাশয়—তবে কেমন করিয়া বলিতেছ তোমাদের মধ্যে কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। এগুলি কি পরিবর্ত্তন নহে?

শিষ্যগণ—এরূপ পরিবর্ত্তন অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

গোস্বামী মহাশয়—তোমরা যে প্রকৃতির লোক, ইতিমধ্যে এইটুকু যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহাই যথেষ্ট; যাও নাম করগে।

এই কথা শুনিয়া সকলে অপ্রতিভ হইল। তাহারা প্রাণপণে নাম-সাধনে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের একটা দৃষ্টি নিজের উপর থাকিল, আর একটা দৃষ্টি গোসাঞীর উপর থাকিল। তাহারা নিজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ত্রুটীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মালা-তিলক

কেহ কেহ বলেন, গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের গলায় মালা নাই; কপালে তিলক নাই, অনেকে মাছ খায়; জপের মালা নাই, হরিনাম নাই • একাদশী করে না। ইহারা প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্ম, ইহারা বৈষ্ণবের ভাণ করে মাত্র। ইহাদিগকে কদাচ বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে না।

আমি দেখিতেছি, গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের ন্যায় বৈষ্ণব বড়ই দুর্লভ। আপনারা যে সব বৈষ্ণব দেখিতে পান, ইঁহাদের মধ্যে সাজা বৈষ্ণবই অধিক। লোকে বাহির দেখে ভিতর দেখিতে পায় না। যদি ভিতরটা দেখিতে পাইত, তাহা হইলে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণকে কেহ অবৈষ্ণব বলিত না। আমি এই অভিযোগগুলির একে একে উত্তর দিতেছি। প্রথমতঃ মালা-তিলকের কথা বলিব।

লোকে নানা ভাবে মালাতিলক ধারণ করে। গোস্বামী মহাশয় যখন তিলক করিতেন তখন দ্বাদশ অঙ্গে ভগবানের দ্বাদশ রূপ দেখিতে পাইতেন। যতক্ষণ ভগবানের রূপ তাঁহার নিকট প্রকাশিত না হইত ততক্ষণ তিলক করিতেন না। বৈষ্ণবের তিলক করা কর্ত্তব্য, এই জ্ঞানে তিনি তিলক করিতেন না। তিনি জানিতেন, মালাতিলক ধারণ করিবার একটা সময় আছে। সেই সময় উপস্থিত না হইলে মালাতিলক ধারণ করা কর্ত্তব্য নয়। অসময়ে মালাতিলক ধারণ করিলে তাহার মর্য্যাদা বুঝা যায় না। বিশেষ কোন উপকারও হয় না।

আপনারা গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের পরিচয় পাইয়াছেন; এই "কুছ নেহি মাস্তার" দলের মধ্যে ভক্ত শ্রীধরচন্দ্র ঘোষ প্রথমে মালা-তিলক

ধারণ করিলেন। পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীধরের বৈষ্ণব-বেশ দেখিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—

শ্যামাকান্ত বাবু—তুই উচ্ছন্ন গিয়াছিস্, তোর মতিভ্রম হইয়াছে, এতকাল ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া শেষে এই দশা। মালা ছেঁড়্, তিলক মুছিয়া ফেল, আর ভণ্ডামী করিতে হইবে না। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের মধ্যে আবার ভণ্ডামী আরম্ভ হইল। (এই সময় গোস্বমী মহাশয় তিলক করিতেন না)।

শ্রীধর—ভাই পণ্ডিত, কুত ধানে কত চাল তাত তুমি জান না; মালা-তিলক ধারণ করায় আজ তুমি আমাকে এত তিরস্কার করিলে; কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যদি কিছুদিন বাঁচিয়া থাকি তোমাকেও মালা-তিলক ধারণ করিতে দেখিব।

পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঘোর ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার প্রতিপত্তি যথেষ্ট। তাঁহার দৃষ্টান্তে বহুলোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীধরের মালা ও তিলক ধারণ শ্যামাকান্তের সহ্য হইল না, তিনি শ্রীধরের বৈষ্ণববেশ দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া ঐ রূপ তিরস্কার করিয়াছিলেন।

শ্যামাকান্ত বাবু গোস্বামী মহাশয়ের নিকট যে গুরু-শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, ভজন করিতে করিতে সেই শক্তি ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিল। গুরুশক্তি প্রবল হওয়ায় মালা-তিলক ধারণের জন্য তাঁহার প্রাণে বিষম আকর্ষণ উপস্থিত হইল; তিনি মালা-তিলক ধারণের জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন। ১৩০০ সালের পৌষ মাসে প্রয়াগে গঙ্গাতীরে তিনি গোস্বামী মহাশয়ের চরণপূজা করিয়া বলিলেন,

শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়—মালা-তিলক ধারণ জন্য কিছুকাল হইতে ভিতরে একটা বিষম আকর্ষণ হইয়াছে, আমি দিন দিন অস্থির হইয়া পড়িতেছি। আমি কি করিব অনুমতি করুন।

গোসাঁই—আপনার মালা-তিলক ধারণ করিবার সময় হয় নাই ; এখনও অনেক বিলম্ব আছে ; ভজন করুন, সময় হইলে মালা-তিলক ধারণ করিবেন। সকল কার্য্যেরই একটা সময় আছে, সে সময় উপস্থিত না হইলে সে কায করিতে নাই। আপনি মনকে সংযত করুন।

এই ঘটনার পর দুই বৎসর কাটিয়া গেল ; পণ্ডিত মালা-তিলক ধারণ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার ভিতরের আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি অস্থির হইলেন ; কিন্তু গুরু-আজ্ঞা ব্যতীত মালা-তিলক ধারণ করিতে পারিলেন না।

আমি কলিকাতা গমন করিয়া একদিন গোস্বামী মহাশয়কে বলিলাম,—

আমি—পণ্ডিত মহাশয়, মালা-তিলক ধারণ করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার আর সোয়াস্তি নাই। তিনি ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন।

গোসাঁই—এখন তাঁহার মালা-তিলক ধারণের সময় হইয়াছে, এইবার তিনি মালা-তিলক ধারণ করিতে পারেন।

আমি বোলপুরে আসিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে গোস্বামী মহাশয়ের অনুমতি জ্ঞাপন করিলে তিনি অতি আনন্দের সহিত মালা-তিলক ধারণ করিয়া সুস্থ হইলেন।

আমার সতীর্থ বাবু অমরেন্দ্র নাথ দত্ত ঘোর শাক্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; তাঁহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল শাক্ত। তিনি রাজাবাবু নরেন্দ্র নাথ দত্তের পৌত্র এবং হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিখ্যাত জজ্‌ দ্বারাকানাথ মিত্রের দৌহিত্র। নিবাস কলিকাতা ভবানীপুর। তাঁহাকে আমি বারবার মালা তিলক-ধারণ করিতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হন নাই। অবশেষে একদিন আসনে বসিয়া স্থিরভাবে নাম জপ

করিতেছেন এমন সময় বাণী শুনিলেন, "মহাপ্রভুর অনুগত হইয়া ভজন কর।" এই কথা শুনিয়া তিনি মালা-তিলক গ্রহণ করিয়াছেন। এখন তাঁহার মধ্যে বৈষ্ণবভাব অতি প্রবল।

বাবু মোহিনীমোহন রায় প্রভৃতি গোস্বামী মহাশয়ের বহু ব্রাহ্ম শিষ্য গুরুদত্ত নামের বলে বাধ্য হইয়া মালা-তিলক ও বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করেন। আমার নিজেরও ঐরূপ অবস্থা হওয়ায় আমি একদিন গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম,

আমি—মহাশয় আমরা ব্রাহ্ম, আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস অন্যরূপ, আমরা দেখিতেছি যে, আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ও আচারব্যবহার যেরূপ ছিল তাহা সমস্তই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, আমরা আমাদের চিরাভ্যস্ত মত-বিশ্বাসে স্থির থাকিতে পারিতেছি না, ক্রমে ক্রমে সকলে বৈষ্ণব হইয়া পড়িতেছি, ইহার কারণ কি ?

গোসাঁই—এই জন্যই ত এত আয়োজন করিতে হইয়াছে।

এই কথায় আমি বুঝিলাম, আমাদিগকে কালে বৈষ্ণব হইতেই হইবে। আমরা চেষ্টা করিয়াও আপন মতে স্থির থাকিতে পারিব না, ফলে তাহাই হইতেছে দেখিতেছি। যাহারা মালা-তিলকের ঘোর বিরোধী এবং বৈষ্ণব-দ্বেষী, তাহারাই সর্ব্বাগ্রে মালা-তিলক ধারণ করিতেছে এবং বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করিতেছে, তাহাদের মধ্যেই বৈষ্ণবভাব প্রবল।

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির মালা-তিলক ধারণের অবস্থা না হইলেও তাঁহারা কেবল শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য মালা-তিলক গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, "আমরা শাস্ত্রের দাস, শাস্ত্রের অনুশাসন না মানিলে, শাস্ত্র-প্রণেতা ঋষিগণের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয় না, তাঁহাদের নিকট আমাদের অপরাধ হয়।" কেবল এই জন্যই তাঁহারা মালা-তিলক ধারণ করিয়াছেন।

আবার কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা মালা-তিলক ধারণ করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন, "গোসাঁই আমাদিগকে মালা-তিলক ধারণ করিতে অনুমতি দেন নাই; যদিও তাঁহার গলদেশে মালা ও ললাটে তিলক ছিল, কিন্তু আমাদের তাহা অনুকরণ করা কর্ত্তব্য নয়। তাঁহার অবস্থা লাভ হইয়াছিল, তিনি মালা-তিলক ধারণ করিয়াছিলেন। আমাদের যখন সে অবস্থা লাভ হইবে, তখন আমরাও মালা-তিলক ধারণ করিব। যে যেমন লোক তাহার তেমনি থাকাই কর্ত্তব্য। অসাধু ব্যক্তির সাধুর বেশ গ্রহণ করা কপটতা ও অপরাধ। আমরা নিজে অসাধু, অসাধুর বেশেই থাকিব। যদি কখনও সময় হয়, তখন মালা-তিলক ধারণ করিব। লোকের মনোরঞ্জন বা অন্যের অনুকরণ করিয়া আমরা মালা-তিলক ধারণ করিতে পারিব না।" এই সকল লোক মালা-তিলক ধারণ করেন না। এজন্য গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের উপর অভিযোগের বিশেষ কারণ দেখা যায় না।

আমাদের দেশে অনেকে সাম্প্রদায়িক চিহ্ন মনে করিয়া মালা-তিলক ধারণ করেন। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের কোন সম্প্রদায় নাই, সুতরাং সম্প্রদায়ের চিহ্নরূপে ইঁহারা মালা-তিলক গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মনে করেন, মালা-তিলক ধারণ করাই একটা ধর্ম্ম। যে ব্যক্তির গলায় মালা নাই, ললাটে হরিমন্দিরের তিলক নাই, সে ব্যক্তি যত কেন সাধু হউক না, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা তাঁহাদিগকে পতিত মনে করেন। তাঁহারা তাঁহাদের হাতের জল পর্য্যন্তও ব্যবহার করেন না। যাহাদের গলায় মালা নাই ও যাহাদের কপালে হরিমন্দিরের তিলক নাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা তাহাদিগকে নারকী বলেন; তাহাদের দেহ শ্মশানতুল্য, তাহারা অস্পৃশ্য।

আবার এই বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেকে মনে করেন, মালা-তিলক ধারণ

করিলেই ধর্ম্ম হইয়া গেল ; যে ব্যক্তি মালা-তিলক ধারণ করে তাহার উপর যমের অধিকার নাই।

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ এত সস্তা ধর্ম্ম চান না। এবং মালা-তিলকহীন ব্যক্তিগণকে পতিত বা নারকী বলিতে রাজি নহেন। তাঁহারা লোকের অন্তরের সাধুতাই দেখিয়া থাকেন। বেশ দেখিয়া বিচার করেন না।

মালা-তিলক ধারণ বৈষ্ণববেশ। মালা তিলক ধারণ করা বৈষ্ণবের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বেশে কি আছে জানি না। এই বেশ দেখিলেই প্রাণে আনন্দ হয়। মনে পবিত্রতা জাগিয়া উঠে, গুরুশক্তি উদ্বুদ্ধ হয় ও নাম আপনা হইতে বলিতে থাকে। ইহা আমার পরীক্ষিত বিষয়। এ অবস্থা কিন্তু পূর্ব্বে ছিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মৎস্যাহার

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের উপর আর একটী অভিযোগ এই যে, ইঁহাদের মধ্যে মৎস্যাহার প্রচলিত আছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গোস্বামী মহাশয় শিষ্যগণের প্রকৃতি বুঝিয়া কাহাকেও বৈষ্ণবাচারে উপদেশ দেন নাই। কেবল নেশা করিতে ও মাংস খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। মৎস্যাহার-সম্বন্ধে কোন নিষেধ-বিধি নাই।

যখন এই সাধন প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তখন দেশে মৎস্যাহার প্রচলিত ছিল না, মদ্যপান ও মাংসাহার প্রচলিত ছিল। এ কারণ এই সাধনায় মদ্যমাংসের ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছিল। মৎস্যাহার-সম্বন্ধে

কোনো বিধান হয় নাই। অনার্য্যদের সহিত মিশিয়া বাংলা দেশের লোক মাছ খাইতে শিখিয়াছে।

মৎস্য তামসিক আহার। যাঁহারা ধর্ম্মলাভ করিতে চান, কদাচ তাঁহাদের ইহা খাওয়া কর্ত্তব্য নয়; ইহাতে শরীরে তমোগুণ বৃদ্ধি পায় এবং দয়াবৃত্তির পরিপুষ্টির পক্ষে বাধা জন্মে। মাছ খাওয়া ও মাছ মারার প্রায় একই ফল। যাহারা মাছ খায় তাহাদের মাছ মারিতে বিশেষ কষ্ট বোধ হয় না। লোভ পরিবর্দ্ধিত হয়।

এই পৃথিবীর যাবতীয় সাধু লোকের মধ্যে জীবহিংসা নাই। কেহই মৎস্যমাংস খান না। আমাদের দেশের শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে পশুবলি আছে বটে, কিন্তু ইহা তামসিক পূজা বলিয়াই শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে মানুষের ধর্ম্মলাভ হওয়া দূরে থাকুক, অধর্ম্মই হইয়া থাকে; সাত্ত্বিক পূজায় পশুবলি নাই। ভক্ত রামপ্রসাদ প্রভৃতি শাক্ত সাধুগণ পশুবলির নিন্দাই করিয়া গিয়াছেন।

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের অনেকে পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী এবং প্রায় সকলেই শাক্ত সম্প্রদায়ের লোক। গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা-গ্রহণের কিছুদিনের পর হইতেই তাঁহাদের বাটিতে শক্তিপূজায় যে পশুবলি হইত, তাহা তাঁহারা উঠাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে গ্রামবাসী লোক অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া প্রথমতঃ হাহাকার করিয়াছিলেন, কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের কোন অনিষ্ট না হওয়ায় তাঁহারাও পূজার ব্যয়লাঘব জন্য ক্রমে ক্রমে পশুবলি উঠাইয়া দিতেছেন।

পূর্ব্ববঙ্গে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়, তথাকার লোকদের মৎস্যই প্রধান খাদ্য। বিধবা ব্যতীত বড় কেহ নিরামিষ আহার করে না। গোস্বামী মহাশয় মৎস্যাহার নিষিদ্ধ করিয়া দিলে অনেকে সাধন লইতে কুণ্ঠিত হইত, আর শিষ্যগণের আহারে একটা ক্লেশ উপস্থিত হইত। তিনি বেশ

জানিতেন, সময়ে নামের শক্তি মৎস্যাহার বন্ধ করিয়া দিবে এবং বৈষ্ণবাচার আনয়ন করিবে। বাস্তবিক তাহাই ঘটিতেছে, যাঁহারা সাধনপথে অগ্রসর হইতেছেন তাঁহারা মৎস্য খাইতে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছেন। নাম করিতে করিতে দেহের পরমাণুর গুণ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যাহারা মাছ খাইতে পূর্ব্বে খুব ভালবাসিত, তাহারা আর মাছ খাইতে পারিতেছে না। মাছ খাইলে শরীরে সহ্য হয় না, মুখেও রুচি হয় না। মাছের দুর্গন্ধ অতি তীব্র বলিয়া বোধ হয়।

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য ভক্তিভাজন সরলনাথ গুহ ঠাকুরতার বাটি বরিশাল জেলার অন্তর্গত বানরীপাড়া। পূর্ব্বে ইনি যথেষ্ট মৎস্য খাইতেন। গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষাগ্রহণের পর নামের শক্তিতে তাঁহার শরীরের পরমাণুর গুণ এমনি পরিবর্ত্তিত হইল যে, তাঁহার শরীরে আর মৎস্যাহার সহ্য হইল না।

পুরীতে অবস্থিতিকালে তিনি নিদারুণ রোগযন্ত্রণায় শয্যাশায়ী হইলেন। ডাক্তারী ও কবিরাজি বহু চিকিৎসা হইল। তখন সরলনাথ গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন—

সরলনাথ—আর রোগযন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছি না, হয় আমাকে মারিয়া ফেলুন, নতুবা যন্ত্রণার উপশম করিয়া দিউন।

গোসাঁই—সরলনাথ, সবই পারি; কিন্তু তাহা হইলে আবার আসিতে হইবে। ঔষধের দ্বারা তোমার যে যন্ত্রণার উপশম হইবে না কেবল এইটি দেখাইবার জন্যই এত চিকিৎসা করাইলাম। কিছুদিন যন্ত্রণা ভোগ কর, নাম করিতে থাক, ঐ যন্ত্রণা কিছুই থাকিবে না, সময়ে শান্তিলাভ করিবে।

সরলনাথ—গোসাঁই! মনুষ্যজীবনের এত ক্লেশ, আর সহিতে পারিব

না, এই জন্মে যত ভোগাইতে হয় ভোগাইয়া লউন। আর যেন আমাকে জন্মগ্রহণ করিতে না হয়।

কিছুকাল রোগযন্ত্রণা ভোগের পর সরলনাথ ঢাকায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সতীর্থগণের যত্নচেষ্টায় তথাকার ভাল ডাক্তার সরলনাথের চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। শরীরের দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহারা মাগুর মাছের ঝোল খাইবার ব্যবস্থা করিলেন। সরলনাথ বলিলেন, "আমার দেহে মৎস্যাহার সহ্য হইবে না, মাছের ঝোল খাইবার ব্যবস্থা করিবেন না"। ডাক্তারগণ রোগীর কথা শুনিলেন না; মাংসের ঝোল কিছুতেই খাইবেন না বলিয়া মাগুর মাছের ঝোল খাইবার ব্যবস্থা করিলেন। মাছের ঝোল খাইলেই সরলনাথের রক্তবমি হইতে লাগিল। সরলনাথ ডাক্তারগণকে বলিলেন, "আমার দেহে মাছের ঝোল কোন রকমে সহ্য হইবে না, আপনারা এ ব্যবস্থা করিবেন না"। ডাক্তারগণ কিছুতেই সরলনাথের কথা শুনিলেন না, পরে যখন পুনঃ পুনঃ মাছের ঝোল খাওয়াইয়া পুনঃ পুনঃ রক্তবমন হইতে লাগিল, তখন তাঁহারা অগত্যা মাছের ঝোল খাওয়ান বন্ধ করিয়া দিলেন।

ডাক্তারগণ রোগের কোনো প্রতিকার করিতে না পারিয়া চিকিৎসা পরিত্যাগ করিলেন, ফলতঃ কিছুকাল রোগযন্ত্রণা ভোগের পর সরল নাথ আপনা হইতে রোগমুক্ত হইলেন, তাঁহার যন্ত্রণা দূর হইল।

গোস্বামী মহাশয়ের বহু শিষ্যই ক্রমে ক্রমে মৎস্যাহার পরিত্যাগ করিয়াছেন ও করিতেছেন। যাঁহারা সাধনপথে কিছু দূর অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদের মৎস্য প্রভৃতি তামসিক আহার আর ভাল লাগিতেছে না; তাঁহাদের রুচি ও প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তাঁহরা সাত্বিক আহারের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছেন।

গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্ম জীবন্ত ধর্ম্ম। ইহা চিন্তা বিচার বা মতের,

ধর্ম্ম নহে। যে মহাশক্তি শিষ্যগণের ভিতর কাজ করিতেছে, সেই শক্তি শিষ্যগণকে নূতন ছাঁচে গড়িয়া তুলিতেছে। শিষ্যগণের মত বিচার চিন্তা বিশ্বাসাদি সমস্তই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ঠিক করিয়া লইতেছে। কাহার সাধ্য এই মহাশক্তির গতি রোধ করে? যাহারা আদৌ সাধনভজন করে না কেবল তাহাদেরই মধ্যেই এই শক্তি নিদ্রিত হইয়া পড়িতেছে, কাজ করিতেছে না। একারণ সতীর্থগণকে বলিতেছি, যিনি যাহাই করুন নাম ছাড়িবেন না। নাম ছাড়িলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। আর ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারিবেন না। অবিশ্রান্ত নাম করিতে থাকুন, কোন ভাবনা নাই নিশ্চয়ই আপনারা পরাশান্তি লাভ করিবেন।

নবম পরিচ্ছেদ

সদাচার ও সদাহার

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের উপর বৈষ্ণবগণের আর একটি অভিযোগ এই যে, গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ উষণা চাউল ভক্ষণ করিয়া থাকেন, মুড়ি খাওয়াটা দূষণীয় মনে করেন না। দেশ কাল পাত্র অনুসারে শাস্ত্রের ব্যবহার হইয়াছে। আবশ্যকমত শাস্ত্রশাসন সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। মনুর সময়ের সমস্ত শাস্ত্রীয় ব্যবহার এখন আর চলিতে পারে না। যে দিন ভারতবর্ষে বৈদেশিক আধিপত্য সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে শাস্ত্রকারগণ আবশ্যকমত শাস্ত্রীয় শাসন পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

পূর্ব্বে এমন অনেক লোক ছিলেন, যাঁহারা বলদের চাষের উৎপন্ন দ্রব্য আহার করিতেন না। বৃষের দ্বারা ভূমিকর্ষণ হইলে ঐ ভূমির উৎপন্ন শস্য আহার করিতেন। এখন এ সব কথা স্বপ্নবৎ।

আমাদের দেশে বহু ঠাকুর বাড়ীতে এখন উষণা চাউলে বিগ্রহসেবা

হইতেছে। এদেশের দোকানে যে সকল আতপ চাউল বিক্রয় হয়, তাহার অধিকাংশ শ্রাদ্ধের আতপ বা ঠাকুরপূজার আতপ। দোকানদার-গণ এই সব আতপ অল্প মূল্যে খরিদ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে। তৈল, লবণ, ঘৃত চিনি ময়দা কিছুই পবিত্র বা বিশুদ্ধ নহে। একালে পূর্ব্বের ন্যায় বিশুদ্ধভাবে সদাচার রক্ষা করিয়া চলা অসম্ভব। সুতরাং শাস্ত্রে ও সময়োচিত মতব্যবস্থা হইয়াছে।

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ সংসারী, চাকুরে লোক, যাঁহার যতদূর সাধ্য তিনি ততদূর বিশুদ্ধভাবে আহার করিয়া থাকেন। যাঁহাদের অর্থ ও সুবিধা আছে, তাঁহারা বিশুদ্ধ আতপ বিশুদ্ধ ঘৃত ইত্যাদি- আহার করিয়া থাকেন। যাঁহাদের সে সুবিধা নাই, তাঁহারা বাধ্য হইয়া বাজারের বিক্রেয় সাধারণ জিনিষ খাইয়া থাকেন। ইঁহারা সাধ্যমতে অসাত্ত্বিক বা অবিশুদ্ধ বস্তু আহার করিতে প্রস্তুত নন।

যখন উষণা চাউল প্রচলিত আহারের মধ্যে হইয়াছে, তখন মুড়ি খাওয়াটা দূষণীয় হইতে পারে না। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের মুড়ি খাওয়া দেখিয়া অনেকে চটিয়া যান। মুড়ি কিন্তু সাত্ত্বিক আহার জানি-বেন। যাহা সহজে পরিপাক হয় ও যাহাতে পেট গরম হয় না, তাহাই সাত্ত্বিক আহার। পেঁয়াজাদি অসাত্ত্বিক আহার গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ স্পর্শ করেন না ; অথচ এই কদাহার আমাদের দেশের ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যেও দিন দিন অধিকতর প্রচলিত হইতেছে।

উষণা চাউল রাজসিক বা তামসিক আহার নহে, উহাতে ভজন-সাধনের কিছু বিঘ্ন হয় না। যাহা ভজনসাধনের বিঘ্নকর তাহাই সর্ব্বতো-ভাবে পরিত্যজ্য। অনেকে সদাহারটাই একটা ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ তাহা মনে করেন না, তাঁহারা এইমাত্র জানেন সদাচার ও সদাহার সাধনভজনের অনুকূল।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে প্রায়ই উচ্ছিষ্ট-বিচার নাই। শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে প্রায়ই ভজন নাই, সাধন নাই। একারণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ সাধ্যপক্ষে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য বা প্রশিষ্যগণের বাটি ভিন্ন অন্যত্র আহার করিতে সম্মত হন না। এমন কি আত্মীয়-বন্ধুগণের বাটিতে আহার করিতেও নারাজ। পাছে অন্যত্র আহার করিতে হইলে উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে হয়, এই ভয়ে তাঁহারা সাবধানে চলেন।

এই সদাচারের ও সদাহারের অভাব বশতঃই গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য-গণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য ও প্রশিষ্যগণের বাড়িতেই আপনাদের পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে সচেষ্টিত।

উপবাস, ব্রতনিয়মাদি যাঁহার যতটুকু সাধ্য তিনি ততটুকু প্রতিপালন করিয়া থাকেন। এই সকল আচরণে যে একটা ধর্ম্ম হয়, একথা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না, কেবল শাস্ত্রের মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য আচরণ করিয়া থাকেন। উপবাসাদি যদি কাহারও ভজনের প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে উপবাসাদি করিয়া ভজন নষ্ট করিতে ইঁহারা প্রস্তুত নহেন। যাহা ভজনের প্রতিকূল তাহা ইঁহাদের নিকট সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। যাহা ভজনের অনুকূল তাহা ইঁহারা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। এইজন্য লোকচক্ষে ইঁহাদের আচরণ দৃষ্টিকটু হইয়া থাকে। ইঁহারা লোকের মনোরঞ্জন করিতে চান না। যাহাতে নিজের কল্যাণ হয়, তাহার প্রতিই ইঁহাদের দৃষ্টি আছে। ইঁহারা সদাচারমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন না, ইহা কেবল ধর্ম্মসাধনের অনুকূল, এই জন্য গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের মধ্যে সদাচারের বৃথা আড়ম্বরের বাড়াবাড়ি নাই। যাহা প্রয়োজন তাহাই আছে।

অনেক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভিক্ষার্থী হইয়া আমার বাসায় উপস্থিত হইয়া থাকেন। ইঁহাদের সদাচারের বাড়াবাড়ি প্রযুক্ত সময়ে সময়ে বড়ই আশ্রম-পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে।

যে ঘরের মধ্যে কখনও মৎস্য পাক হইয়াছে, সে ঘরের মধ্যে রান্না করিয়া খাইতে কেহ কেহ, আপত্তি করেন। যে চুল্লীতে কখনও মৎস্য রান্না হইয়াছে, কেহ কেহ তাহাতে পাক করিয়া খাইতে প্রস্তুত নহেন। কেহ কেহ লোহার কড়াই ও লোহার হাতা ব্যবহার করেন না ; তাঁহাদের জন্য পিতলের হাতা ও পিতলের কড়াই চাই। যাহার গলায় মালা নাই তাহার জলে কোন কাজ হইবে না। যে বাসনে মাছ খাওয়া হইয়াছে, সেই বাসন যদি অন্য বাসনের সহিত স্পর্শিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বাসনের ব্যবহার চলিবে না। যাহার গলায় মালা নাই, সে যদি তরকারি কুটিয়া দেয় বা খই ভাজে তাহা গ্রহণ করা হইবে না। গৃহস্থের শিলে বাটনা-বাঁটা হইবে না, নূতন শিলের প্রয়োজন।

সদাচারের এ সব খুঁটিনাটি গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যদের নাই। ইঁহারা মনে করেন, যাহা ভজনের অনুকূল তাহাই গ্রহণীয়, আর যাহা ভজনের প্রতিকূল তাহাই পরিত্যাজ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিষ্যগণের অনুরাগ

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ গুরুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে লাগিলেন ; ক্রমে তাঁহারা দেখিলেন, শাস্ত্রে মহাপুরুষের যে সমস্ত লক্ষণ বর্ণিত আছে, গোস্বামী মহাশয়ে সেই সব লক্ষণ বর্ত্তমান। ইঁহার নিকটে নিন্দাস্তুতি, লাভালাভ সবই সমান। ইনি ভয় ভাবনা চিন্তা উদ্বেগের অতীত। শোক মোহ ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কামক্রোধাদি রিপুগণ ইঁহার নিকট পরাস্ত। ইনি অভ্রান্ত সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ও ত্রিকালজ্ঞ। ইঁহার কোন বাসনা কামনা কল্পনা জল্পনা নাই। ইনি সত্যবাক্ মায়াতীত মহাপুরুষ। ইনি সদাই ভগবৎ-প্রেমসাগরে নিমজ্জিত। ইনি সংসারের অতীত স্থানে নিয়ত বাস করিতেছেন।

গুরুর এতাদৃশ মহিমা দেখিয়া এবং তাঁহার মধুর চরিত্র ও ভালবাসায় বিমোহিত হইয়া শিষ্যগণ গুরুতেই আত্মসমর্পণ করিলেন। গুরুবাক্য তাঁহাদের নিকট বেদবাক্য। শাস্ত্রে বরং ভুল থাকিতে পারে কিন্তু গুরু-বাক্যে ভুল নাই, কারণ ইনি মায়াতীত পুরুষ। মায়াই ভ্রান্তি আনিয়া দেয়, যিনি মায়ার অতীত তাঁহাতে কোন প্রকার ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই।

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ ক্রমে গুরুর প্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহাদের মুখে আর অন্য কথা নাই। গুরুর গুণের কথা সহস্র মুখে বলিয়াও তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা মেটে না। ঘরে বাহিরে পথে ঘাটে কেবল গুরুর কথা, মুখে আর অন্য কথা নাই। ২।৪ জন গুরু-

ভাই একত্র হইলেই কেবল গোসাঞীর কথা; কথার আদি নাই অন্ত নাই, কথা ফুরায় না! সখীগণ যেমন শ্রীমতীকে লইয়া সদাই কৃষ্ণকথায় কাল যাপন করিতেন, গোসাঞীর শিষ্যগণ সেইরূপ সদাই গোসাঞীর কথা লইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন! সংসারে সুখ নাই, সংসারে সোয়াস্তি নাই, সংসারে মন নাই; মন পড়িয়া আছে গোসাঞীর কাছে। গোসাঞীর জন্য মন সদাই হু হু করিতেছে। সকলেই সংসারে আবদ্ধ, চাকুরে মানুষ। ভাবিতেছে কখন ছুটী হইবে, কখন গোসাঞীর কাছে যাইব। ছুটীর আগে হইতেই মন ছুটাছুটী করিতেছে; ছুটী হইবা-মাত্র দৌড়! আর কি সংসারের আটক মানে? গোসাঞী-দর্শনে, তাঁহার মিলনে যে আনন্দ তাহার কি বর্ণনা আছে? কত লোক রাজা হইতে চায়, কত লোক স্বর্গ কামনা করে, ইহাদের কামনা কেবল গোসাঞী। গোসাঞী ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, আতপের সুশীতল ছায়া। গোসাঞীর কাছে গিয়া ইহারা সংসার চাকরী-বাকরী, স্ত্রী পুত্র সব ভুলিয়া যাইত।

শ্রীগুরুদেবকে সম্ভোগ করিয়া ইহাদের তৃপ্তি হইত না; ইহারা বলিতে লাগিল, "পাপী তাপী কে কোথায় আছিস্ আয়, কেন সংসার জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরছিস? গোসাঞীর পদাশ্রয় গ্রহণ কর, সকল জ্বালা দূর হইবে। এই জগতে সকলে অমৃত লাভে অমর হইবি।" ইহারা আপন আপন স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন যে যাহাকে পারিল, গোস্বামীর পদপ্রান্তে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং তাহাদের সহিত পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিল।

শিষ্যগণের সুদৃঢ় বিশ্বাস, গোসাঁই তাহাদের পরম আশ্রয়, গোসাই তাহাদের পরম সুহৃদ, গোসাই তাঁহাদের পরম সম্পদ, গোসাই তাহাদের পরমাগতি। গোসাঁই যে কেবল তাহাদের পরকালের ভার লইয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি ইহকালেরও সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

তিনি অন্নদাতা, রক্ষাকর্ত্তা, ভয়ত্রাতা এবং বিপদভঞ্জন। বালক যেমন মার কোলে থাকিয়া সিংহকেও লাথি দেখায়, গোসাঁইদের শিষ্যগণ গুরুর কোলে থাকিয়া সংসারকে অগ্রাহ্য করিতে থাকেন। সংসারের রুদ্র মূর্ত্তি ও ভ্রুকুটি দেখিয়া তাঁহারা কিছু মাত্র ভীত হন্ না। এখনও গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা গোস্বামীর কথায় অনায়াসে আহ্লাদের সহিত সংসারত্যাগ, স্ত্রীপুত্র-ত্যাগ বিষয়বৈভব-ত্যাগ অধিক কি প্রাণবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করিতে সমর্থ। গোসাঞী মরিতে আদেশ করিলে তাঁহারা এই আদেশের কারণ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিবেন না! এইরূপ গুরুভক্তি আর কোথায় দেখিতে পাইবেন? তাঁহারা জানেন, যাহা শিষ্যের কল্যাণকর গোসাঞী তাহাই করিতে বলিয়াছেন ও করিতেছেন।

গোস্বামী মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্ম শিষ্যগণ যে কি ধাতুর লোক তাহা পাঠক মহাশয় বিদিত আছেন। তাঁহারা সহজে কাহাকেও বিশ্বাস করিবার পাত্র নহেন। সহজে কাহারও কথায় ভুলিবার লোক নহেন, তাঁহারা মুর্খ নহেন সকলেই কৃতবিদ্য ও বুদ্ধিমান।

এখনকার কালে লোকে একটা সত্য কথায় কত টিকাটিপ্পণী করে, এই অবিশ্বাসের যুগে কেহ কাহাকেও সহজে বিশ্বাস করে না। কাহারও কথায় সহজে কর্ণপাত করে না। কোন কথা বলিলে, তাহার একটা উদ্দেশ্য খুঁজিতে থাকে। যদি পারিপার্শ্বিক ঘটনা অনুকূল থাকে, তবেই কথাটা বিশ্বাসযোগ্য মনে করে।

গোসাঁইয়ের শিষ্যগণ গুরুকে যে বিশ্বাস করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের ভ্রান্তবিশ্বাস নহে। কোন একটি সত্য তাঁহারা সহজে গ্রহণ করিবার পাত্র নহেন; এক একটি সত্য দশবার না বাজাইয়া গ্রহণ করেন নাই। গোস্বামী মহাশয় যে সকল মহিমার উল্লেখ করিলাম, তাঁহারা তাহার

পুনঃপুনঃ অকাট্য প্রমাণ পাইয়া তবে বিশ্বাস করিয়াছেন। পাঠক মহাশয়কে ২।৪টা প্রমাণ দিয়া একথাগুলি ভাল করিয়া বুঝাইয়া না দিলে আপনারা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। একারণে ২।৪টী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। আমার শত শত ঘটনা জানা আছে, বেশী লিখিতে হইলে পুস্তক বাড়িয়া যায়, তাহার বিশেষ প্রয়োজনও দেখি না। গোস্বামী মহাশয় শিষ্যগণকে কিরূপে রক্ষা করেন তাহা শুনুন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সতীশের জীবনরক্ষা

আমার সতীর্থ বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একজন undergraduate. যখন গোস্বামী মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন তখন সতীশ বাবু তাঁহাকে দেখিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনে রওনা হন। মোকামা ষ্টেসনে গাড়ী বদল করিতে হয়, তথায় সতীশ বাবু দেখিলেন একদল সন্ন্যাসী অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মহাতেজস্বী। তাঁহার মস্তকে জটা, গাত্র ভস্মাচ্ছাদিত, ভস্মের মধ্য হইতে শরীরের তেজ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে; পরিধানে গৈরিক বসন। এই তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সতীশের মন ভুলিয়া গেল। সতীশ মনে করিলেন, ইনি নিশ্চয়ই মহা সিদ্ধপুরুষ। সতীশ ইঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন—

—মহারাজ, আপ্‌তো সিদ্ধ মহাপুরুষ হ্যায়, আপ হামকে কৃপা কি জীয়ে।

সন্ন্যাসী—বৈঠ, বেটা, বৈঠ।

সতীশ তাঁহার নিকট সসম্ভ্রমে উপবেশন করিলেন। সন্ন্যাসী আপন বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা সতীশের ললাট স্পর্শ করিলেন। সতীশ দেখিলেন, শক্ত

শত চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পাহাড়, পর্ব্বত, নদ, নদী, সাগর, বন, উপবন, নগর, গ্রাম এক মহান চক্রাকারে তাঁহার সম্মুখে প্রবলবেগে ঘুরিতেছে। সতীশ ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য ও বিমোহিত হইলেন; তখন তিনি সতীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

—কুচ মালুম হোতা?

সতীশ—হাঁ।

সন্ন্যাসী—ক্যা মালুম হোতা?

সতীশ—শত শত চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, গ্রাম, নগর, পাহাড়, পর্ব্বত, ইত্যাদি আমার সম্মুখে এক মহান চক্রাকারে প্রবলবেগে ঘুরিতেছে।

সন্ন্যাসী—ইস্‌কো মায়া-চক্র বোলতা হায়।

সতীশ—আমি ত ঘোর মায়াচক্রে পড়িয়াছি, আমাকে মায়াচক্র হইতে উদ্ধার করুন।

সন্ন্যাসী—আচ্ছা বেটা মায়াচক্রসে উদ্ধার হোগা।

সন্ন্যাসী তিনদিন মোকামায় থাকিয়া অন্যত্র গমন করিলেন। সতীশের আর বৃন্দাবন যাওয়া হইল না। সতীশ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তাঁহার একটা মোট ছিল, তাহাতে রান্ধিবার বাঁটলো, হাতা, কড়াই, ঘটি, বকুনা ইত্যাদি থাকিত। মোট্‌টা প্রায় আধ মণ ভারি। তিনি যাইবার সময় এই মোটটা সতীশের মাথায় চাপাইয়া দিলেন। তিনি আগে আগে চলিলেন, সতীশ পিছু পিছু মোট বহিয়া চলিলেন।

এক প্রকাণ্ড বিস্তীর্ণ প্রান্তর তথায় বৃক্ষলতাদি নাই; নিকটে কোন বস্তী নাই। উভয়ে এই প্রান্তরে দ্রুতপদে গমন করিতেছেন। সতীশ ভদ্র লোকের ছেলে, কখনও মোট বহেন নাই। তিনি ভারা-

ক্লান্ত হইয়া আর বেগে চলিতে পারেন না পিছাইয়া পড়িতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী ধমক্ দিয়া বলিল, "ঝট্‌পট্ আও"। সতীশ অতিকষ্টে দ্রুতবেগে চলে, আর এক একবার পিছাইয়া পড়ে। সন্ন্যাসী পুনঃ পুনঃ ধমক্ দিতে লাগিল। যখন সতীশ ক্লান্ত হইয়া আর কোন রকমে দ্রুতপদে যাইতে পারে না, নিতান্ত অক্ষম হইয়া পড়িল, তখন সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়া সতীশকে প্রহার জুড়িল! সতীশ প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,

—মহারাজ আগে আপনার এই বোঝাটা কে বহিত ?

সন্ন্যাসী—ভূতে। আও, হামরা সাত জলদি আও।

এই বলিয়া সন্ন্যাসী আগে আগে চলিল, সতীশ পিছু পিছু চলিল। সতীশ যাইতে যাইতে মনে ভাবিতে লাগিল, এই বোঝাটা পূর্ব্বে ভূতে বহিত; আমি কি এখন ভূতের বোঝা বহিতেছি? এই মনে করিয়া সতীশ ঘৃণার সহিত মাথার বোঝাটা ঝপাত্ করিয়া ফেলিয়া দিল। বোঝাটা মাথা হইতে পড়িয়া যাওয়ায় একটা শব্দ হইল, সন্ন্যাসী এই শব্দ শুনিয়া পিছু দিকে তাকাইয়া সতীশকে গালাগালি দিয়া মারিতে আসিল, সতীশ প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিল, সে পিছু পিছু ছুটিল।

এই প্রান্তরে পথিপার্শ্বে একটা কূপ ছিল; সতীশ প্রাণভয়ে ছুটিতে ছুটিতে যখন বুঝিল সন্ন্যাসীর হস্ত হইতে আজ পরিত্রাণের উপায় নাই, তখন জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া এই কূপের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তখন সন্ন্যাসী নরহত্যা-ভয়ে ভীত হইয়া দ্রুতগতিতে প্রস্থান করিল। তখন বেলা প্রায় ১০টা বাজিয়াছে।

সৌভাগ্যক্রমে এই কূপে তখন জল ছিল না, সতীশ বিষম আঘাতে মূর্চ্ছিত হইল। রাখাল বালকেরা বহুদূরে গোচারণ করিতেছিল; এই ঘটনা তাহারা দূর হইতে দেখিতে পাইয়াছিল। বাড়ী ফিরিবার সময়

তাহারা কূপের নিকট আসিয়া সতীশকে তুলিল এবং একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে তাহাকে শোয়াইয়া রাখিয়া প্রস্থান করিল।

সতীশ বিষম জ্বরে আক্রান্ত; তাহার আর হুঁস নাই! তিন দিন বৃক্ষতলে তদবস্থায় পড়িয়া থাকিল! অনন্তর জ্বরত্যাগ হইল, সতীশের জ্ঞান হইল। এখন সতীশ ক্ষুধাতৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর। তাহার শরীর এত দুর্ব্বল যে চলৎ-শক্তি নাই; নিকটে গ্রাম বা জলাশয় নাই, বৃক্ষটি প্রকাণ্ড বটে কিন্তু চেনা যায় না; বৃক্ষে কোন ফুল বা ফল নাই; ইহা একপ্রকার বন্য বৃক্ষ। সতীশ এই দারুণ বিপদে পড়িয়া জীবনের আশা পরিত্যাগ করিল। প্রাণের মায়া বড় মায়া; সতীশ আসন্ন মৃত্যু বুঝিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল এবং ধীরে ধীরে বৃক্ষটি প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গ দিয়া এইরূপ স্তব করিতে লাগিল, "হে বিটপী তুমি নির্জ্জন প্রান্তরে থাকিয়া কেবল পরহিতের জন্য জীবনধারণ করিয়া আছ, কত পরিশ্রান্ত পথিককে তুমি ছায়াদানে সুস্থ করিতেছ, সহস্র সহস্র পক্ষী তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া জীবনধারণ করিতেছে, আমি ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসার্ত্ত, আমার জীবন যায়, আমাকে রক্ষা করুন।" সতীশ কাতরপ্রাণে এইরূপ প্রার্থনা করিলে বৃক্ষ হইতে তাহার সম্মুখে একটি ফল পড়িল। ফলটি ঠিক মাকাল ফলের ন্যায় সুন্দর। সতীশ ফলটি হাতে লইয়া ফলকে প্রণাম করিয়া আহার করিল। ফলটি সুমিষ্ট ও রসাল। ফল খাইয়া সতীশের দেহে বলের সঞ্চার হইল ও তৃষ্ণার নিবারণ হইল। সতীশ বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল কোথাও একটি ফল নাই, বৃক্ষটি যে কি বৃক্ষ, সতীশ তাহাও চিনিতে পারিল না। যাহা হউক, সতীশ সুস্থ হইয়া বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদনপূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

সতীশ মোকামা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছিয়া গুরুর নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিল; গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন—

গোসাঁই—সন্ন্যাসীর সহিত দেখা হওয়া অবধি তুমি কি নাম করিয়াছিলে?
সতীশ—আজ্ঞে না।
গোস্বামী—নাম করিলে তোমার এ বিপদ কখনই হইত না। নাম করিলে তাহারও বুজরুকি খাটিত না, নাম পরিত্যাগ করাতেই তোমার এই বিপদ ঘটিয়াছিল, খবরদার এমন কাজ আর কখনও করিও না।

সতীশ বুঝিলেন গুরুদেব কৃপা করিয়া এবার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, এই ঘটনায় আমরাও গুরুর মহিমা ও অপার করুণা দেখিয়া বিমোহিত হইলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নীরদাসুন্দরীর রোগমুক্তি

গোস্বামী মহাশয় যে কেবল ভবরোগের বৈদ্য তাহা নহেন, তিনি সাংসারিক যাবতীয় রোগেরও পরমৌষধ স্বরূপ। তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে পারিলে সংসারের কোন বিপদই আর ভ্রুকুটী দেখাইয়া মানুষের প্রাণে ভীতির সঞ্চার করিতে পারে না। কোন বিপদই বিপদ বলিয়া মনে হয় না।

বাবু কৈলাশচন্দ্র বসু, গোস্বামী মহাশয়ের জনৈক শিষ্য। ইনি জেনারেল পোষ্ট আপিসে চাকরী করেন। গোস্বামী মহাশয় যখন কলিকাতা হ্যারিসন রোডের আশ্রমে থাকিতেন, তখন কৈলাশবাবু প্রত্যহ প্রাতে গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমে আসিয়া তাঁহার ঘরের এক পার্শ্বে বেলা নয়টা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিয়া বাসায় ফিরিতেন। গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গ এমনি মধুর যে তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না।

১৩০৪ সালের কার্ত্তিক মাসে কৈলাশবাবুর স্ত্রী নীরদাসুন্দরী সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হন। ইনিও গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যা। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক কবিরাজ ৺দ্বারকানাথ সেন, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। ইঁহারা ক্রমাগত দেড় মাস কাল চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হইল না; রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল। কৈলাসবাবু বিপদ গণিয়া কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার দ্বারা স্ত্রীর চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। তাহাতেও কোন ফল হইল না। চিন্তা, উদ্বেগ, রাত্রিজাগরণে কৈলাসবাবু মলিন ও শীর্ণ হইয়া পড়িলেন।

গোস্বামী মহাশয় প্রত্যহ প্রত্যুষে তাঁহার আশ্রমের পশ্চিম বারান্দায় দুই চারি মিনিট মাত্র বেড়াইতেন। একদিন প্রত্যুষে কৈলাসবাবু এই বারান্দায় গোস্বামী মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিবেন, এমন সময় গোস্বামী মহাশয় কৈলাস বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

—আপনাকে রোগা রোগা দেখিতেছি, আপনার কি কোন অসুখ হইয়াছে?

কৈলাসবাবু—আমার কোন অসুখ হয় নাই, আমার স্ত্রীর অত্যন্ত ব্যারাম, সেইজন্য রাত্রিজাগরণে ও নানাক্লেশে শরীর দুর্ব্বল হইয়াছে। সেইজন্যই কেবলমাত্র আপনাকে প্রণাম করিয়া বাসায় যাইতেছি।

গোসাঁই—আপনার স্ত্রীর কি ব্যারাম হইয়াছে? আর চিকিৎসাই বা কিরূপ হইতেছে?

গোস্বামী মহাশয়ের কথায় কৈলাশবাবু তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া ব্যায়ারামের আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা ও চিকিৎসার সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিলেন। গোস্বামী মহাশয় শুনিয়া বলিলেন,

—কোন ভয় নাই, রোগী যখন একটু সুস্থ থাকিবে, তখন দুই চারিবার নাম করিতে বলিবেন।

কৈলাসবাবু—আমার স্ত্রী অনেক দিন হইতে আপনার একটু চরণামৃত পান করিবার অভিলাষ করিয়াছেন।

গোসাঁই—সেটা আমার গুরুদেবের নিষেধ আছে। তাহার দরকার নাই। কোন ভাল ব্রাহ্মণের (যাহাকে আপনার ভক্তি হয়) চরণামৃত খাওয়াইতে পারেন।

কথাটা বড় গোলমেলে হইল। "ব্রাহ্মণের চরণামৃত খাওয়াইতে পার" বলিলে কোন গোল হইত না। ভাল ব্রাহ্মণ বলাতে বড়ই গোল বাধিল। কৈলাসবাবু ভাল ব্রাহ্মণ ঠিক করিতে পারিলেন না, সকলই কলির ব্রাহ্মণ। চরণামৃত খাওয়ান গোস্বামী মহাশয়ের আদেশ নহে। তিনি বলিয়াছিলেন "খাওয়াইতে পার" অর্থাৎ যদি ইচ্ছা হয় তবে খাওয়াইতে পার। এই সকল কারণে কৈলাসবাবুর স্ত্রীকে আর ব্রাহ্মণের চরণামৃত খাওয়ান হইল না, কৈলাসবাবু একথাটা একেবারে ভুলিয়া গেলেন।

রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মাঘ মাসের শেষে কি ফাল্গুন মাসের প্রথমে একদিন রোগীর মুমূর্ষু অবস্থা উপস্থিত হইল। সতীর্থ ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ, ৺মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র বসু প্রভৃতি অনেকেই অনুমান করিলেন ২।১ ঘণ্টার অধিক রোগীর জীবন রক্ষা হইবে না। কৈলাসবাবু স্ত্রীর জীবনের আশায় নিরাশ হইয়া অতি বিষণ্ণভাবে রোগীর বিছানার একপার্শ্বে বসিয়া আছেন। এমন সময় দেখিলেন, ভক্তিভাজন যোগজীবন গোস্বামী ও তাঁহার মাতামহী উপস্থিত হইয়াছেন। উমেশবাবু যোগজীবনের * চরণামৃত লইয়া রোগীকে

* ইনি গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র ও শিষ্য। যজ্ঞসূত্রহীন ব্রাহ্ম থাকায় কৈলাসবাবু ইহাঁকে উত্তম ব্রাহ্মণ মনে করিতে পারেন নাই।

খাওয়াইয়া দিলেন। এই ঘটনায় গোস্বামী মহাশয়ের কথাটা কৈলাস বাবুর স্মরণপথে উদিত হইল।

কুঞ্জবাবু প্রভৃতি রোগীর অন্তিমকাল দেখিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং গোস্বামী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রোগীর অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। গোস্বামী মহাশয় কুঞ্জবাবুর কথা শুনিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণের চরণামৃত খাওয়াইবার কথা ছিল, খাওয়াইয়া দিন, আর চিকিৎসা করিবার বা ঔষধ খাওয়াইবার দরকার নাই"।

এই ঘটনার পর হইতেই রোগীর অবস্থা ফিরিতে লাগিল। যে ব্যাধি এত দীর্ঘকালব্যাপী, সর্ব্বোত্তম চিকিৎসায় আরোগ্য হয় নাই, উত্তরোত্তর বাড়িতে ছিল, ২।৪ বার নাম করায় ও ব্রাহ্মণের পাদোদক খাওয়ায় তাহা সাতদিন মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ভাল হইয়া গেল।

এই ঘটনায় গোস্বামী মহাশয় নামের মহিমা দেখাইলেন। নাম ও নামী যে অভিন্ন তাহা জানাইলেন, নামের অচিন্ত্যশক্তি বুঝাইয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণের মহিমা স্থাপন জন্য গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মণের পাদোদক খাওয়াইতে বলেন নাই। কারণ এখন যথার্থ ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য লোক অতি বিরল। শাস্ত্রানুসারে যোগজীবনকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে না। তাঁহার উপনয়ন-সংস্কার পর্য্যন্ত হয় নাই। ব্রাহ্মণের পদরজঃ খাইতে বলিয়া গোস্বামী মহাশয় দীনতা ও ভক্তি শিক্ষা দিলেন। আর যাঁহারা সদ্গুরুর নিকট সিদ্ধমন্ত্র লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা যে সকলেই ব্রাহ্মণ একথাটাও জানাইলেন।

গোস্বামী মহাশয় আরও দেখাইলেন, সদ্গুরুর বাক্য কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। তিনি বাক্সিদ্ধ। সোনাকে মাটি বলিলে সোনা মাটি হইয়া যাইবে, আর মাটিকে সোনা বলিলে মাটি সোনা হইবে। গুরুবাক্য অভ্রান্ত, গুরুবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করাইবার জন্যই গোসাঁই

এই খেলা খেলিলেন। ঘটনা না দেখিলে সন্দিগ্ধচিত্ত বিশ্বাস করিতে চায় না। এই ঘটনায় কৈলাসবাবুর মনের সংশয় দূর হইল, বিশ্বাস-বৃত্তি বিকাশপ্রাপ্ত হইল।

ব্রাহ্মণের পাদোদক খাওয়াইতে কৈলাসবাবু একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় উমেশবাবুর দ্বারা পাদোদক খাওয়াইয়া বুঝাইয়া দিলেন, অনেকেই অত্যাবশ্যক কথাও ভুলিয়া যায়, কিন্তু সদ্গুরু অতি সামান্য কথাও ভুলেন না।

গোস্বামী মহাশয় আরও দেখাইলেন, সদ্গুরু কখনও শিষ্যকে ভুলিয়া থাকেন না। শিষ্যের জীবনের সমস্ত ভার সদ্গুরু গ্রহণ করিয়া থাকেন। শিষ্যের জীবনের সমস্ত ঘটনা সদ্গুরুর হাতে।

এই ঘটনার পর হইতে কৈলাসবাবুর জীবনে এক মহাপরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। তাঁহার সমস্ত সংশয় দূর হইল, গুরুনিষ্ঠা প্রবল হইল, তিনি এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের লীলা অচিন্তনীয়। তিনি কোন্ সূত্রে কাহার মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটান ও ধর্ম্ম আনিয়া দেন কে বলিতে পারে? তাঁহার কৃপার সীমা নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আনন্দচন্দ্র মজুমদার

বাবু আনন্দচন্দ্র মজুমদার সস্ত্রীক গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য। তাঁহার কয়েকটি ছোট ছোট পুত্রকন্যা। তিনি কুমিল্লায় একটি সামান্য চাকরি করিয়া অতিকষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

একবার তিনি সংশয়াপন্ন পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। সেই

সময় পূর্ব্ব-বাঙ্গলায় মহা ঝড়বৃষ্টি হইয়াছিল। মজুমদার মহাশয় যে ঘর-খানিতে ছিলেন, দারুণ ঝড়ে সেই ঘরখানি পড়িয়া গেল। মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রী, মজুদার মহাশয় ও সন্তানগুলিকে আর একখানি ঘরে লইয়া গেলেন। ঝড়বৃষ্টি সমানভাবে হইতে লাগিল। অনন্তর প্রবল ঝড়ে এই ঘরের চালটা উড়িয়া গেল। এই বাড়িতে আর এমন ঘর নাই যথায় ইঁহারা আশ্রয় লন। নিকটে এমন প্রতিবেশী নাই যাহার বাড়ীতে গিয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারেন।

মজুমদার মহাশয়ের পত্নী, স্বামী ও সন্তানগুলির জন্য নিতান্ত কাতরা হইয়া স্বামীকে বলিলেন "আজ আমাদের প্রাণ বাঁচাইবার কোন উপায় দেখি না। আজ আমাদের নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটিবে। এখন করি কি? কোথায় যাই?"

মজুমদার মহাশয় বলিলেন, "আর আমাদের করিবার কিছু নাই। গুরুকে ডাক, যদি তিনি আমাদের প্রাণরক্ষা করেন, তবেই জীবন রক্ষা হইবে, নতুবা আজিই শেষ হইবে। এই বিপদকালে একমাত্র তিনিই রক্ষাকর্ত্তা। নাম কর, আর তাঁহাকে স্মরণ কর।"

মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রী স্বামীর এই কথাগুলি শুনিলেন। অন্তিম-কাল উপস্থিত ভাবিয়া তাঁহারা উভয়ে কাতরপ্রাণে গুরুকে স্মরণ করিয়া নাম করিতে লাগিলেন।

এই বিপন্ন অবস্থায় মজুমদার মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী যেমন সকাতরে গুরুকে স্মরণ করিয়া নাম করিতে আরম্ভ করিলেন, অমনি গোস্বামী মহাশয় তাঁহাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, গোস্বামী মহাশয় তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান! তাঁহার জটাভার প্রবল ঝড়ে উড়িতেছে এবং জটার অগ্রভাগ হইতে জলধারা পড়িতেছে! তিনি ইন্দ্র ও পবন-দেবের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিলেন। তাঁহারা উপস্থিত

হইয়া যোড়হস্তে গোস্বামী মহাশয়কে স্তব করিতে লাগিলেন। চারিদিকে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হইতে লাগিল, কিন্তু মজুমদার মহাশয় সপরিবারে যে ঘরখানিতে ছিলেন সে ঘরে এক ফোঁটাও জল পড়িল না এবং ঝড় প্রবাহিত হইল না! মজুমদার মহাশয় সপরিবারে বাঁচিয়া গেলেন।

পাঠক মহাশয়! ঘটনাটি অলৌকিক, কিন্তু অসত্য মনে করিবেন না। এরূপ অনেক ঘটনা লেখকের জানা আছে। এই অবিশ্বাসের যুগে বেশী লেখা উচিত বোধ করিলাম না। এই ঘটনা হইতে আপনারা সদ্‌গুরুর মহিমা বুঝিতে পারিবেন।

ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থ যে মনুষ্যদেহে ভগবানের আবেশ হয়, তাহাকেই সদ্‌গুরু বলে। অঙ্গার অগ্নির সংযোগে লাল বর্ণ হইলে অঙ্গার ও অগ্নির যেমন পার্থক্য থাকে না। তেমনি মনুষ্যদেহে ভগবানের আবেশ হইলে মনুষ্যত্ব ও ভগবত্তার পার্থক্য থাকে না। উভয়ই এক হইয়া যায়।

সমস্ত দেবতা ও দিকপালগণ সদ্‌গুরুর আজ্ঞাবহ। সদ্‌গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিবার তাহাদের শক্তি নাই। সদ্‌গুরু যখন যাহা আজ্ঞা করেন, দেবতাগণ অবনতমস্তকে তাহা তৎক্ষণাৎ পালন করিয়া থকেন।

অধ্যাত্মরাজ্যের ব্যাপার অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য। আমরা প্রাকৃতরাজ্যের একগাছি চুলের খবর দিতে পারি না; অথচ অধ্যাত্মরাজ্যের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিই, এ কেবল আমাদের ধৃষ্টতা ও মূর্খতার পরিচায়ক। আপনারা হঠাৎ কোন কথা অবিশ্বাস করিবেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবনরক্ষা

ভক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্রের নিবাস নিবাধই দত্তপুকুর, জেলা ২৪ পরগণা। ইনি একজন বহুকালের ব্রাহ্ম। ইনি বহুকাল যাবৎ গোস্বামী মহাশয়ের

সঙ্গলাভ করিয়াছেন এবং তাঁহারই নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়া এখন অতিনিষ্ঠাবান ভক্ত হইয়াছেন।

বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্তর নিবাস থৈপাড়া, জেলা হুগলি। ইঁহার পিতা ৺রাধাকৃষ্ণ দত্ত একজন ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি গোস্বামী মহাশয়ের পরম বন্ধু। একারণ জ্ঞানেন্দ্রবাবু গোস্বামী মহাশয়কে জ্যেঠামহাশয় বলিয়া ডাকিতেন। জ্ঞানবাবু পূর্ব্বে দ্বারবঙ্গের অন্তর্গত লাহেড়িয়া সরাইয়ের ইংরাজি বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার ছিলেন, এখন মোজাফরপুরে ওকালতী করিতেছেন।

১২৯৫ সালের প্রথম ভাগে উক্ত জ্ঞানেন্দ্রবাবুর বিবাহ-উপলক্ষে ভক্ত মহেন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয়ের সহিত থৈপাড়া গমন করিয়াছিলেন। কলিকাতায় বাজার করিয়া তিনি সমস্ত জিনিষপত্র থৈপাড়ায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত টাকা ফুরাইয়া গিয়াছিল, কেবলমাত্র পাঁচটি পয়সা অবশিষ্ট ছিল।

কলিকাতার বাজারে মহেন্দ্রবাবু ক্রমাগত ঘুরিয়া-ফিরিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোথাও আহারের সুযোগ না থাকায় তিনি ঐ পয়সা দ্বারা কিছু দুগ্ধ খরিদ করিয়া খাইবার মনস্থ করিলেন।

তিনি এক দোকানে উপস্থিত হইয়া পাঁচ পয়সার দুগ্ধ খরিদ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে দোকানদার দুগ্ধ মাপ করিয়া মহেন্দ্র বাবুকে দিতে উদ্যত হইল, এমন সময় এক সন্ন্যাসী মহেন্দ্রবাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া "আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত" বলিয়া অর্থযাচ্ঞা করিলেন। মহেন্দ্র বাবু ক্ষুধার্ত্ত হইলেও সন্ন্যাসীর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন না। তিনি আর দুগ্ধ খরিদ না করিয়া পয়সা কয়টি ঐ সন্ন্যাসীর হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া থৈপাড়া ফিরিয়া আসিলেন।

গোস্বামী মহাশয় কলিকাতায় বাজার করার কথা জিজ্ঞাসা করায় মহেন্দ্রবাবু এই সন্ন্যাসীর বিষয় গোস্বামী মহাশয়কে খুলিয়া বলিলেন। তাহাতে গোস্বামী মহাশয় হাঁসিয়া উত্তর করিলেন—

—দুগ্ধে কলেরার বীজ নিহিত ছিল। দুগ্ধ খাইলে তোমার বিপদ হইত, এইজন্য সাধুটি তোমার নিকট হইতে পয়সা কয়টি লইয়া তোমার দুগ্ধপান নিবারণ করিয়াছিলেন। সাধুর ভিক্ষার কোন প্রয়োজন ছিল না।

মহেন্দ্রবাবু—আপনিই রক্ষাকর্ত্তা। আজ আপনিই আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। সাধুর দ্বারা আমার দুগ্ধপান নিবারণ আপনারই কার্য্য। এত দয়া না হইলে আমার কি রক্ষা ছিল?

গোস্বামী মহাশয়—ভগবানই রক্ষাকর্ত্তা। তাঁহার ইচ্ছায় বিশ্বসংসার চলিতেছে। তিনি রক্ষা না করিলে কাহারও কি রক্ষা করিবার সাধ্য আছে?

মহেন্দ্রবাবু—আজ ভগবানই যে রক্ষা করিলেন, আমি তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। আপনিই আমার ভগবান। এতদিন রক্ষা করিয়া আসিতেছেন বলিয়াই রক্ষিত হইতেছি। নতুবা এতদিন কোথায় ভাসিয়া যাইতাম। আপনি মহারৌরব হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। আমারও মৃত্যু হইয়াছিল, আপনি নাম প্রেম দিয়া আমার মৃতপ্রাণে জীবনদান করিয়াছেন।

এই সন্ন্যাসী গোস্বামী মহাশয়ের সতীর্থ ছিলেন। মহেন্দ্রবাবুর বিপদ দেখিয়া, তিনি মহেন্দ্রবাবুকে রক্ষা করিবার জন্য ঐ সন্ন্যাসীকে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী গোস্বামী মহাশয়ের ইঙ্গিতে দ্রুতপদে মহেন্দ্র

বাবুর নিকট আসিয়া পয়সা কয়টি চাহিয়া লইলেন এবং কৌশলে মহেন্দ্র বাবুর প্রাণ রক্ষা করিলেন।

সদ্‌গুরু শিষ্যের প্রতি কখনও উদাসীন থাকেন না। শিষ্যের উপর তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদাই থাকে। তিনি সর্ব্বদা শিষ্যকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন কিন্তু আবশ্যক হইলে শিষ্যের মঙ্গল-কামনায় শিষ্যকে বিপদে ফেলিয়া তাহার জীবন গড়িয়া তোলেন। সদ্‌গুরুর কার্য্যকলাপ বিচিত্র। এ সম্বন্ধে আমার অনেক ঘটনা জানা আছে, সমস্ত লিখিতে গেলে গ্রন্থ বাড়িয়া যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নলিনীর মূর্চ্ছা

আমার তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী নবনলিনী সাত বৎসর বয়ঃক্রমে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হয়। নাম পাইবার পর হইতেই তাহার অবস্থা বেশ মধুর হইয়াছিল। তাহার শরীরে নানা ভাবের উদয় হইত। নাম করিবার সময় সে সময়ে সময়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িত; সংকীর্ত্তনে উদ্দণ্ড নৃত্য করিত এবং সময় সময় এমন আছাড় খাইয়া পড়িত যে বোধ হইত তাহার শরীরটা যেন চুরমার হইয়া গেল। এইজন্য সংকীর্ত্তনকালে প্রায়ই তাহার গায়ের অলঙ্কারগুলি খুলিয়া লইতে এবং তাহার শরীর-রক্ষার জন্য নিকটে লোক রাখিতে হইত। নিকটস্থ জিনিসপত্রগুলি তফাৎ করিতে হইত।

হুগলী জেলার অন্তর্গত ব্যাজড়া নিবাসী ভূতপর্ব্ব সবজজ্ বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান অমরনাথ মিত্রের সহিত তাহার বিবাহ হয়। অমরনাথ শাক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিলেও নিজে পরম

বৈষ্ণব; সেইজন্য আমি অমরনাথের সহিত নলিনীর বিবাহ দিয়াছিলাম।

নলিনী শ্বশুরবাড়ী গেলে তথায় তাহার ঐরূপ ভাব ও মূর্চ্ছা হইত, তাহার শ্বশুরবাড়ীর লোক তাহার অবস্থা বুঝিত না ও বিশ্বাস করিত না। তাহারা মনে করিত এত ছোট মেয়ের এরূপ সাত্ত্বিকভাব অসম্ভব। তাহারা ব্যারাম মনে করিয়া ঔষধ সেবন করাইত। নলিনী বুঝিত, যে পরিবারে তাহার বিবাহ হইয়াছে তাহারা সদ্‌গুরুর মহিমা জানে না; সদ্‌গুরুর প্রদত্ত মহামন্ত্রের শক্তির বিষয় অবগত নহে, বুঝাইলেও বুঝিবে না, সুতরাং সে তাহাদের নিকট বলিত "এটা আমার ব্যারাম"। নলিনীর মূর্চ্ছারোগ চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িল, এই কথা আমারও কানে উঠিল। নলিনীর শ্বশুরবাড়ীর লোক ঔষধ দিলে সে ঔষধ খাইত কিন্তু কোন উপকার হইত না। প্রায়ই ডাক্তার দেখিত কিন্তু কোন ফল হইত না। ডাক্তারও জানে না এ ব্যারামের ঔষধ কি; তিনি শিশি শিশি ঔষধ দিতেন।

শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর জন্মোৎসব-উপলক্ষে আমার বাসায় প্রতি বৎসর উৎসব হয়। এই উৎসবের সময় নলিনী প্রায়ই বোলপুরে আসিত। নলিনীর মাথার ব্যারাম, তাহার মূর্চ্ছারোগ একথাটা সকলেই শুনিয়াছেন।

উৎসবের দিন বৈকালে আমি শুনিলাম নলিনীর ব্যারামটা জানাইয়াছে, তাহাকে দেখিতে গেলাম। বাটীর ভিতর গিয়া দেখিলাম, নলিনী একখানা তক্তাপোসের উপর কর ধরিয়া বসিয়া আছে। তাহার সংজ্ঞা নাই, চারিদিকে অনেকগুলি স্ত্রীলোক বসিয়া রহিয়াছেন। নলিনী? নলিনী? বলিয়া ডাকিলাম, কোন উত্তর পাইলাম না। গায়ে হাত দিয়া বারবার ঠেলিলাম, কিন্তু দেখিলাম তাহার সংজ্ঞা নাই। তাহার চক্ষু

মুদ্রিত, সে বসিয়া ক্রমাগত বলিতেছে "হা কৃষ্ণ, করুণা সিন্ধো, দীনবন্ধো, জগৎপতে, গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে; হরিবোল হরিবোল, হরিবোল; হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হরে হরে, হরেরাম, হরেরাম, রাম, রাম, হরে হরে" এইকথাগুলি নলিনী বারবার মুখে উচ্চারণ করিতেছে, বিরাম নাই।

নলিনীর এই অবস্থা দেখিয়া ব্যারাম বলিয়া আমার মনে হইল না। বাহিরে আসিবামাত্র নানা লোকে নানা ঔষধ বাতলাইতে লাগিলেন। সেবার অনেকগুলি গুরু-ভাইভগ্নী এই উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে বাসায় আসিয়াছিলেন। আমি ৪ জন অভিজ্ঞ গুরুভগ্নীকে ডাকিয়া নলিনীর অবস্থাটা পরীক্ষা করিতে বলিলাম। ভক্তিভাজন বাবু উমেশ চন্দ্র বসুর স্ত্রী, অতুলচন্দ্র সিংহের স্ত্রী ও শ্রীমতী মন্দাকিনী দিদি, আরও একটী স্ত্রীলোক নলিনীর পার্শ্বে গিয়া বসিলেন এবং নলিনীর অবস্থাটা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অর্দ্ধঘণ্টা পরীক্ষার পর আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

—নলিনীর অবস্থাটা কিরূপ দেখিতেছেন?

স্ত্রীলোকগণ—আমরা ইহার অবস্থা ভালই দেখিতেছি। ইহার যে কোন ব্যারাম, তাহাত আমাদের বোধ হয় না। ইহার ভিতরে নাম চলিতেছে, ধীরে ধীরে প্রাণায়াম চলিতেছে, কেমন করিয়া বলিব ইহার ব্যারাম?

অনন্তর আমি তাঁহাদিগকে সরাইয়া দিয়া ৪ জন জ্ঞানী ভক্তগুরু-ভাইকে নলিনীর পরীক্ষা জন্য অন্দরে পাঠাইলাম। ভক্তিভাজন উমেশ বাবু, রেবতীবাবু, অতুলবাবু, মোহিনীবাবু বাটীর ভিতর গিয়া নলিনীর পার্শ্বে বসিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বাহিরে অনেকে অনেক রকম সমালোচনা করিতে লাগিলেন; কেহ বলিলেন হিষ্টিরিয়া ব্যারামে রোগীর

নানাপ্রকার অবস্থা প্রকাশ পায়; কেহ বলিলেন হলুদ পোড়াইয়া নাকের কাছে ধরিয়া দেও এখনই চৈতন্য হইবে।

তাঁহারা অর্দ্ধঘণ্টা পরীক্ষার পর ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমরা নলিনীর যে অবস্থা দেখিলাম, তাহাতে তাহার ব্যারাম বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের বিশ্বাস যে ইহা প্রবল গুরুশক্তির ক্রিয়া।" আমার মনে যাহা হইয়াছিল ইঁহারা সকলে তাহাই বলিলেন, আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। তিন ঘণ্টা পরে নলিনীর চৈতন্য হইল।

গুরুশক্তি জিনিসটা কি লোকে বুঝে না। ইহার ক্রিয়াকলাপ অতীব বিচিত্র। যাহাদের মধ্যে এই গুরুশক্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে ও যাহারা ইহার কার্য্যকলাপ দেখিতেছে, কেবল তাহারাই ইহা বুঝিতে পারে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নলিনীর নরকদর্শন

একবার নলিনী স্বামীর উপর অভিমানিনী হইয়া বালিকা-বুদ্ধিবশতঃ আত্মহত্যা করিবার অভিপ্রায়ে হাবড়া মোকামে আফিং খায়। রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় নলিনী স্বামীকে আহার করাইয়া আফিং খাইয়া তাহার পার্শ্বে শয়ন করে। অমরনাথ জানিত না যে নলিনী আফিং খাইয়াছে। প্রাতঃকালে অমর নাথ দেখিল নলিনী অচৈতন্য, অনেক ঠেলাঠেলির পর তাহার একবার চৈতন্য হইল। অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিল,

—তোমার এ অবস্থা কেন? কি হইয়াছে, কি করিয়াছ বল।

নলিনী—আমি আফিং খাইয়াছি, এখন যাহা করিবার তাহা কর।

অমরনাথ—কেন আফিং খাইয়াছ?

নলিনী অচৈতন্য, তাহার আর সংজ্ঞা নাই! কে আর উত্তর দিবে? হাবড়া জায়গা পুলিশ রাস্তায় রাস্তায় ফিরিতেছে; এই ঘটনা টের পাইলে আবার পুলিশের হাঙ্গামা উপস্থিত হইবে; মহা বিপদ দেখিয়া অমরনাথ ধৈর্য্যসহকারে নলিনীকে উঠাইয়া বসাইল, পৃষ্ঠে একটা বালিশ দিল, দুইজন লোক নলিনীকে ধরিয়া থাকিল।

নলিনীর এক একবার চেতনা হয়, আবার পরক্ষণেই অচেতন হইয়া পড়ে। নলিনী অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় দেখিতেছে, কতকগুলা লোকের গলা কাটা, কাহারও মুণ্ডটা বুকের দিকে, কাহারও মুণ্ডটা পিটের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, শরীর বহিয়া রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে, এই অবস্থায় লোক-গুলা দৌড়িয়া যাইতেছে আর আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। কতকগুলা লোক ভূমিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে; শকুনি ও গৃধিনীগণ তাহাদের জীবন্ত অবস্থায় নাড়ীভুঁড়ী ছিঁড়িয়া বাহির করিয়া খাইতেছে; কাহারও চক্ষু উপাড়িয়া লইতেছে, কাহারও হাত পায়ের মাংস ছিঁড়িয়া খাইতেছে। কোন কোন স্থানে বিষ্ঠাপূর্ণ বড় বড় কুণ্ডে কতকগুলা লোককে ভীষণ দর্শন যম দূতগণ পুনঃপুনঃ ডুবাইতেছে আর তুলিতেছে; দুর্গন্ধে প্রাণান্ত হইতেছে! কোন কোন লোককে বড় বড় অঙ্কুশ দ্বারা যমদূতগণ প্রহার করিতেছে আর তাহারা চীৎকার করিতেছে; তাহাদের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইতেছে! কোন কোন স্থানে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে মানুষগণকে যমদূতেরা নিক্ষেপ করিতেছে, তাহারা অগ্নি মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, আর বিষম দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে! কোথাও কটাহ মধ্যে তপ্ত তৈলে জীবন্ত মানুষকে যমদূতগণ নিক্ষেপ করিতেছে! এই প্রকার বিবিধ ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া নলিনীর হৃদকম্প উপস্থিত হইল। এই অবস্থায় নলিনী দেখিল—সম্মুখে গোসাঁই। তাঁহার হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু, মস্তকে জটা, পরিধানে গৈরিক কৌপীন ও বহির্বসন। তিনি বলিলেন—

—নলিনী, অপরাধীর কি শাস্তি তাহা দেখিতেছ? আমি আছি, ভয় নাই তুমি মরিবে না।

নলিনী গুরুকে সম্মুখে দেখিয়া ও গুরুর আশ্বাস বাণী শুনিয়া প্রাণে একটা সাহস পাইল, ইষ্টদেবকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বলিল,

—প্রভু, এ দৃশ্য সংবরণ করুন, আমি আর দেখিতে পারিতেছি না, আমার কাঁপুনি ধরিয়াছে। স্বামীকে বলিল, আমার চিকিৎসা করাও। এই বলিয়া নলিনী অচৈতন্য হইয়া পড়িল তাহার সংজ্ঞা লোপ হইল।

এই দারুণ বিপদকালে অমরনাথ ধৈর্য্যসহকারে বটকৃষ্ণ পালের দোকান হইতে বমনকারী ঔষধ আনাইল। নলিনীকে ঐ ঔষধ আর গরম গরম চা পান করাইতে লাগিল। চা ও ঔষধ খাইবামাত্র বমি হইতে লাগিল, এইরূপ পুনঃপুনঃ বমির পর তিনদিন পরে নলিনী সুস্থ হইল। এখন নলিনী স্বামীর কাছেই আছে।

নলিনী আত্মহত্যারূপ অপরাধ করিতেছিল, গোস্বামী মহাশয় তাহাকে রক্ষা করিলেন ও নরকের দৃশ্য দেখাইয়া ভয়প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার বলা হইল, সাবধান এমন কাজ কখনও করিও না, অপরাধ করিলে কাহারও নিস্তার নাই। অপরাধীর ভয়ঙ্কর শাস্তি। এই দৃশ্য দেখাইয়া তিনি নলিনীকে বিলক্ষণ শাসন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ডাক্তার হরকান্তবাবুর দীক্ষা

বাবু হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আপন মাতুলালয় ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত লোনসিংহ গ্রামে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার

নাম কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতামহের নাম রাজচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহার নিবাস ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত রাধামোহন মাইজ পাড়া গ্রাম। ইঁনি বিক্রমপুরের অন্তর্গত পশ্চিম পাড়ায় বিবাহ করিয়া তথায় বসবাস করেন। ইঁহারা শক্তি মন্ত্রের উপাসক, পরম নিষ্ঠাবান হিন্দু। পূর্ব্বে ইঁহাদের অনেক শিষ্য ছিল। কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মোক্তারী করায় সেই অবধি মন্ত্র প্রদান বন্ধ হইয়া

হরকান্তবাবু সুবিখ্যাত কে, জি গুপ্ত, পি, কে রায় প্রভৃতির সহাধ্যায়ী। সুবিখ্যাত নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার ভ্রাতা নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সংসর্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি ইঁহার অনুরাগ জন্মে। কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পড়িবার সময় কেশববাবুর সহিত ইঁহার পরিচয় হয় এবং প্রকাশ্য-ভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে থাকেন। ইনি অত্যন্ত চরিত্রবান ও ধর্ম্ম-পিপাসু ব্রাহ্ম ছিলেন।

হরকান্তবাবু অনেক দিন ফৈজাবাদের এসিষ্টাণ্ট্ সর্জন (সরকারী ডাক্তার) ছিলেন। ইঁহার নিকট কামিনী ও কাঞ্চনঘটিত অনেক প্রলোভন উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই ইনি বিচলিত হন নাই।

হরকান্তবাবু একবার বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি হরকান্তবাবুকে বলিয়াছিলেন—"আজ তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছ, এর পর কত লোক তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তোমার নিকট যাইবেন"।

ফৈজাবাদে অবস্থিতিকালে হরকান্তবাবু মাঝে মাঝে সরযূতীরবাসী ন্যাঙ্গা বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। ন্যাঙ্গা বাবা বড়ই প্রভা-বান্বিত সাধু ছিলেন। তিনি একটি নির্জ্জন বৃক্ষলতাহীন টিলার উপরে থাকিতেন। ন্যাঙ্গা বাবা যেস্থানে থাকিতেন তাহা একবার গোরাদের

চাঁদমারীর স্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। গোরাগণ তথায় উপস্থিত হইয়া স্থাঙ্গা বাবাকে বলেন—

—এ সাধু হিঁয়াসে ভাগো ; হিঁয়া চাঁদমারী হোগা।

স্থাঙ্গাবাবা—নেহি, হিঁয়া হামরা আসন হ্যায় ; হাম আসন নেহি ছোড়েগা।

গোরাগণ—হিঁয়া বন্দুক ছোড়নে হোগা, গুলি লাগ্‌নেছে মর্ যাগা।

স্থাঙ্গাবাবা—কোন্ মারেগা ? যো মারেগা ওহি হাম্‌কো আসন দিয়া। তোমারা বাৎসে হাম আসন ছোড়েগা ? হাম কভি আসন ছোড়েগা নেহি।

গোরাগণ বেগতিক দেখিয়া ও সাধুকে নির্ব্বোধ মনে করিয়া তাঁহার হাতে ধরিয়া স্থানান্তরিত করিয়া দিল। কিন্তু হাত ছাড়িবামাত্র তিনি পুনরায় স্বস্থানে আসিয়া বসিলেন। বারম্বার এইরূপ করিতে থাকায় গোরাগণ কাপ্তেন সাহেবকে সংবাদ দিল। কাপ্তেন সাহেব অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু স্থাঙ্গা বাবা কাহারও কথা শুনিলেন না। সাহেব বিরক্ত হইয়া বন্দুক ছুড়িয়া লক্ষ্য ভেদ করিবার আদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। স্থাঙ্গা বাবার ব্যবহারে গোরাগণ বড়ই বিরক্ত হইয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পুনঃপুনঃ গুলি ছুড়িতে লাগিল। স্থাঙ্গা বাবা কেবল বাম হস্ত তুলিয়া গুলি রোধ করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় একটী গুলিও স্থাঙ্গা বাবাকে স্পর্শ করিল না। স্থাঙ্গা বাবার প্রভাব দেখিয়া গোরাগণ অবাক হইয়া গেল ; তাহারা কাপ্তেন সাহেবকে এই কথা জানাইল। কাপ্তেন সাহেব অন্যত্র চাঁদমারীর স্থান ঠিক করিয়া দিলেন।

অতিথি উপস্থিত হইলে স্থাঙ্গা বাবা তাঁহার লোককে বলিতেন "যাও সরযূ মায়ীকা পাস ঘিউ, আটা, করজ করকে লাও"। তাঁহার লোক সরযূ মায়ীকে স্থাঙ্গাবাবার প্রার্থনা জানাইয়া কলসী করিয়া সরযূর জল ও

বস্তা ভরিয়া সরযূর বালি আনয়ন করিত, কিন্তু ন্যাঙ্গাবাবার নিকট পৌছিবামাত্র কলসী ঘৃতপূর্ণ ও বস্তা আটাপূর্ণ থাকিয়া প্রকাশ পাইত ; তাহাতেই অতিথিসেবা হইত। আবার কখন কোন বড়লোক সাধু সেবার জন্য ঘি, ময়দা পাঠাইয়া দিলে ন্যাঙ্গাবাবা সরযূ মায়ীর দেনা শোধ করিতে বলিতেন। ঘৃত জলে ঢালিয়া দেওয়া হইত, আর ময়দা চরে বালির মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া হইত।

আপনারা মাণিকতলার মায়ের কথা শুনিয়াছেন। ইনি প্রায়ই মাঝে মাঝে অজ্ঞান হইতেন, কিছুতেই সংজ্ঞা লাভ হইত না। কেবল হরিনাম শুনিলেই চৈতন্য হইত। ইঁহার পেটে কিছুই থাকিত না। যাহা আহার করিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা বমি হইয়া যাইত। এক গণ্ডূষ জল খাইলেও বমি হইয়া যাইত। স্বামী ডাক্তার ছিলেন। অনেক চিকিৎসা করাইয়া ছিলেন। কিছুতেই রোগ ভাল হয় নাই। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার অনেক দিন ইঁহার চিকিৎসা করিয়া কিছুই করিতে পারেন নাই। একদিন ভক্তিভাজন রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের নিকট এই কথা উঠিলে তিনি ডাক্তার সরকারকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "ইঁহার ব্যারাম ধরিতে পারিয়াছ ? এ রোগ তোমাদের শাস্ত্রের বাহিরে"।

গোস্বামী মহাশয় একবার সশিষ্যে মাণিকতলার মাকে লইয়া হরকান্তবাবুর বাসায় ফৈজাবাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ন্যাঙ্গাবাবার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হরকান্তবাবু ইঁহাদিগকে তাঁহার নিকট লইয়া যান। মাতাজীর স্বামী মাতাজীর ব্যারামের কথা বলিলে ন্যাঙ্গাবাবা একটা আলু মন্ত্রপূত করিয়া তাঁহাকে খাইতে দেন। মাতাজী ভয় পাইয়া ঐ আলুটি ফেলিয়া দেন। পরে আবার কি মনে করিয়া আলুটি কুড়াইয়া আনিয়া খাইয়া ফেলেন। এবার আলুটি কিন্তু বমি হইল না। ন্যাঙ্গাবাবা দুঃখ করিয়া বলিলেন ; এ আলুটি কিছুকাল পরে বমি হইয়া যাইবে,

যদি গোড়ায় বিশ্বাস করিয়া খাইতেন তাহা হইলে বমি হইত না। ফলে উঁহারা বাসায় ফিরিয়া আসিলে আলুটি বমি হইয়া গেল।

সন্ধ্যা সমাগমে সকলে বাসায় ফিরিলেন। কিন্তু গোস্বামী মহাশয় ন্যাঙ্গাবাবার নিকট রাত্রিযাপন করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি এবং আর তিনটি লোক তথায় থাকিলেন। ন্যাঙ্গাবাবা বলিলেন, নিকটে থাকা হইবে না একারণ গোস্বামী মহাশয় ও অপর তিনজন লোক কিছু দূরে গিয়া রহিলেন। ইঁহাদের সহিত বিছানা ছিল না, রাত্রিকাল, বিষম শীত, দুইখানি চ্যাটার উপর ইঁহারা বসিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে ন্যাঙ্গাবাবার ধুনি জ্বলিল। ন্যাঙ্গাবাবার ধুনি জ্বলিবামাত্র সমস্ত শীত দূর হইল। ইঁহারা আপনাদের গাত্রবস্ত্র গায়ে রাখিতে পারিলেন না; খুলিয়া ফেলিতে হইল। বাবার প্রভাব দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় অবাক হইয়া গেলেন। পরদিন গোস্বামী মহাশয় হরকান্তবাবুর নিকট বলিয়া ছিলেন, "উঃ সাধুর কি তপোবল? রাত্রিতে হরপার্ব্বতী ইঁহার নিকট আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহার এই প্রভাব থাকিবে না, কারণ ইনি ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছেন"। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই ঘটিয়াছিল, হরকান্তবাবুকে ন্যাঙ্গাবাবা কিছুদিন পরে বলিয়াছিলেন, "ডাক্তার বাবু আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে"। এই ন্যাঙ্গা বাবার প্রতি হরকান্তবাবুর প্রগাঢ় ভক্তি থাকা স্বত্বেও তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নাই।

হরকান্তবাবুর তিনটি সহোদর আছেন। দ্বিতীয়ের নাম বরদা কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ইনি গোস্বামী মহাশয়ের সমাধির জনৈক ট্রাষ্টী। তৃতীয় সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, ইনি ঐ সমাধির সেবাইত। কনিষ্ঠ কুলদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্রহ্মচারী) ইনি অনেক শিক্ষা করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য।

হরকান্তবাবু নীতিপরায়ণ চরিত্রবান লোক ছিলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের শিক্ষায় শাস্ত্র বা দেবতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাভক্তি ছিল না। সদাহারের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না; মুসলমান বাবুরচীর রান্না, অখাদ্য মাংসাদি আহার করিতেন। বন্ধুবান্ধব লইয়া মাঝে মাঝে এই সব খাওয়া হইত।

একদিন বেলা ১টার সময় হরকান্তবাবু ফৈজবাদে আপন বৈঠকখানায় চেয়ারের উপর বসিয়া আছেন, সম্মুখে একটা টেবিল। তিনি দেখিলেন একটা বৃহৎ মৎস্য বৈঠকখানার ভিতর দেওয়ালের ধারে ধারে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। মাছ যেমন জলে খেলিয়া বেড়ায় এই মাছটা ঠিক সেইরূপ বৈঠকখানার মধ্যে চারিদিকে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। হরকান্তবাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া এই দৃশ্যটা দেখিতে লাগিলেন। তিনি অতীব আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—একি? অনেকক্ষণ পরে মৎস্যটা অদৃশ্য হইয়া গেল। গোস্বামী মহাশয় সেই সময় শ্রীবৃন্দাবনের পথে হরকান্তবাবুর সহিত দেখা করিবার জন্য ফৈজাবাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হরকান্তবাবু গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,

—মহাশয় আজ এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলাম।

গোসাঁই—কি দেখিলেন?

হরকান্তবাবু—অদ্য বেলা একটার সময় আমি বৈঠকখানায় বসিয়া আছি, এমন সময় দেখিলাম, একটা বৃহৎ মৎস্য বৈঠকখানার ভিতর চারিদিকে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে।

গোসাঁই—তুমি ভাগ্যবান, ভগবান কৃপা করিয়া তোমাকে আজ তাঁহার মৎস্যাবতারের রূপ দেখাইলেন!

এই সময় হইতে হরকান্তবাবুর চিন্তার স্রোত হিন্দুয়ানির প্রতি ধাবিত হইল। ভ্রাতা কুলদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্ররোচনায় ১২৯৮ সালের

২৮শে অগ্রহায়ণ রবিবার শুভ একাদশী তিথিতে কলিকাতা শ্যামবাজারের বাটিতে হরকান্তবাবু গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

শালগ্রামের স্বপ্নাদেশ

হরকান্তবাবু ফৈজাবাদে আপন বাসায় একদিন স্বপ্ন দেখিলেন, একটি ক্ষুদ্র শালগ্রাম শিলা মুখব্যাদন করিয়া হরকান্তবাবুকে বলিতেছেন "তুই আমার সেবা কর্ না" নিদ্রাভঙ্গের পর হরকান্তবাবু আপন সহধর্ম্মিণীকে বলিলেন,

—আজ একটা মজার স্বপ্ন দেখিলাম।

সহধর্ম্মিণী—কি স্বপ্ন ?

হরকান্তবাবু—একটী ক্ষুদ্র শালগ্রাম শিলা মুখব্যাদন করিয়া বলিতেছেন, "আমার সেবা কর্ না"। ঐ প্রকার স্বপ্ন কেন দেখিলাম ?

সহধর্ম্মিণী—তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, শালগ্রাম শিলার সেবা করাই তোমার ধর্ম্ম। তুমি যে শালগ্রামের পূজা কর না, ইহাই তোমার পক্ষে গর্হিত। তুমি অনাচার পরিত্যাগ কর, যথার্থ ব্রাহ্মণোচিত কাজ কর, শালগ্রামের সেবা করিতে আরম্ভ কর।

এই ঘটনার সপ্তাহকাল পরে হরকান্তবাবু আপন বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিলেন একজন বৈষ্ণব একটি ক্ষুদ্র শালগ্রাম শিলা (যেরূপ স্বপ্নে দেখিয়াছেন) সিংহাসনসহ লইয়া যাইতেছে। হরকান্তবাবু পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন,

—এই শালগ্রাম শিলা কোথায় লইয়া যাইতেছেন ?

বৈষ্ণব—আমার সেবা করিবার লোক নাই, তজ্জন্য আখড়ায় দিতে যাইতেছি।

হরকান্তবাবু—আমাকে দিতে পারেন?

বৈষ্ণব—লউন না।

হরকান্তবাবু—কত টাকা লইবেন?

বৈষ্ণব—টাকা আর কি লইব? আমিত আখড়ায় দিতে যাইতেছি, আপনি যদি সেবা করেন, তবে লউন, আপনাকে কিছুই দিতে হইবে না।

এই বলিয়া বৈষ্ণব সিংহাসন সহ শালগ্রাম শিলা হরকান্তবাবুর হস্তে দিলেন। হরকান্তবাবু ঐ শালগ্রাম শিলা আপন বৈঠকখানার কোলঙ্গায় রাখিয়া দিলেন। স্ত্রীকে সমস্ত কথা বলিলেন, তাঁহার স্ত্রী শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, এইবার ভক্তিপূর্ব্বক শালগ্রামের পূজা করিতে থাকুন।

হরকান্তবাবু স্নানের পর প্রতিদিন কেবল একটি তুলসীপত্র শালগ্রাম শিলার উপর দিতেন। ইহা ব্যতিরেকে তাঁহার আর কোন পূজার উপকরণ বা মন্ত্রাদি ছিল না। অনভ্যাস বশতঃ কোন কোন দিন তুলসী পত্র দিতে ভুলিয়া যাইতেন। কোন দিন আহারের পরে মনে পড়িত, যে শালগ্রামের পূজা হয় নাই। তখন একটি তুলসীপত্র শালগ্রামের উপর দিতেন। আহারের পর কোন দিন ডাক্তারখানায় যাইবার জন্য পোষাক পরিতেছেন এমন সময় মনে পড়িল শালগ্রামের সেবা হয় নাই। তৎক্ষণাৎ চাকরকে হুকুম দিলেন একটা তুলসী পাত লইয়া আয়। চাকর তুলসীপাত হাতে দিলে হরকান্তবাবু এক হাতে পেণ্টুলেনটা ধরিয়া কোলঙ্গার কাছে গিয়া তুলসীপাতটা শালগ্রামের উপর দিয়া আসিতেন। তারপর দুই হাতে পেণ্টুলেনের বোতাম লাগাইতেন। কিছুদিন এই ভাবেই শালগ্রামের পূজা চলিতে লাগিল।

হরকান্তবাবু আর একদিন স্বপ্ন দেখিলেন শালগ্রাম বলিতেছেন, "ভারি ত পূজা! কোন দিন একপাতা তুলসী জোটে, কোন দিন তাও জোটে না। একখানা বাতাসাও কি দিতে নাই?

হরকান্তবাবু স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রিতা স্ত্রীকে জাগাইয়া বলিলেন —আজ আবার শালগ্রাম স্বপ্ন দিয়াছেন।

স্ত্রী—আজ কি স্বপ্ন দেখিলেন?

হরকান্তবাবু—শালগ্রাম বলিতেছেন "ভারি ত পূজা! কোন দিন এক পাত তুলসী জোটে কোন দিন তাও জোটে না; একখানা বাতাসাও কি দিতে নাই"?

স্ত্রী—শালগ্রাম ত ঠিক কথাই বলিয়াছেন, যখন শালগ্রামের সেবা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন কি এমনি করিয়া সেবা করিতে হয়? আপনি ব্রাহ্মণের ছেলে বয়স হইয়াছে—রীতিমত শালগ্রামের পূজা করুন, ঠাকুরকে ভোগ না দিয়া কি উপবাস রাখিতে আছে।

স্ত্রীর কথা শুনিয়া হরকান্ত বাবু চাকরকে হুকুম দিলেন "এক সের ছোট ছোট বাতাসা কিনিয়া আন্"। চাকর বাতসা কিনিয়া আনিয়া হরকান্তবাবুর হাতে দিল। শালগ্রাম যে কোলঙ্গায় থাকিত তাহার পার্শ্বে আর একটা কোলঙ্গা ছিল। হরকান্তবাবু সেই কোলঙ্গায় বাতাসাগুলি রাখিয়া দিলেন। প্রত্যহ পূজার সময় শালগ্রামকে একএকখানি বাতসা দিতে লাগিলেন।

হরকান্তবাবু এখন হিন্দু হইয়াছেন। তাঁহার আর কদাহার অনাচার নাই। বাসায় অনেকটা সদাচার প্রতিষ্টিত হইয়াছে। পূর্ব্বে হরকান্ত বাবুর বাসায় মাঝে মাঝে ভোজ হইত, মুসলমান বাবুরচি দ্বারা মাংসাদি রান্না হইত। বন্ধুবান্ধবের সহিত হরকান্তবাবু আমোদ-আহ্লাদে আহার

করিতেন। এখন তাহা বন্ধ হইয়াছে; কিন্তু বন্ধুগণ ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহারা ভোজের জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। হরকান্তবাবু কি করিবেন ভোজ না দিলেই নয়; কাজে কাজেই এবার নিরামিষ ভোজের ব্যবস্থা হইল। লুচী, কচুরী, মালপোয়া, নানাপ্রকার সন্দেশ, লাড়ু, ডাল তরকারী ইত্যাদি ব্রাহ্মণের দ্বারা পাক হইল। সকলে মিলিয়া পরমানন্দে ভোজন করিলেন। এই ভোজের দিন রাত্রে হরকান্তবাবু আবার স্বপ্ন দেখিলেন। নিদ্রা ভঙ্গের পর স্ত্রীকে জাগাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,

—যামিনীর মা, শালগ্রাম আজ আমার স্বপন্ দিয়াছেন।

যামিনীর মা—কি স্বপন দিয়াছেন?

হরকান্তবাবু—শালগ্রাম অভিমান করিয়া বলিলেন "বাসায় ভোজ হইল। লুচী, কচুরী, সন্দেশ মিঠাই কত কি তৈয়ার হইল; নিজে খেলেন, স্ত্রী খেলেন, বাসার লোকজন, বন্ধু, বান্ধব, চাকর, বাকর সকলে খেলেন, আমার জন্য একখানা জুটিল না"? শালগ্রাম যেন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

যামিনীর মা—বড়ই কুকাজ হইয়াছে। বাসায় ঠাকুর রহিয়াছেন; ঠাকুরের ভোগ না দিয়া কি খাইতে আছে? এমন কাজ আর কখনও করিও না।

দিন কয়েক পরে হরকান্তবাবুর ভাগিনা দেশ হইতে আসিলেন। এইবার হরকান্তবাবু নিষ্কৃতি পাইলেন। তিনি আপনার ভাগিনার উপর শালগ্রামের পূজার ভার দিলেন। ভাগিনা হিন্দু, তিনি পূজার মন্ত্রাদি জানেন। তিনি শালগ্রামের সেবা পূজা করিতে লাগিলেন।

এই সময় হরকান্তবাবুর বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে আবার বাসায় ভোজ হইল। দেশ হইতে আত্মীয়স্বজন আসিয়াছে, এবার ভোজের মাত্রাটা

কিছু বেশী হইল। আহারাদির পর হরকান্তবাবু নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময় তিনি স্বপ্ন দেখিয়া স্ত্রীকে জাগাইয়া বলিলেন,

—যামিনীর মা, আজ আবার শালগ্রাম স্বপ্ন দিয়াছেন।

যামিনীর মা—আজ আবার কি স্বপ্ন দেখিলেন?

হরকান্তবাবু—শালগ্রাম বলিলেন, "আহা যেমন মামা, তেমনি ভাগনে, দুইই সমান। নিজে খেলেন, বাসার গুষ্টীশুদ্ধ লোক খেলেন, বন্ধুবান্ধব চাকরবাকর সবাই খেলেন, আমার জন্য একখানা জুটিল না।

যামিনীর মা—কাজটা বড়ই অন্যায় হইয়াছে, বাস্তাবকই আমাদের অত্যন্ত অপরাধ হইতেছে, ঘরে ঠাকুর থাকিতে তাঁহাকে না দিয়া কি খাইতে আছে? যাহা হউক ভবিষ্যতে এমন কাজ যাহাতে না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

শালগ্রামের উৎপাতে হরকান্তবাবুর ক্রমশঃ হিন্দুয়ানীর দিকে অধিক ঝোঁক পড়িতে লাগিল, তাঁহার অন্তরে ভক্তি ও বৈরাগ্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি সাধনভজনে অধিকতর মনোযোগী হইলেন এবং অতি যত্নের সহিত শালগ্রামের সেবা পূজা করিতে লাগিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রেতের উপদ্রব

ফৈজাবাদের হস্‌পিট্যালের ভার হরকান্তবাবুর উপর ছিল; তিনি প্রত্যহই হাঁসপাতালে রোগী দেখিতে যাইতেন। একদিন একটি রোগী আসিল। তাহার প্লীহা যকৃত ও পেটের অসুখ। হরকান্তবাবু তাহাকে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন এবং চিকিৎসা ও পথ্যের সুবন্দোবস্ত

করিয়া দিলেন। রোগী যে ঘরে থাকিল ঐ ঘরে ছয়টি রোগী থাকিতে পারে। চারি কোণে ৪টী ও দেওয়ালের ধারে মাঝে দুইটী। প্রত্যেকের জন্য তক্তাপোষ বালিশ বিছানা ও বিছানার চাদরের বন্দোবস্ত আছে! ঘরের মাঝের দুইটী বিছানার মধ্যে একটি বিছানায় এই রোগীটীর থাকিবার বন্দোবস্ত হইল।

পরদিন হরকান্তবাবু হাঁসপাতাল দেখিতে আসিলে রোগীটী বলিল, —হাম হিঁয়া নেহি রহেগা।

হরকান্তবাবু—কাহে ?

রোগী—হিঁয়া রহেনেছে হাম্ মর্ যাগা।

হরকান্তবাবু—তোম পনের দিন রহ সব ভাল হো যাগা। হিঁয়া নেহি রহেনেছে তোম মর্ যাগা। তোম্‌রা কুচ তকলিফ হোতা ?

রোগী চুপ করিয়া থাকিল। হরকান্তবাবু চাকর ব্রাহ্মণ ও কম্পাউণ্ডারকে বলিয়া দিলেন, এই রোগীটীর যেন কোন কষ্ট না হয়। পরদিন রোগীর আবার সেই কথা। রোগী হাঁসপাতালে থাকিতে চায় না।

ঐ ঘরের কোণে একটা রোগী ছিল, সে অনেকটা ভাল হইয়াছে; হরকান্তবাবু ভাবিলেন, এই রোগীটী নুতন লোক, এর মন উচাটন হইয়াছে। একারণ কোণের রোগীর নিকট আর একটা বিছানায় এই রোগীটির থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং কোণের রোগীটিকে বলিলেন, তুমি ইহাকে যত্ন করিও। এই দিন হইতে এই রোগীটি স্বচ্ছন্দে হাঁসপাতালে থাকিল।

৪।৫ দিন পর আর একটি রোগী হাঁসপাতালে আসিল, তাহার রক্তাম্রশায় ব্যারাম। পূর্ব্বের রোগীটী যে বিছানায় ছিল, হরকান্তবাবু সেই বিছানায় ইহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। পরদিন হরকান্ত বাবু হাঁসপাতাল দেখিতে আসিলে এই রোগীটী বলিল,

—হাম হিঁয়া নেহি রহেগা।

হরকান্তবাবু—কাহে ?

রোগী—হাম্ মর যাগা।

হরকান্তবাবু—ঘাবড়াও মৎ, ১৫ দিন রহেনেছে তোম ভাল হো যাগা।

এই বলিয়া হরকান্তবাবু রোগীটিকে নানা কথায় তুষ্ট করিলেন এবং কম্পাউণ্ডার, ব্রাহ্মণ ও চাকরকে যত্ন করিবার জন্য বিশেষভাবে বলিয়া দিলেন। পরদিন হাঁসপাতাল দেখিতে আসিলে রোগী আবার ঐ কথাই বলিল; হরকান্তবাবু তাহাকে অনেক উৎসাহ দিলেন। তিনি বলিলেন, তোমার কোন কষ্ট হইবে না, ৫।৭ দিন থাকিলেই ব্যারাম অনেকটা সারিয়া যাইবে; তুমি সুস্থ হইবে। এইরূপ কথাবার্ত্তার পর তিনি বাসায় চলিয়া গেলেন।

পরদিন হরকান্তবাবু হাঁসপাতালে আসিবার পূর্ব্বেই রোগী হাঁসপাতাল হইতে পলাইয়া গেল। হরকান্তবাবু এই সংবাদ পাইয়া তাহাকে ধরিয়া আনিলেন এবং ধমক দিয়া বলিলেন, এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই তোমার বিপদ ঘটিবে। রোগী দাঁড়াইয়া কান্দিতে লাগিল। আর বলিতে লাগিল—হিঁয়া রহেনেছে হাম মর যাগা। হরকান্তবাবু সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকটা এ কথা কেন বলে। পূর্ব্বের রোগীটী মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল। হরকান্তবাবু ঐ রোগীকে হাসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

—কি হয়েছে বল। লোকটা এমন করিতেছে কেন ?

পূর্ব্ব রোগী—বাবু ঐ লোকটাকেই জিজ্ঞাসা করুন, ঐ লোকটাই বলিবে, আমাকে কোন কথা বলিতে হইবে না।

হরকান্তবাবু—হাঁরে কি হয়েছে, বল্ দেখি; কোন ভয় নাই, সত্য কথা বল্।

রোগী—রাত্রি একটার সময় সম্মুখের ঐ গাছটা হইতে একটা ভূত নামিয়া আসিয়া আমাকে বলে "তুই আমার বিছানায় শুইয়াছিস্ তোর ঘাড় ভাঙ্গিয়া ফেলিব"। প্রত্যহ আমাকে ভয় দেখায়, আমি এখানে থাকিলে ভূতটা আমাকে মারিয়া ফেলিবে।

হরকান্তবাবু—ভূতটা কেমন?

রোগী—বিকট আকৃতি, মাথাটা উল্টা দিকে বসান, অর্থাৎ পিটের দিকে মুখ। পা দুইখানা উল্টা দিকে দিকে ফিরান।

তখন পূর্ব্বের রোগীটা বলিল—"আমিও ঐ জন্য ঐ বিছানায় থাকিতে পারি নাই, আমাকেও ঐ ভূতটা ঐ রকম বলিত"। হরকান্তবাবু ভূত-প্রেত মানিতেন না। রোগীদের কথায় আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি অনু-সন্ধানে জানিলেন, ঐ তক্তাপোষ ও বিছানায় পূর্ব্বে একটা রোগী থাকিত, তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি তক্তাপোষ ও বিছানা সরাইয়া দিলেন ঘরটা জল দিয়া পরিষ্কার করিলেন এবং নূতন তক্তাপোষ ও বিছানা আনা-ইয়া রোগীর শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সেই দিন হইতে ঐ রোগী আর ভূত দেখিতে পাইত না। ভূতটা আর কোন উপদ্রব করিত না।

এই ঘটনার পর হইতে হরকান্তবাবুর ধারণা হইল, হিংসা দ্বেষ কাম ক্রোধ সর্ব্বপ্রকার দুষ্প্রবৃত্তি সকল মৃত্যুর পরও থাকে; দেহের বিনাশে ইহাদের বিনাশ হয় না। এইজন্যই এত সাধন ভজনের প্রয়োজন। লোকটার মৃত্যু হইয়াছে, তথাপি বিছানার উপর এত আসক্তি যে, অন্যকে ঐ বিছানায় শুইতে দেখিলে সে ক্রোধান্বিত হইয়া মারিতে আসে।

হরকান্তবাবু পূর্ব্বে পরলোকের কথা ভাবিতেন না, এখন হইতে পর লোক ও অধ্যাত্মজগতের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ঋণ আদায়

হরকান্তবাবু সাধনভজন ও শালগ্রামের সেবায় পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মধ্যে ক্রমশঃ ধর্ম্মানুরাগ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল; ধর্ম্মসাধনের মধুরাস্বাদন তাঁহার অনুভব হইতে লাগিল। তিনি শাস্ত্র ও সদাচারের অনুগত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরে দিন দিন বৈরাগ্যের উদয় হইতে লাগিল; সংসারসুখ আর তাঁহার ভাল লাগে না।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে একদিন হরকান্তবাবু স্বপ্ন দেখিলেন—তিনি বাসা হইতে হাঁসপাতাল দেখিতে যাইতেছেন; সঙ্গে কম্পাউণ্ডার ও আরদালী আছে। এমন সময় একজন ভোজপুরে প্রকাণ্ড পালয়ান দ্রুতপদে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটার প্রকাণ্ড দেহ। সে অত্যন্ত বলশালী। তাহার বড় বড় গোঁফ এবং গাল-পাট্টা। মাথায় একটা পাকড়ী, গায়ে চাপকান। পায়ে নাগরা জুতা। পরনে মালকোঁচা-মারা কাপড়, হাতে প্রকাণ্ড লাঠি। লাঠির মাথায় ও প্রত্যেক গিরেতে বড় বড় লোহার গুলম্যাক। লোকটা চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া হরকান্তবাবুকে হুঙ্কার করিয়া বলিল

—দেও, হামরা পয়সা দেও।

হরকান্তবাবু—তোমার কিসের পয়সা?

পালয়ান—কিসের পয়সা? তোম নিয়া নেই? আবি ধর্‌ দেও।

হরকান্তবাবু—হাম কেসিকো পাস কভি কুচ লিয়া নেই।

পালয়ান—(রাগান্বিত হইয়া) নিয়া নেই?

এই বলিয়া পালয়ান হরকান্ত বাবুর সম্মুখে একখানা রসিদ ধরিল।

হরকান্ত বাবু রসিদখানি পড়িয়া দেখিলেন, তাঁহার ৵৫ পাঁচ পয়সা লওয়া আছে, আর ঐ রসিদখানি তাঁহার নিজের হাতে লেখা ও তাহাতে তাঁহার নিজের দস্তখত রহিয়াছে।

পালয়ানের ভীষণ তাড়না ও নিজের হাতের লেখা রসিদ দেখিয়া হরকান্ত বাবু মহাভীত হইলেন। তাঁহার মহা কাঁপুনি ধরিল। পালয়ানের এমনি তাড়না যে, হরকান্তবাবু বাসায় ফিরিয়া গিয়া যে পাঁচটি পয়সা আনিয়া দিবেন এই সময়টুকু পর্য্যন্ত সে দিতেছে না, সে একেবারে মারমুখী!

মহাভয়ে হরকান্তবাবুর হৃৎপিণ্ড সজোরে স্পন্দিত হইতে লাগিল, ইহাতেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গের পর তিনি দেখিবেন, তাঁহার শরীরে কম্প হইতেছে এবং হৃৎপিণ্ড জোরে স্পন্দিত হইতেছে।

হরকান্তবাবু অসদুপায়ে কখনও অর্থোপার্জ্জন করেন নাই। তিনি জীবনে কাহারও নিকট ঘুস গ্রহণ করেন নাই। তিনি অত্যন্ত কর্ত্তব্য-পরায়ণ ছিলেন। এই রসিদ ও পয়সার কথা তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার কিছুই স্মরণ হইল না।

যখন এই ঋণের কথা হরকান্তবাবুর কিছুতেই স্মরণ হইল না, তখন তিনি এই ভয়াবহ স্বপ্ন-বৃত্তান্ত গোস্বামী মহাশয়কে লিখিয়া পাঠাইলেন। গোস্বামী মহাশয় হরকান্তবাবুর পত্রের উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন, "আপনার ৵৫ পাঁচ পয়সা দেনা আছে। যে লোকের নিকট এই দেনা আছে, সে লোক মরিয়া গিয়াছে, তাহার উত্তরাধিকারী কেহ নাই। পান ও সুপারির মূল্য দরুণ এই দেনা। নানক সাহী মন্দিরে ৫৲ টাকা দিবেন, তাহা হইলে ইহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে।" গোস্বামী মহাশয়ের পত্র পাইয়া হরকান্তবাবু তাহাই করিলেন।

ঋণ মহাপাপ, পরিশোধ করিবার শক্তি বা উপযুক্ত বিষয় না থাকিলে

কাহারও ঋণ করা কর্ত্তব্য নয়। ঋণপরিশোধের শক্তি বা উপযুক্ত বিষয় না থাকিলে যে ব্যক্তি ঋণ করে, অথবা ঋণ করিয়া যে ব্যক্তি তাহা পরিশোধ না করে, শাস্ত্র তাহাকে চোর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঋণগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে পরকালে ঋণ গৃহীতাকে বহু যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবেই হইবে। ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও অব্যাহতি নাই।

গোস্বামী মহাশয় মুখে উপদেশ দিতেন না, কারণ তিনি জানিতেন মুখের কথায় ফল হয় না, মুখের কথায় লোকের বিশ্বাস হয় না। একারণ একএকটি ঘটনার দ্বারা শিষ্যগণের শিক্ষাবিধান করিতেন, আজ হরকান্তবাবুর স্বপ্নবৃত্তান্ত দ্বারা ঋণগ্রস্তের বিড়ম্বনাটা বেশ বুঝাইয়া দিলেন। শিষ্যগণের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হইল, ঋণ করা ও পরকে ফাঁকি দেওয়ার বিপদ হৃদয়ঙ্গম করাইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দেহত্যাগ

এই স্বপ্নদর্শনের পর হইতে হরকান্তবাবু বুঝিলেন, ঋণ করিয়া কাহারও নিস্তার নাই। লোককে ফাঁকি দিয়া বা পরস্ব অপহরণ করিয়া যাহারা মনে করে বেশ লাভ হইল, তাহাদের জানা উচিত যে তাহাদের সেই লাভ কড়ায় গণ্ডায় আদায় হইবে। ইহকাল কয়েকটা দিন মাত্র, অনন্তকাল সম্মুখে রহিয়াছে। ইহকালে যদি আদায় না হয়, নিশ্চয় জানিতে হইবে পরকালে মায় সুদে আদায় হইবেই হইবে। ন্যায়বান সূক্ষ্মদর্শী ভগবানের রাজ্যে কাহারও ফাঁকি খাটিবে না। অন্যায় করিয়া কাহারও নিস্তার নাই।

এই স্বপ্নদর্শনের পর হইতে হরকান্তবাবু তাঁহার পরিবারবর্গকে

হুকুম দিলেন যে, কোন জিনিষ যেন ধারে আনা না হয়। পরিবারবর্গ তাহাই করিতে লাগিলেন। ইহাতে সময়ে সময়ে নানা অসুবিধা উপস্থিত হইতে লাগিল, কিন্তু হরকান্তবাবুর শাসনে তাঁহার পরিবারবর্গকে এই অসুবিধা সহ্য করিতে হইয়াছিল।

হরকান্তবাবু ইহজীবনে যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় গুরু-পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া নিজে পেন্সন লইয়া চাকরী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি মাসিক ১০০৲ একশত টাকা পেন্সন পাইতেন, তন্মধ্যে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পরিবার-প্রতিপালনে ব্যয় করিতেন, অবশিষ্ট ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা গুরুর আশ্রমের ও শ্রীমতী শান্তিসুধার খরচের জন্য ব্যয় করিতেন।

মৃত্যুর তিনবৎসর পূর্ব্বে হরকান্তবাবু পুরীমোকামে গুরুদেবের সমাধিতে আসিয়া অবস্থিতি করেন। এই সময় হইতে তিনি সংসারের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ রহিত করিয়াছিলেন। তিনি এই স্থানে গোস্বামী মহাশয়ের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীশ্রীমহাবিষ্ণু চক্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজে পূজা করিতেন, তিনি দিবারজনী কেবল সাধন-ভজনে কাল যাপন করিতেন। কাহারও সহিত একটি বাজে কথা বলিতেন না।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ২রা জানুয়ারী তারিখে ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে তিনি এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গ্রন্থকারের বিপদ-উদ্ধার

পাঠক মহাশয়, "মহাপাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুর লীলা" নামক গ্রন্থে আমার বিপদের কথা পাঠ করিয়াছেন। আমি জলদাপে

বিপন্ন। বাঙ্গালী মাড়য়ারী, ইংরেজ, ফরাসী ওলন্দাজ, অষ্ট্রিয়ান পারসিক ও জারম্যান ডিক্রিদারগণ আমার উপর সহস্র সহস্র টাকার ডিক্রি করিয়াছে। সর্ব্বাগ্রে টাকা আদায় করা সকলেরই চেষ্টা। কেহ একটু সময় দিতে রাজি নহে। আমার ঘর, বাড়ি, জমি, জায়গা, পুকুর, বাগান প্রভৃতি সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে, আমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আমার পশ্চাতে আদালতের কর্ম্মচারী ছুটিয়াছে; আমার এমন অর্থ নাই যে, আমি এই বিপুল দেনা পরিশোধ করি। আমার সর্ব্বস্ব বিক্রয় হইলেও ডিক্রিদারগণের দেনা শোধের সম্ভাবনা নাই।

এই বিপন্ন অবস্থায় কালযাপন করিতেছি এমন সময় জন উইটজার নামক জনৈক অষ্ট্রিয়ান ডিক্রিদারের লোক আমাদের প্রথম মুন্সেফ বাবু উপেন্দ্রনাথ ভঞ্জের বাসায় দুইটী ডিক্রির টাকা আদায় করিবার জন্য উপস্থিত হইল। ডিক্রি দুইটী কলিকাতার ছোট আদালতে ডিক্রি। প্রত্যেকটির দাবির পরিমাণ প্রায় ১৬০০৲ টাকা।

ডিক্রিদার সাহেব, ডিক্রিদারের লোক সাহেব, বাঙ্গালীর নিকট সাহেবের খাতির স্বতন্ত্র। ভঞ্জ মহাশয়, উকিল বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাসায় ডাকাইয়া আনিলেন এবং আমার নামে ডিক্রি জারী করিয়া টাকা আদায় করিতে আদেশ দিলেন। কৃষ্ণবাবু আমার প্রতিবেশী। আমার যাহা কিছু আছে, তিনি সব জানেন। তিনি ডিক্রি জারি করিয়া আমার বাড়ী ও অস্থাবর ক্রোক এবং আমায় গ্রেপ্তার করিবার প্রার্থনা করিলেন। কৃষ্ণবাবু বন্ধু লোক, এক আদালতে ওকালতি করি, তাঁহার দ্বারা রক্ষার চেষ্টা করিলাম; তাহাতে কোন ফল হইল না। কিছুদিন সময় চাহিলাম, তাহাতেও ডিক্রিদার সম্মত হইল না। আমার বাটি ক্রোক হইল, আমার অস্থাবর ক্রোকের আদেশ হইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এখন কি করিব।

আমার বৃদ্ধ বয়স, একাল পর্য্যন্ত যাহাকিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলাম সব গেল, বাড়ী ঘর পর্য্যন্ত লইয়া টানাটানি। বিপুল দেনা ঋণ-শোধের কোন উপায় নাই, চারিদিকে শত্রু হাসিতেছে, কত লোক টিট্‌কারী দিতেছে। এখন কি করিব ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া যখন দেখিলাম কোন দিকে কোন উপায় নাই, তখন আমার মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। আমি মনে করিলাম, ভগবান আমাকে নিপাত করিলেন, আমি আর আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করিব না, ভগবান যাহা করেন তাহাই হইবে।

আবার ভাবিলাম—"ভগবান যাহা করেন তাহাই হইবে", এ কথাটা আমার মুখে সাজে না। ভগবানে আমার নির্ভর কই? যদি ভগবানে নির্ভর থাকিত, তাহা হইলে "এখন কি করিব," এ প্রশ্ন আমার মনে আদৌ উদয় হইত না। "এখন কি করিব" এই প্রশ্ন যখন মনোমধ্যে উদয় হইয়াছে, তখন আমার মধ্যে পুরুষকার রহিয়াছে! পুরুষাকার থাকিতে নির্ভর আসে না। যতক্ষণ পুরুষাকার আছে, ততক্ষণ পুরুষা-কারের সম্পূর্ণ পরিচালনা করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে ধর্ম্মহানি হইবে এবং তজ্জন্য পরে অনুতাপ করিতে হইবে; মনের মধ্যে নানাপ্রকার গ্লানি উপস্থিত হইবে। এখন যাহাতে আত্মরক্ষা হয়, সেই কাজ করাই কর্ত্তব্য।

এই ভাবিয়া আমি আইনের আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষার্থে কৃতসংকল্প হইলাম। নিজে উকিল, আইনের ফাঁকি খুঁজিতে লাগিলাম, আদালতের সমস্ত উকিলগণের সহিত পরামর্শ করিলাম। কোথায়ও কোন ফাঁক দেখিতে পাইলাম না। সকলেই বলিলেন, অস্থাবর ক্রোক বন্ধ করিবার কোন উপায় নাই। আইন ও নজীর সমস্তই আপনার প্রতিকূল।

আমি ভাবিলাম দেওয়ানি কার্য্য-বিধি আইনের ৪৭ ধারায় বিধান-

মতে একটা ফাঁকা আপত্তি উপস্থিত করি। আদালত অবশ্য সে আপত্তি অগ্রাহ্য করিবেন। আদালত আমার আপত্তি অগ্রাহ্য করিলেই আমি সঙ্গে সঙ্গে আপীল করিয়া নথী তলব করিয়া দিব, সুতরাং অস্থাবর ক্রোক আপাততঃ কিছুকালের জন্য বন্দ থাকিবে।

এই ভাবিয়া দুইটী ডিক্রীজারিতেই আমি দেওয়ানি-কার্য্যবিধি আইনের ৪৭ ধারার বিধান মতে আপত্তি দাখিল করিলাম। প্রথম আপত্তি ডিক্রীজারির দরখাস্তের সত্যপাঠে ও ওকলতনামায় ডিক্রীদারের দস্তখত নাই, ডিক্রীদারের পক্ষে তাহার কর্ম্মচারীর দস্তখত করিবার অধিকার নাই। দ্বিতীয় আপত্তি কলিকাতার ছোট আদালতের ডিক্রীর দাবি ১০০০৲ টাকার অধিক, একারণ মুনসফী আদালতে ডিক্রীজারির কার্য্য চলিতে পারে না; মুনসফী কোর্টের এলেকা (Jurisdiction) নাই।

আদালত দেখিলেন, সত্য সত্যই ডিক্রীজারির দরখাস্তে সত্যপাঠে ও ওকালতনামায় ডিক্রীদার দস্তখত করে নাই; তাঁহার কর্ম্মচারীর দস্তখত করিবার অধিকার নাই; একারণ ডিক্রিজারির দরখাস্ত ওকালত-নামা ও সত্যপাঠের দস্তখত সংশোধন করাইয়া লইলেন। তখন আমি Jurisdiction সম্বন্ধে বিচার করিতে বলিলাম। মুন্সেফ বাবু বলিলেন, Jurisdiction সম্বন্ধে পশ্চাৎ বিচার করা যাইবে, আপাততঃ অস্থাবর ক্রোক হইয়া আসুক। এই বলিয়া অর্ডার সিটে অস্থাবর ক্রোকের হুকুম লিখিলেন।

বাবু উপেন্দ্রনাথ ভঞ্জ বয়োবৃদ্ধ বহুদর্শী মুন্সেফ, আমার বাসার নিকটে তাঁহার বাসা, উভয়ের মধ্যে একটা ভালবাসা আছে। কিরূপ ঘটনাচক্রে আমি এই ঋণজালে জড়িত হইয়াছি, তাহাও তিনি জ্ঞাত আছেন। আমি ঋণগ্রস্ত বিপন্ন, এরূপ অবস্থায় ডিক্রিজারি চালাইবার তাঁহার নিজের

অধিকার আছে কিনা, তৎসম্বন্ধে বিচার না করিয়া আমার অস্থাবর ক্রোকের হুকুম দেওয়ায় আমি মর্ম্মাহত হইলাম। বুঝিলাম, বিচারকের কোন দোষ নাই। বুদ্ধিমান বিচারক এমন অবিচার কেন করিবেন? এ মার উপরের মার। যিনি আমাকে নিপাত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, একাজ তাঁহারই। ভগবান যাহাকে মারিবেন তাহাকে রক্ষা করিতে পারে, এ জগতে এমন কে আছে? ভগবানের মার না হইলে আদালত কখনই এরূপ বে-আইনী হুকুম দিতেন না। যখন ভগবান মারিতেছেন তখন আমার আত্মরক্ষার চেষ্টা করা বৃথা।

আমার অন্তর নিতান্ত বিক্ষুব্ধ হইল, আমি মর্ম্মাহত-হইলাম। ভগবানের উপর এক দারুণ অভিমান উপস্থিত হইল, সে অভিমান অবর্ণনীয়। আমি মনে মনে ভগবানকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলাম, "তোমার এই কাজ? আমার বৃদ্ধ বয়স, একাল পর্য্যন্ত যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলাম তৎসমুদয় হরণ করিলে; আমাকে গাছতলায় বসাইলে; এখন আমার উপার্জ্জন করিবার শক্তি নাই। কাল কি খাইব, কেমন করিয়া সংসার প্রতিপালন করিব, সেই ভাবনায় কুল কিনারা পাইতেছি না। সংসারের মধ্যে একটা হাহাকার উপস্থিত করিয়াছ। অপমান লাঞ্ছনার বাকী রাখিলে না; শত্রুগণ চারিদিকে হাসিতেছে। কালের বন্ধুগণ যদিও মুখে হাহাকার করিতেছেন, কিন্তু মনে মনে তাঁহাদের আনন্দ ধরে না; কত লোক কত টিট্‌কারী দিতেছে; কত লোক কত আমোদ করিতেছে। আমাকে এত দুঃখ দিয়াও কি তোমার খেদ মিটিল না? আবার অস্থাবর ক্রোক? আদালতের নাজির পেয়াদা ইত্যাদি নানা লোক আসিয়া বাড়ি ঢুকিবে; গরু, বাছুর, ধান, খড়, পেটরা বাক্স, সিন্দুক, তৈজসপত্র যাহা কিছু আছে সমস্ত টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া যাইবে; মেয়েরা ছেলেগুলা গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে

থাকিবে এই দৃশ্যটা আমাকে দেখাইবে? আমাকে মারিতে হয় মার, কাটিতে হয় কাট; ছেলেরা মেয়েরা তোমার কি করিয়াছে? তাহাদের এ শাস্তি কেন? আমাকে এইরূপ নির্য্যাতন করিয়া তুমিও কি খুশী হইবে?

"আমি যে ঘোর পাতকী তাহা আমি জানি। আমি তোমার কত নিন্দা করিয়াছি। তোমাকে কত বিদ্রূপ করিয়াছি। তোমার নিকট কত অপরাধ করিয়াছি। আমি সমস্তই জানি। আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু তুমিত আমাকে কর নাই। এত অপরাধ সত্বেও তুমি আমাকে কোলে লইয়াছ। কত আদর করিয়াছ, আমাকে মহা রৌরব হইতে উদ্ধার করিয়াছ। এখন এত নির্দ্দয় কেন হইলে? এক দিনের জন্যও আমি তোমার আর প্রসন্ন বদন দেখতে পাই না।"

"পূর্ব্বে তুমি আমাকে কত আদর করিয়াছ। শত শত বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছে। তোমার আদর আমার প্রাণে ধরে না; আমি তোমার গৌরবে গৌরবান্বিত; এখন কেন এমন হইলে? যদি বল আমার এই শাস্তি পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য ঘটিতেছে, তবে এই অপরাধীকে গ্রহণ না করিলেইত পারিতে? আমি যেমন মহা রৌরবে ডুবিতেছিলাম, সেইরূপ ডুবিতাম। এত আদরের পর এত শাস্তি কেন? আমার দারুণ বিপদে একবার ফিরেও তাকাও না; কেন তুমি আমার প্রতি এত নিষ্ঠুর হইলে?"

তুমি ইচ্ছাময় তোমার উপর কাহারও কর্তৃত্ব খাটে না; তোমার উপর জোর নাই, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। লোকে দেখুক আমি সর্ব্বস্বান্ত হইলাম; আদালতের লোক আমার হাঁড়ি কলসী পর্য্যন্ত টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল। স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলে হাহাকার করিয়া

গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিল ; আমার অপমান লাঞ্ছনার বাকী থাকিল না। তুমি যদি আমার এই অবস্থা কর, তবে কাহার নিকট দাঁড়াইব ?"

মনে মনে এইরূপ বলিয়া আমি নিতান্ত বিমনা হইয়া বাসায় আসিলাম ; মনে একটা দারুণ ক্ষোভ উপস্থিত হইল। আমি অত্মরক্ষার আর কোন চেষ্টা করিলাম না। যদি গরু বাছুর পেটারা সিন্দুক প্রভৃতি তৈজস সরাইয়া দিই, তাহা হইলে পায়ের বিষ্ঠা গায়ে মাখা হইবে। ভগবান যাহাকে মারেন, এজগতে তাহার রক্ষার কোন উপায় নাই। অস্থাবর সম্পত্তি স্থানান্তরিত করিলে অধিকতর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। বাসার জিনিষ বাসায় যেমন ছিল, ঠিক তেমনি রাখিয়া দিলাম ; ভিতর বাড়ী ও বাহির বাড়ীর দুয়ার-কপাট সমস্ত খুলিয়া রাখিলাম। আদালতের লোক যেন অনায়াসে বাড়ী প্রবেশ করিতে পারে।

অমি একজন গণ্য মান্য উকিল, আমার মান আছে ; এখানে আমার একটা প্রাধান্য আছে। আমি সংসারের লোক ; সন্ন্যাসী বা পরমহংস নহি।

আমার মানাপমান জ্ঞান আছে। আসন্ন বিপদে আমি ম্রিয়মান হইয়া পড়িলাম। আমি যেন চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। রাত্রিতে আহারে রুচি হইল না। চক্ষে নিদ্রা আসিল না। প্রাণ ক্ষোভে ও অভিমানে গরগর করিতে লাগিল।

মানুষের যখন সময় ভাল থাকে, তখন অনেক বন্ধু মেলে। কত পরও আপনার হয় ; কিন্তু অসময়ে কেহ ফিরেও তাকায় না। এমন কি স্ত্রী পুত্র পর্য্যন্ত বিরূপ হয়। এখন আমি অর্থহীন, ঋণগ্রস্ত, ও আদালতে লাঞ্ছিত। এখন আমার দিকে কেহ ফিরেও তাকায় না।

আত্মীয় স্বজন খোঁজ খবর লয় না, ভাল করিয়া কথাও কয় না; পাছে টাকাপয়সা ধার চাই বা কোন সাহায্যের প্রার্থনা করি।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ জগতে নামের তুল্য বন্ধু নাই। নাম সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী। আমার এই দুঃসময়ে নামকে স্মরণ না করিলেও তিনি অযাচিতভাবে আপনা হইতে প্রবলবেগে আমার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কামারের জাঁতার ন্যায় প্রবলবেগে আমার মধ্যে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। চক্ষের জলে আমার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আমার প্রাণের যাতনা দূর হইল। আমি বুঝিলাম, এ জগতে যদি আপনার বলিতে কেহ থাকে, তবে নামই আপনার। এমন হিতৈষী এ জগতে কেহ নাই। নাম যেমন ভালবাসিতে জানেন, এমন ভালবাসাও কেহ জানে না। নামের ভালবাসা একেবারে নিঃস্বার্থ ভালবাসা।

নাম যেমন সেবা জানেন, যত্ন জানেন, এমন সেবা কেহ জানে না, এমন যত্ন করিতে কেহ পারে না। নাম আমার ক্ষতস্থানে ঔষধ দিতে লাগিলেন। প্রাণে কত সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। আমার কানে কানে কত আশার কথা বলিতে লাগিলেন। আমার সমস্ত ভয় দূর হইয়া গেল, আমি শরীরে বল পাইলাম। আমার যে এত দুঃখ, নামের কৃপায় সব দূর হইয়া গেল, দুঃখই সুখ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

রাত্রি প্রভাত হইল; আমি নামমাত্র আহার করিয়া কাছারি গেলাম। তথায় দেখিলাম, অস্থাবর ক্রোকের পরওয়ানা প্রস্তুত হইতেছে। এই দেখিয়া আমি বিমনা হইয়া দ্বিতীয় আদালতে গিয়া বসিলাম। আমার মন উড়ু উড়ু করিতে লাগিল। আমি অন্যমনস্ক হইয়া রহিলাম।

এমন সময় দেখিলাম টেবিলের উপর একখানা পুস্তক পড়িয়া রহিয়াছে। অন্যমনস্ক অবস্থায় পুস্তকখানা টানিয়া লইলাম। পড়িবার মনও

নাই, প্রবৃত্তিও নাই। হঠাৎ অন্যমনস্ক অবস্থায় পুস্তকখানি খুলিলাম। যেমন পুস্তকখানা খুলিলাম অমনি দেখিলাম তাহাতে একটা ছোট আদালতের নজির * রহিয়াছে।

কলিকাতা ছোট আদালতের নজির বলিয়া আমার মনটা আকৃষ্ট হইল। নজিরের হেড নোট্‌টা পড়িলাম। দেখিলাম নজিরটী আমার আপত্তির অনুকূল।

নজিরটী আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। ভক্তিভরে গুরুদেবকে মনে মনে প্রণাম করিলাম। আহ্লাদের সহিত ভগবানকে প্রণাম্ করিয়া কান্দিয়া ফেলিলাম। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া মনে মনে বলিলাম, "ঠাকুর! তুমি যে আমাকে যথেষ্ট ভালবাস তাহা আমি বেশ জানি। তুমি যে আমাকে মারিবে না, তাহাও আমি জানি। কিন্তু তুমি যে, আমাকে তাড়া মার, তাহাতেই আমার শরীরের রক্ত শুকাইয়া যায়। তোমার মায়ায় বিশ্ব বিমোহিত। ব্রহ্মাদি দেবগণ তোমার মায়ায় স্থির থাকিতে পারেন না। আমি ক্ষুদ্র কীটানুকীট আমি কেমন করিয়া তোমার মায়ার সম্মুখে স্থির থাকিব? আমার সম্মুখে তোমায় কি এই দারুণ মায়া বিস্তার করিতে হয়? তোমার মায়ায় স্থির থাকিতে পারে এ জগতে এমন কে আছে?"

"তুমি যে কেন আমাকে এত দুঃখ দিলে তাহা আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি আমার প্রতি নিষ্ঠুর নও। আমাকে নির্য্যাতন করিয়া আমার প্রতি তোমার করুণাই প্রকাশ করা হইয়াছে। আমাকে এরূপ নির্য্যাতন না করিলে আমার ঔদ্ধত্য দূর হইত না।

* 14 C. W. N. 662 Sham Sundar Saha & others.

vrs.

Anath Bandhu Saha & others.

আমার উন্নত মস্তিষ্ক অবনত হইত না। উষ্ণ রক্ত শীতল হইত না। এই নির্য্যাতনে আমার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে। আমি এখন সকলকে মর্য্যাদা দিতে শিখিয়াছি। পরের দুঃখে আমার কাতরতা আসিয়াছে। সংসারের ধন জন আধিপত্য সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে। হে কল্যাণময়, জীবের কল্যাণের জন্য তুমি যে কত কি করিতেছ, আমি অবোধ তাহার কি বুঝিব? এখন আমার এই কর, সুখে দুঃখে সকল অবস্থাতেই তোমাকে যেন বিস্মৃত হইয়া না থাকি। তোমার চরণে আমার কোটী কোটী প্রণাম।"

"আজ তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে, আমার দুঃখের নিশ্চয় অবসান হইয়াছে। আর আমাকে ডিক্রীদারগণের নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইবে না। আমাকে পথের কাঙ্গাল হইতে হইবে না। সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইয়া যাইবে। সমস্ত বিপদ কাটিয়া যাইবে। আমার সমস্ত ভয়, ভাবনা, চিন্তা, উদ্বেগ দূর হইয়াছে।"

বাবু হরিপ্রসাদ বসু এম-এ, বি এল, আমাদের কোর্টের এসময়ে সর্ব্বপ্রধান উকীল। তিনি অত্যন্ত প্রতিভাশালী চরিত্রবান ও ধর্ম্মপরায়ণ। তিনি সুবিখ্যাত পূজ্যপাদ স্বামী ভোলানন্দ গিরির শিষ্য। কায়স্থের পর্য্যায়ানুসারে তিনি আমাকে খুড়া বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন। আমিও তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখি। তিনি আমার এই বিপদে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন। আমি নজিরটী পাঠ করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার হস্তে দিলাম। তিনি নজিরটী পাঠ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং আমাকে বলিলেন, "আর ভাবনা কি?"

এই বলিয়া তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া প্রথম মুন্সেফ বাবু উপেন্দ্রনাথ ভঞ্জের এজলাসে উপস্থিত হইয়া বলিলেন ;—

—আপনি উকিল বাবু হরিদাস বসুর প্রতিকূলীয় ডিক্রীজারিতে তাঁহার

অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের হুকুম দিয়াছেন। ক্রোকী পরওয়ানা শীঘ্র বাহির হইবে। কিন্তু আমি বলিতেছি, এই ডিক্রীজারি চালাইবার আপনার অধিকার নাই। ডিক্রিজারির পরিমাণ হাজার টাকার উর্দ্ধ। এ আদালতে ডিক্রিজারি চলিবে না। মহামান্য হাইকোর্টের নজির বাহির হইয়াছে।

মুন্সেফবাবু—আমি নজির জানি, কলিকাতার ছোট আদালতের ডিক্রি, যে কোন কোর্টে জারি হইতে পারে।

হরিপ্রসাদ বাবু—পূর্ব্বে সেইরূপ নজির ছিল বটে; কিন্তু তাহা অধুনা রহিত হইয়াছে। কলিকাতা ছোট আদালতের আইনের ধারার মুখ্যার্থ এই নূতন নজিরে প্রকাশিত হইয়াছে। Any Court means any Court having jurisdiction.

মুন্সেফবাবু—নূতন দেওয়ানি-কার্য্যবিধি আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে যেন বুঝা যায় কলিকাতা ছোট আদালতের ডিক্রির দাবি হাজার টাকার উর্দ্ধ হইলেও এই কোর্টে জারির কাজ চলিবে।

হরিপ্রসাদ বাবু—এ নজিরে নূতন কার্য্যবিধি আইনের ধারারও অর্থ করা হইয়াছে। এই বলিয়া হরিপ্রসাদবাবু নজিরটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া হাকিমকে শুনাইলেন।

নজির বহিখানি হাকিম নিজে আগাগোড়া পাঠ করিয়া বুঝিলেন, ডিক্রিজারি চালাইবার তাঁহার অধিকার নাই। তিনি ডিক্রিদারের উকিলকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন

—আপনার ডিক্রিজারি এ আদালতে চলিবে না বলিয়া ইঁহারা নজির দেখাইতেছেন।

ডিক্রিদারের উকিল—নজির আমার জানা আছে। নজির আমার অনুকূল। কলিকাতা ছোট আদালতের ডিক্রির দাবি হাজার

টাকার অধিক হইলেও, ঐ আদালতে ডিক্রিজারি চলিবে।

মুন্সেফবাবু—নূতন নজির বাহির হইয়াছে। পড়িয়া দেখুন।

এই বলিয়া মুন্সেফবাবু কৃষ্ণবাবুর হাতে নজির-বহিখানি দিলেন। নজিরটী পাঠ করিয়া কৃষ্ণবাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি আমতা আমতা করিতে লাগিলেন। হাকিম ডিক্রিজারির দরখাস্ত ডিস্‌মিস্ করিয়া দিলেন। আমার অস্থাবর ক্রোক রদ হইল, আমি আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার হইলাম।

এই আশাতীত অভাবনীয় ঘটনায় আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, ভগবান আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই। আমার আর বিপদ নাই। আমার সমস্ত বিপদ কাটিয়া যাইবে। বস্তুত তাহাই হইল। ডিক্রিদারগণ আগ্রহ-সহকারে আমার সহিত আপোষ নিষ্পত্তি করিলেন। আমাকে অনেক টাকা ছাড়িয়া দিয়া আমার সাধ্যমত কিছু কিছু আমার নিকট লইয়া আমাকে সমস্ত ঋণদায় হইতে অব্যাহতি দিলেন। আমাকে আর কোন মালি মোকর্দ্দমায় ব্যাপৃত হইতে হইল না।

গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন, "জ্বলন্ত হুতাশনের মধ্য দিয়া তোমাদের পথ"। একথাটি আমার জীবনে আমি বেশ উপলব্ধি করিয়াছি। লুচি মণ্ডা কালিয়া পোলাও খাইয়া ও পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া ধর্ম্মলাভ হইবে, এ কথাটা মনে কেহ স্থান দিবেন না।

ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে অনেক ভোগ ভুগিতে হইবে। পুড়িয়া ছাই হইতে হইতে হইবে। বীজ না পচিলে যেমন অঙ্কুর হয় না, তেমনি জীয়ন্তে না মরিলে ধর্ম্মজীবন লাভ হয় না।

ভজনপথে নির্য্যাতন উপস্থিত হইলেই বুঝিতে হইবে শান্তিলাভের আর অধিক বিলম্ব নাই। নির্য্যাতন ভগবানের অপার করুণা মনে ক[illegible] ধৈর্য্যসহকারে সমস্ত নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইবে।

এ সময় নামই একমাত্র রক্ষার উপায়, নাম ছাড়িয়া দিলে আর রক্ষা নাই। কোনক্রমে নির্য্যাতন সহ্য করিতে না পারিলে ধর্ম্মজীবন প্রস্তুত হয় না।

এইটি বড় বিপদের সময়। সাধনপন্থার এমন বিপদ আর নাই। অনেক সাধক এই বিপদ-কালে নামকে পরিত্যাগ করিয়া বসেন। নাম পরিত্যাগ করিয়া সংসার উন্মুখী হইলে বিপদ কাটিয়া যায় সত্য, কিন্তু সাধক ও আর ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে সমর্থ হন না। ভগবানও তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন।

একারণ সতীর্থ ভাই ভগ্নীগণকে বলিতেছি যে, আপনারা বিপদে অভিভূত হইবেন না, বিপদে গুরুর পরম করুণা মনে করিয়া ধৈর্য্যসহকারে নাম করিতে থাকিবেন। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, সমস্ত বিপদ কাটিয়া যাইবে। প্রাণে শান্তি লাভ হইবে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পতিতার আত্মনিবেদন

সংসার অতীব প্রলোভনের স্থান। এখানে সাবধানে চলিতে হয়। ত্রুটি হইলেই বিপদ। কখন্ কোন্ বিপদ উপস্থিত হইবে, কেহ বলিতে পারে না। সুতরাং সকলের শাস্ত্রকার ঋষিগণের প্রবর্ত্তিত নিয়মমত চলা উচিত। এই সংসারে যত প্রকার প্রলোভন আছে, স্ত্রীলোকের প্রলোভন সর্ব্বাপেক্ষা বিপদজনক। এইস্থানে মানুষের ভয়ের কারণ সর্ব্বাপেক্ষা। ব্রহ্মাদি দেবতাগণও এই স্থানে লাঞ্ছিত হইয়াছেন। এজন্য

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ
বলবানিন্দ্রিয় গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥"

মাতা, ভগিনী, এবং কন্যার সহিতও নির্জ্জনে উপবেশন করিবে না, যেহেতু বলবান ইন্দ্রিয়বর্গ বিদ্বান ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করে।

ভট্টমারী স্ত্রীলোকের মোহে পড়িয়া কাণা বিষ্ণুদাস মহাপ্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ভক্তগণকে শাসন করিবার ও শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন

"প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনি জনার মন॥"

গোস্বামীমহাশয় যে গৃহে থাকিতেন সে গৃহে কোন স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার ছিল না। তাঁহার শাশুড়ীর পক্ষেও এই নিয়ম ছিল। তিনি প্রয়োজন মত চৌকাটের বাহির পর্য্যন্ত যাইতে পারিতেন। তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। স্ত্রীলোক শিষ্যগণ পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া দূর হইতে গুরুকে দর্শন ও প্রণাম করিতেন। স্ত্রী-পুরুষের যাতায়াতের রাস্তা পর্য্যন্ত তিনি আলাহিদা করিয়া দিয়াছিলেন।

কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাসায় অবস্থিতি-কালে গোস্বামী মহাশয়ের কোন ব্রাহ্মিকা শিষ্যা প্রায় প্রতিদিন গুরুকে দর্শন করিতে আসিতেন। ব্রাহ্মিকাগণ সাধারণতঃ স্বাধীনভাবাপন্না। পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে তাঁহাদের সমাজ গঠিত। এ সমাজে সদাচার ও সদাহার নাই। বয়োবৃদ্ধ ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি বা তাহাদের আনুগত্য নাই। শৌচ সংযমাদির কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট নিয়মপ্রণালীও নাই। আমি কোন

নামজাদা ব্রাহ্মকে বলিতে শুনিয়াছি "মনের মিল হইলে সহোদরা ভগ্নীকেও বিবাহ করা যাইতে পারে।" এমন সর্ব্বনেশে কথা আমি কোন জাতির মুখে কখন শুনি নাই।

ইঁহারা হিন্দুসমাজকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে করেন ও ঘৃণারচক্ষে দেখেন। কোন কৃতবিদ্য ব্রাহ্মকে বলিতে শুনিয়াছি—"আমি যে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ইহাই আমার লজ্জার ও পরিতাপের কারণ। পূর্ব্বের ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মগণ একে একে চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের স্থান নূতন লোকেরা অধিকার করায় পূর্ব্বকার সমাজ এখন আর চেনা যায় না।

গোস্বামী মহাশয়ের পূর্ব্বলিখিত ব্রাহ্মিকা শিষ্যা পরম রূপবতী ও যুবতী ছিলেন। তাঁহার চরিত্র সুনির্ম্মল এবং তিনি অত্যন্ত পতিপরায়ণা ছিলেন। তিনি আপন চরিত্রবলে বিপথগামী স্বামীকে সুপথে আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি সুশিক্ষিতা ও আত্মীয়-স্বজনের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। লোকে তাঁহার বিবিধ গুণের যথেষ্ট প্রশংসা করিত।

ধর্ম্মের পথ অতি সূক্ষ্ম। এখানে একটু অসাবধান হইলে আর রক্ষা নাই। লোকে এই ব্রাহ্মিকার যথেষ্ট প্রসংশা করিতে থাকায় ক্রমে তাঁহার মনে অহঙ্কারের উদয় হইল। তিনি গর্ব্বিতা হইয়া উঠিলেন। লোকের দোষদর্শনটা অভ্যস্ত হইয়া পড়িল। তিনি আপনাকে পরম চরিত্রবতী ও ধার্ম্মিকা মনে করিতে লাগিলেন। তিনি নিজের ন্যায় পতিব্রতা স্ত্রী আর ব্রাহ্মসমাজে খুঁজিয়া পাইলেন না।

সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাসায় স্ত্রী-পুরুষ যাতায়াতের ভিন্ন ভিন্ন পথ ছিল। গোস্বামী মহাশয়ের আদেশ মত মহিলাগণ এক পথে যাতায়াত করিতেন, পুরুষগণ অন্য পথে যাতায়াত করিতেন। ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীস্বাধীনতা অত্যন্ত প্রবল। যে পথে পুরুষগণ যাতায়াত করে, এই ব্রাহ্মিকা সেই পথে নিঃসঙ্কোচে যাতায়াত করিতেন। গোস্বামী মহাশয়ের সেবক বাবু

বিধুভূষণ ঘোষ তাঁহার এই আচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে একদিন ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—

"আপনি এই পথে যাতায়াত করেন কেন? গোস্বামী মহাশয় স্ত্রীলোক ও পুরুষের যাতায়াতের পথ পৃথকরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুরুষেরা পুরুষের পথে এবং স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীলোকের পথে যাতায়াত করিবেন। আপনাদের পৃথক পথ থাকিতে পুরুষের গা ঘেঁসিয়া পুরুষদের পথে কেন যাতায়াত করেন? আপনি কি আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করেন? আপনি কি মায়ার অতীত অবস্থা লাভ করিয়াছেন? যদিও আপনি মায়াতীত অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন, আমরা কেহ সে অবস্থা লাভ করিতে পারি নাই। আমাদিগকে বিশ্বাস কি? কখন কোন ভূত ঘাড়ে চড়িবে, কে বলিতে পারে? আপনি সাবধান হউন এপথে কদাচ যাতায়াত করিবেন না"। বিধুবাবুর কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটী অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া গেলেন। বিধুবাবুকে আর কোন উত্তর দিলেন না।

অহঙ্কারের ন্যায় শত্রু নাই। যেখানে অহঙ্কার সেইখানেই পতন। দর্পহারী গোবিন্দ কাহারও দর্প রাখেন না। ইহাই তাঁহার পরম করুণা। উৎপথগামী অহঙ্কারীর অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া ভগবান তাহার মধ্যে দীনতা আনিয়া দিয়া তাহাকে আত্মসাৎ করেন। মানুষ দীনহীন কাঙ্গাল না হইলে ধর্ম্মার্থী ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে না। যেখানে অহঙ্কার অভিমান ভক্তিদেবী সেখানে পদার্পণ করেন না।

দৈবের বিড়ম্বনায় একদিন এই দাম্ভিকা ব্রাহ্মিকার হঠাৎ পতন হয়। এই পতনে তিনি নিতান্ত মর্ম্মাহতা ও অনুতপ্তা হইয়া পড়েন। তাঁহার মনে এতদূর গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল যে, তিনি আত্মহত্যা করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ গোস্বামী মহাশয়কে সদ্‌গুরু, সর্ব্বজ্ঞ ও ভবপারের একমাত্র কর্ণাধার বলিয়া জানেন। ভালমন্দ যে যাহাই করুক গোস্বামী মহাশয়কে না বলিলে কাহারও তৃপ্তি হইত না। প্রাণের অতি গোপনীয় কথা, যাহা মনুষ প্রকাশ করিতে পারে না, গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ গুরুর নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেন। তাঁহার নিকট শিষ্যগণ কোন কথা গোপন করিতেন না। দারুণ পাপাচরণের কথাও ব্যক্ত করিয়া ফেলিতেন। গোস্বামী মহাশয়কে তাঁহারা যেমন পরম হিতৈষী জানিতেন এমন হিতৈষী আর কাহাকেও জানিতেন না। গোস্বামী মহাশয়ের স্বভাব এতই মধুর এবং তাঁহার ভালবাসা এতই অধিক যে তাঁহার শিষ্যগণ প্রত্যেকেই মনে করিতেন যে, গোস্বামী মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকেই অধিক ভালবাসেন এবং তাঁহার মত হিতৈষী আর কেহ নাই।

হঠাৎ পতনে এই ব্রাহ্মিকা শিষ্যটী এরূপ মর্ম্মাহতা হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মধ্যে এমন অনুতাপানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল যে, রাত্রির মধ্যে তিনি একেবারে বিবর্ণা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীরটা ঠিক যেন একখানা পোড়াকাঠ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মুখ চোখ সব বসিয়া গিয়াছিল। প্রভাত হইতে না হইতে তিনি উন্মত্তার ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া গোস্বামী মহাশয়ের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,

—প্রভু, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আমার ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে! এখন করি কি? মৃত্যুই এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

গোঁসাই—কোন চিন্তা নাই। আমি আছি। যাহা হইবার তাহাই হইয়া গিয়াছে, আর এমন হবে না। কোন ভয় নাই। সব ধুইয়া পুঁছিয়া যাইবে। স্থির হও, নাম কর, ভগবান তোমাকে পোড়াইয়া খাঁটি করিয়া লইবেন।

গুরুর আশ্বাস বাক্যে যুবতী প্রাণে সান্ত্বনা পাইলেন। পদ্মার স্রোতের ন্যায় নামের বেগ তাঁহার মধ্যে আসিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাঁহার মর্ম্মযাতনা দূর করিয়া দিল। তিনি গুরুকে প্রণাম করিয়া পর্দ্দার আড়ালে গিয়া নাম করিতে লাগিলেন। আজ তিনি যেন এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিলেন।

ভগবান তাঁহাকে কি উপায়ে আত্মসাৎ করিলেন, কে বলিতে পারে? মানুষ যাহাকে ঘোর পাপাচরণ বলে, কাহারও পক্ষে তাহা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবার সোপান। এই পতনে ভগবান ব্রাহ্মিকার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দিলেন। এখন তিনি লোকের মর্য্যাদা দিতে শিক্ষা করিলেন। পরনিন্দা দোষদর্শন তাঁহার অন্তর হইতে চলিয়া গেল। তিনি পুড়িয়া খাঁটি হইলেন। এত দিনের পর ভক্তি দেবীর কৃপা হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রের দেহত্যাগ

শ্রীনারায়ণ ঘোষের নিবাস বানারীপাড়া, জেলা বরিশাল। ইনি শাক্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি একজন জমিদার, ইঁহার বিষয় সম্পত্তি বেশ ছিল। সুরাপান, জীবহিংসা, প্রজাপীড়ন ইত্যাদি নানা দুষ্কর্ম্মে জীবন অতিবাহিত করিতেন। ইনি একেবারে ভবগদ্বিমুখ ও ঘোর সংসারমত্ত। কোন প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান ইনি সহ্য করিতে পারিতেন না।

ইঁহার পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ অত্যন্ত সুবোধ ও শান্তশিষ্ট ছিল। ইহার যখন বয়স ১৫ বৎসর তখন সে বরিশালের ইংরাজি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। ধর্ম্মভাব অত্যন্ত প্রবল থাকায় এই বালক

গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা লইয়া নির্জ্জনে সাধনভজন করিত ও গোপনে গোস্বামী মহাশয়ের ফটো পূজা করিত।

ভগবদ্বহির্মুখ লোকেরা ধর্ম্মানুষ্ঠান সহ্য করিতে পারে না। বালক নরেন ধর্ম্মসাধন করে, ইহা সংসারাসক্ত পিতার সহ্য হইল না। তিনি সন্তানকে অত্যন্ত নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। তাহাকে তিরস্কার ভর্ৎসনা ও তাহার ধর্ম্মানুষ্ঠানের যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিতে লাগিলেন। ইহাতে বালক নরেন্দ্র নিতান্ত ব্যথিত হইত, কিন্তু পিতার তাড়নাতেও সাধনভজন পরিত্যাগ করিত না।

পিতা এই পুত্রকে সাধনভজন হইতে যখন কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহার আর ক্রোধের সীমা থাকিল না। একদিন নরেন্দ্র নির্জ্জনে গোস্বামী মহাশয়ের ফটো প্রশান্ত মনে ভক্তিভরে পূজা করিতেছে, এমন সময় পিতা টের পাইয়া পুত্রের নিকট ছুটিয়া আসিল, এবং ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া পুত্রকে তিরস্কার পূর্ব্বক ফটোখানি ভাঙ্গিয়া টানিয়া ফেলিয়া দিলেন।

এই ঘটনায় নরেন্দ্র বড়ই মর্ম্মাহত হইল। সে গোস্বামী মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল—"ঠাকুর, আর সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমাকে এস্থান হইতে সরাইয়া লউন।" এই বলিয়া নরেন্দ্র বরিশাল রওনা হইল।

গুরু, শিষ্যের এই কাতরবাণী শ্রবণ করিলেন। তিনি শিষ্যের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। পিতার নিকট হইতে আপনার জিনিস কাড়িয়া লইলেন। বরিশালে আসার পর নরেন্দ্র বিসূচিকা-রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইল, আর তাহাকে পিতার নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইল না।

এদিকে শ্রীনারায়ণ ঘোষের বাড়ীতে রক্তবৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রতিদিন রক্তবৃষ্টি হইতে লাগিল। মহাবিপদের আশঙ্কায় সকলে ভয়ব্যাকুলিত·

চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিল। এমন সময় বরিশাল হইতে খবর আসিল বিসূচিকা-রোগে নরেন্দ্র দেহত্যাগ করিয়াছে।

নরেন্দ্রের মৃত্যুসংবাদে তাহার পিতা পিতৃব্য ও বাটীস্থ আত্মীয়স্বজন নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়িল। তাহারা বুঝিল, নরেন্দ্রের নির্য্যাতন ও তাহার গুরুর ফটো ভাঙ্গিয়া দূরে নিক্ষেপ করাই এই সকল বিপদের কারণ। নরেন্দ্রের প্রতি এই সকল অত্যাচার না হইলে এ বিপদ কখনই ঘটিত না।

এই সময় গোস্বামী মহাশয় ঢাকা গ্যাণ্ডারিয়া আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছিলেন। গোস্বামী মহাশয় কাহারও পত্র গ্রহণ করিতেন না এবং কাহারও পত্রের উত্তর লিখিতেন না। এ কথা বাহিরের লোক জানিত না।

নরেন্দ্রের পিতৃব্য যোগেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ নরেন্দ্রের মৃত্যুতে নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়া গোস্বামী মহাশয়কে একপত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ—"আমরা আপনার নিন্দা করিয়া মহা অপরাধ করিয়াছি। আপনি আমাদিগকে ক্ষমা করুন। এতদিনে আমরা আপনার মহিমা বুঝিতে পারিয়াছি। আপনার প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রের প্রতি অত্যাচার হওয়ায় আমাদের ঘোর বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, বাটীতে রক্তবৃষ্টি হইতেছে। নরেন্দ্র আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা বেশ বুঝিয়াছি, আপনিই নরেন্দ্রকে আমাদের নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া, আপনার নিজের নিকট রাখিয়াছেন। আমরা শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস আপনি মনে করিলে নরেন্দ্রকে দেখাইতে পারেন; একারণ আমাদের বিনীত নিবেদন আপনি নরেন্দ্রকে একবার দেখাইয়া আমাদের দুঃখ দূর করুন।"

পত্রখানি গ্যান্‌ডেরিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলে গোস্বামী মহাশয়ের

জামতা ভক্তিভাজন বাবু জগদ্বন্ধু মৈত্র পত্রের কথা গোস্বামী মহাশয়ের গোচর করিলেন। তিনি তাঁহাকে পাঠ করিতে বলিলেন। জগদ্বন্ধুবাবু পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া গোস্বামী মহাশয়কে শুনাইলেন।

গোস্বামী মহাশর পত্রের মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া বাবু জগদ্বন্ধু মৈত্র দ্বারা পত্র লেখাইয়া তাহার উত্তর দিলেন। এই পত্রের মর্ম্ম এইরূপ— "আপনার পত্রে আপনার প্রার্থনা জ্ঞাত হইলাম। নরেন্দ্রকে দেখাইতে পারি। নরেন্দ্র গর্ত্তস্থ হইয়াছে। তাহাকে গর্ত্ত হইতে বাহির করিয়া আনিতে হইলে আর একটী আত্মাকে গর্ত্তের মধ্যে প্রেরণ করিয়া গর্ত্ত রক্ষা করিতে হয়। আপনারা আর নরেন্দ্রকে পাইবেন না, একবার দেখিয়া কি লাভ হইবে? কেবল শোকবৃদ্ধি ও হাহাকার উপস্থিত হইবে মাত্র। আপনারা শোক সম্বরণ করুন। নরেন্দ্রকে দেখিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করুন।" এই পত্র পাইয়া যোগেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ নরেন্দ্রকে দেখিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন।

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥

শুকদেব কহিলেন, হে পরীক্ষিৎ! সাধুজনের বিদ্বেষ কেবলমাত্র মৃত্যুর হেতু নহে, তাহাতে অশেষ পুরুষার্থ-সম্পন্ন ব্যক্তিরও আয়ু শ্রী, যশঃ ধর্ম্ম, স্বর্গাদিলোক, কল্যাণ এবং— সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

একদিন নরেন্দ্রের পিতা একখানি নৌকাযোগে জলপথে গমন করিতেছিলেন। নৌকা ঝালাকাটি গ্রামে উপস্থিত হইলে একখানা ষ্টীমারের তরঙ্গাঘাত প্রাপ্ত হয়। শ্রীনারায়ণ ঘোষ, নৌকার ছইয়ের বাহিরে ছিলেন, তাঁহার জীবনের কোন আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু তিনি যেমন দলিলের বাকস বাহির করিয়া আনিবার জন্য ছইয়ের ভিতর প্রবেশ করিলেন, অমনি নৌকা ডুবি হইল, আর তিনি বাহির হইতে

পারিলেন না। জলমগ্ন হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। সংসারের ধনৈশ্বর্য্য প্রভুত্ব সমস্ত ফুরাইয়া গেল!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সুরর মার গৃহে গোস্বামী মহাশয়ের ভোজন ও তাহাকে অর্থপ্রদান।

দূর জ্ঞাতিসম্বন্ধে সুরর মা আমার জ্ঞাতি ভ্রাতৃবধূ। নিবাস কুলীন-গ্রাম। সুরর মার নাম কুসুম, তাঁহার স্বামীর নাম গোঁসাইদাস বসু। সুরর মা অল্প বয়সে বিধবা হন, কোলে এক মাত্র শিশু সন্তান; তাহার নাম সুরেন্দ্র। এই জন্য কুসুমকে লোকে সুরর মা বলিয়া থাকে।

সুরর মা দরিদ্রা শ্বশুরালয়ে অন্নবস্ত্রের সংস্থান না থাকায় ও উপযুক্ত অভিভাবকের অভাব বশতঃ সুরর মা সন্তানটিকে লইয়া আপন পিতার আলয় দত্তপাড়ায় গিয়া বাস করিতেন। সুরর মা পিতার গৃহকার্য্য করিতেন, পিতার সেবা করিতেন এবং পিতৃগৃহে প্রতিপালিতা হইতেন। সুরর মায়ের নিজের বাড়ীতে কেবল মাত্র একখানি থাকিবার ঘর, আর একখানি রান্নাঘর ছিল। যখন গোস্বামী মহাশয় কুলীন-গ্রামবাসিগণকে নাম প্রেম প্রদান করেন * তখন সুরর মাও সেই সঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত হন। দীক্ষাগ্রহণের পর সুরর মা সাধনভজনে মনোনিবেশ করেন। সুরর মা নাম করিতে করিতে সময় সময় বাহ্যজ্ঞান-শূন্যা হইয়া পড়িতেন। এজন্য সংসারের কায কর্ম্মের বিঘ্ন উপস্থিত হইতে লাগিল। পিতা মহা বিরক্ত হইলেন। কন্যাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভজনের নিন্দা করিতে লাগিলেন। ইহাতে সুরর মা নিতান্ত ব্যথিতা হইয়া গুরুকে বলিলেন,

---

* মহাপাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুর লীলা নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

—গোঁসাই, নাম করিতে বসিলে বাবা বড় বিরক্ত হন, তিনি ভজনের নিন্দা করেন, এবং বাড়ী হইতে দূর হইয়া যাইতে বলেন।

গোসাঁই—তুমি পিতার বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া থাকগে।

সুরর মা—আমার পিতার সেবা করিবার আর কেহ নাই।

গোসাঁই—সে দায়িত্ব তোমার নাই।

সুরর মা—শ্বশুরালয়ে কি খাইব? আমার যে গ্রাসাচ্ছাদনের কোন সংস্থান নাই?

গোসাঁই—সে ভাবনা তোমার ভাবিবার প্রয়োজন নাই। গ্রাসাচ্ছাদন কোন না কোন রকমে চলিয়া যাইবে।

সুরর মা গুরুর কথা শুনিয়া পিত্রালয় পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন; কিন্তু কিসে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে, এই ভাবনাটা ভাবিতে লাগিলেন। একদিন সুরর মা নাম করিতেছেন, এমন সময় পিতা ক্রোধভরে বলিলেন—

—তুই সংসারটা মাটি করিলি, বাড়ী হইতে দূর হইয়া যা।

সুরর মা—আমি গেলে কে আপনার সেবা করিবে?

পিতা—তোর সেবা করিতে হইবে না, এখনি আমার বাড়ী হইতে চলিয়া যা।

সুরর মা—তবে চলিলাম, আমার কোন দোষ নাই। আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আপনার অসুখ হইলে আমাকে সংবাদ দিবেন, আমি আসিয়া সেবা করিব; কিন্তু এ বাড়ীতে আর জলস্পর্শ করিব না।

পিতা—তুই এখনি যা, তোকে আর আসিতে হবে না।

সুরর মা পিতাকে প্রণাম করিয়া পুত্রটিকে কোলে লইয়া নিরাশ্রয়

অবস্থায় শ্বশুরালয় কুলীনগ্রামে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ উকিল বাবু দেবেন্দ্র নাথ মিত্র সুরেন্দ্রকে নিজের কাছে রাখিয়া ইংরেজি লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন। সুরর মায়ের একটা পেট কোন না কোন রকমে চলিয়া যাইতে লাগিল।

একদিন সুরর মা প্রাতঃকালে রান্নাঘর লেপিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, উননের নিকট একটু নুন পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে কতকগুলি পিঁপড়ে লাগিয়াছে। সুরর মা পিঁপড়েগুলিকে নুন খাইতে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন; তিনি পিঁপড়েগণকে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "বাছা তোমরা পরের বাড়ীতে থাক, কত দুধসন্দেশ খাও, এই হত-ভাগিনীর বাড়ীতে আসিয়া কিছুই খাইতে পাইতেছ না, ক্ষুধার জ্বালায় নুন কামড়াইতেছ! আমি বড়ই হতভাগিনী, আমার ঘরে এমন একটু গুড়ও নাই যে তোমাদিগকে খাইতে দিই।"

এই বলিয়া সুরর মা নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া কাঁদিতে লাগি-লেন। গুরুশক্তি জাগ্রত হইল। চক্ষের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে শরীরে দারুণ কম্প উপস্থিত হইল, প্রবলবেগে প্রাণায়াম প্রবাহিত হইতে লাগিল। নামের ঝড় বহিতে লাগিল, গুরুশক্তি সর্ব্বশরীর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সুরর মা বেগতিক বুঝিয়া উঠানে তুলসীতলায় গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লোপ হইল। এই অবস্থায় সুরর মা দেখিলেন, সম্মুখে গোস্বামী মহাশয় দণ্ডায়মান। তাঁহার হস্তে দণ্ডকমণ্ডলু, মস্তকে জটাভার পরিধানে গৈরিক বহির্বাস। গোস্বামী মহাশয় সুরর মাকে বলিতেছেন—

—সুরর মা উঠ, আজ আমি তোমার বাড়ীতে খাইব, আমার জন্য রান্না করগে।

সুরর মা—আমি কোথায় কি পাইব যে তোমাকে খাওয়াইব? ঘরে যে কিছুই নাই!

গোসাঁই—ঘরের কোলঙ্গায় একসের চাউল আছে, তাই রাঁধগে।

সুরর মার চমক ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিলেন। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দেখিলেন, লক্ষ্মীপূজার জন্য, সত্য সত্যই কোলঙ্গায় একসের চাউল রহিয়াছে।

সুরর মা আজ তাড়াতাড়ি স্নান করিতে গেলেন। পুকুর হইতে কিছু কলমি কিছু শুশুনি শাক তুলিয়া আনিলেন। প্রতিবেশীগণের নিকট দুই একটা ঝিঙে ও আলু চাহিয়া আনিয়া রান্না চড়াইয়া দিলেন। রান্না সমাধা হইলে সুরর মা ঘরের মেজেতে আসন পাতিয়া একটা পাথরে অন্নব্যঞ্জন সাজাইয়া দিয়া গুরুকে নিবেদন করিয়া দিলেন, এবং কপাট ঠেসাইয়া দিয়া বাহিরের দুয়ারে বসিয়া কান্দিতে লাগিলেন।

আজ সুরর মার প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছে। গুরু স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া বলিলেন "সুরর মা আজ আমাকে খাওয়াও"। সুরর মা এমনি গরিব যে, কেবল শাক অন্ন রাঁধিয়া গুরুকে ভোগ দিলেন। পাঁচ রকম ভাল সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া ভোগ দিতে পারিলেন না। সুরর মা একাকী কপাটের বাহিরে বসিয়া কান্দিতেছেন, এমন সময় বোসেদের বড় বউ (ইনিও গোস্বামী মহাশয়ের জনৈক শিষ্যা) কিছু আম, কাঁঠাল, রম্ভা, দুধ সন্দেশ লইয়া সুরর মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "সুরর মা, তুই নাকি আজ গোঁসাইর ভোগ দিতেছিস। আমি দুধ সন্দেশ ও ফল আনিয়াছি, গোসাঁইর ভোগে দাও।" এইকথা বলিয়া সুরর মার নিকট জিনিসগুলি নামাইয়া দিয়া বড়বউ বাড়ী চলিয়া গেলেন।

সুরর মা জিনিসগুলি লইলেন এবং ধীরে ধীরে কপাট খুলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন গোসাঁই সশরীরে আসনে উপবিষ্ট।

তিনি সুরর মাকে বলিলেন "আমার সব খাওয়া হইয়াছে ; জিনিসগুলি সমস্ত এখানে রাখিয়া দাও ; পাড়ার ছেলেদিগকে ডাকিয়া প্রসাদ দাও"। সুরর মা গুরুকে প্রণাম করিয়া তাহাই করিলেন।

কিছু দিন পরে আমার সপরিবারে পুরী যাইবার কথা হইল। কথাটা গ্রামে রাষ্ট্র হওয়ায় সুরর মায়ের প্রবল ইচ্ছা হইল যে, সে আমার সঙ্গে যায়। সুরর মা দরিদ্রা নীলাচল যাইবার খরচ সে কোথায় পাইবে ? অর্থাভাবে তাহার পুরী যাওয়া ঘটিবে না সে এই ভাবিয়া নিতান্ত খেদান্বিতা হইল। সে আপনার দুরদৃষ্টকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিল।

যাঁহাদের মধ্যে গুরুশক্তি কিছু প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, শোকতাপ দুঃখযন্ত্রণা উপস্থিত হইলেই তাঁহাদের ভিতর গুরুশক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া শরীর-মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে ; মুহূর্ত্তের মধ্যে শোকতাপ দুঃখযন্ত্রণা সমস্তই ভুলাইয়া দেয়, প্রাণমনকে অমৃত-পাথারে ভাসাইয়া দেয়। গোস্বামী মহাশয়ের প্রত্যেক শিষ্য ইহা আপন জীবনে পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি করিতেছেন।

অর্থাভাবে সুরর মায়ের পুরী যাওয়া হইবে না, এই দারুণ ব্যথা যখন তাঁহার মধ্যে উপস্থিত হইল, প্রবল গুরুশক্তি উদ্‌বুদ্ধ হইয়া তাঁহার সমস্ত শরীরমনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাঁহার মধ্যে প্রবলবেগে প্রাণায়াম উপস্থিত হইল, পদ্মার বন্যার ন্যায় নামের প্রবাহ কূল ছাপাইয়া ছুটিয়া চলিল, শরীরটা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, চক্ষের জলে সর্ব্বশরীর সিক্ত হইল ; সুরর মায়ের বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইল। সে অপার আনন্দ-সাগরে এক একবার ভাসিতে আর এক একবার ডুবিতে লাগিল।

সুরর মায়ের বাহ্যস্ফূর্ত্তি রহিত হইলে, তিনি দেখিলেন গোস্বামী মহাশয় সম্মুখে উপস্থিত। তাঁহার দুইটী হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ, টাকায় পরিপূর্ণ।

তিনি সুরর মাকে বলিতেছেন, সুরর মা! টাকার জন্য ভাবিতেছিস্, আমি টাকা আনিয়াছি, এই টাকা নে"।

সুরর মা এই কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলেন, তিনি আপনাকে শত শত ধিক্কার দিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন, "এ দুর্ম্মতি আমার কেন হইল? আপনার নিকট কি আমাকে অর্থ লইতে হয়? আমার অর্থের কোন দরকার নাই। আপনি যে আমার পরম-অর্থ। আমি পুরী যাইব না। আপনিই আমার জগন্নাথ, আপনিই আমার বলরাম। সমস্ত দেবতাগণ আপনিই, পুরী বৃন্দাবন গয়া গঙ্গা বারাণসী সমস্ত তীর্থ আপনাতেই বর্ত্তমান। আমি কিছু চাই না, কেবল ঐ চরণে স্থান দান করুন। এই বলিয়া সুরর মা গুরুর পাদ-মূলে মস্তক অবনত করিলেন; তৎক্ষণাৎ চমক ভাঙ্গিয়া গেল। সুরর মা উঠিয়া বসিয়া নাম করিতে লাগিলেন।

পাঠক মহাশয়, এই ঘটনার পর হইতে সুরর মা আর পুরী যান নাই, তিনি দরিদ্রতার মধ্যে থাকিয়া কাহারও নিকট কোন জিনিস বাঞ্ছা করেন নাই।

গোস্বামী মহাশয় এই লীলায় দেখাইলেন, সদ্‌গুরু সর্ব্বত্র সকল সময়ে বর্ত্তমান। তিনি পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ। শিষ্যের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সক্ষম। তিনি ক্ষণকালের জন্য শিষ্যকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন না। শিষ্যের সমস্ত ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পরলোকবাসীর আর্ত্তনাদ

পূর্ব্ববঙ্গের কোন একজন বিখ্যাত জমিদার, যৌবনকালে প্রবলধর্ম্মানু-রাগের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার

ধর্ম্মপিপাসার শান্তি না হওয়ায়, গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র কন্যা সকলকে দীক্ষা-মন্ত্র প্রদান করেন। এই দীক্ষা-গ্রহণের পর হইতে তিনি সপরিবারে অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু হইয়াছিলেন।

সন ১৩০০ সালে গোস্বামী মহাশয় উক্ত জমিদারবাবুর কলিকাতার কোনও বাটীতে কিছু দিনের জন্য সশিষ্যে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেই সময়ে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের সহিত বাবুর ও তাঁহার পরিবার-বর্গের একটা বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল।

জমিদার বাবুর ধর্ম্মভাব অত্যন্ত প্রবল থাকিলেও তাঁহার বিস্তীর্ণ জমিদারী ও প্রভূত অর্থ তাঁহার ধর্ম্মপথের প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। ধন ও ধর্ম্ম কদাচ একস্থানে থাকিতে পারে না। এইজন্য রাজপুত্র শাক্য-সিংহ, রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছিলেন। হরজত মহম্মদ সমস্ত আরব ভূমির অধিপতি হইয়াও কখন গিরিগুহায় কখনও বা পর্ণকুটীরে বাস করিতেন। তিনি কখনও ধূলায় কখনও বা একটা ছেঁড়া চেটায় শয়ন করিতেন। মাটির ভাঁড়ে জল খাইতেন; ২।৪টা খেজুর বা আকরোট খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। আরবের রাজস্ব ইসলামের ধন বলিয়া তিনি স্পর্শ করিতেন না।

মহম্মদ যখন সমস্ত আরব-ভূমির অধীশ্বর, তখন তিনি একদিন আপন কন্যা ফতেমার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। মহম্মদ ফতেমার কুটীরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

—মা কেমন আছ ?

ফতেমা—বাবা আমার কথা আর কি জিজ্ঞাসা করিবেন? যেমন পাত্রে আমাকে সম্প্রদান করিয়াছেন, আমি তেমনি আছি।

মহম্মদ—মা, এমন কথা কেন বলিলে? আমি আলির সহিত তোমার

বিবাহ দিয়াছি, এই আরব-ভূমিতে আলি অপেক্ষা অধিক ধার্ম্মিক আর কে আছে?

ফতেমা—বাবা আমি সে কথা বলি নাই।

মহম্মদ—তবে কি বলিতেছ?

ফতেমা—আমি তিন দিন থাইতে পাই নাই।

মহম্মদ—পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। মা, আমিও পাঁচদিন থাইতে পাই নাই।

বিষয় বিষম কালকূট। এজন্য পৃথিবীর যাবতীয় ধার্ম্মিক লোক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসাধন করিয়া গিয়াছেন। বিষয় মানুষকে অমানুষ করে। অভিমান, অহঙ্কার পরিবর্দ্ধিত করে। পরদুঃখকাতরতা ধনীর অন্তরে স্থান পায় না। ধন ক্রমাগত ধনাকাঙ্ক্ষাই বলবতী করে। ধনাকঙ্ক্ষা বলবতী হইলে মানুষ পরপীড়নে পরাঙ্মুখ হয় না। ধনিলোক মানুষের উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে পারে না। ভক্তিদেবী তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন।
মন দুষ্ট হইলে নহে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ॥
শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ বিনা বৃথা এ জীবন।”

এই জন্য সাধু লোকেরা ধনীর সংস্পর্শে আসেন না। তাঁহারা ধনীর অন্ন গ্রহণ করেন না। ধনীর অন্ন বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ভগবান যাঁহাকে কৃপা করেন, তাঁহার ধনৈশ্বর্য্য সমস্ত নষ্ট করিয়া দেন। ধনৈশ্বর্য্য মানুষকে ভগবৎ-বিমুখ করে এই জন্য ভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন

“যস্যাহং অনুগৃহ্লামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।”

“আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, ক্রমে ক্রমে তাহার ধন হরণ করিয়া

থাকি।" যাঁহারা ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে চান, ধনোপার্জ্জন ও অর্থ-ব্যবহার-সম্বন্ধে তাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা অবশ্যকর্ত্তব্য। এইখানেই বিষম পরীক্ষা। কামিনীকাঞ্চন ধর্ম্মপথের অন্তরায়।

সদ্‌গুরুর মহাশক্তি লাভ করিয়াও পূর্ব্বোক্ত জমিদারবাবুর ধনৈশ্বর্য্য তাঁহার যে ধর্ম্মলাভের অন্তরায় হয় নাই, একথা বলা যাইতে পারে না। কারণ মদ খইলে যেমন নেশা হইবেই হইবে, ধনৈশ্বর্য্যও সেইরকম মানুষের মধ্যে কায করিবেই করিবে। বস্তুশক্তির গুণ কোথায় যাইবে?

১৩০৫ সালে গোস্বামী মহাশয় পুরীধামে যখন নীলমণি স্বর্ণ্ণের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থিতি করিছিলেন, তখন জমিদারবাবু জীবিত ছিলেন না। একদিন গভীর রাত্রিতে ঐ বাড়ীতে জমিদারবাবুর ঘোর অর্ত্তনাদ শুনিয়া বাসার সকলে চমকিত ও ভীত হইল। কাতর চীৎকারে সকলের নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

জমিদারবাবু অনেক দিন আগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, একথা সকলে জানেন। তাঁহার গলার স্বরও সকলের জানা আছে। বাসার মধ্যে যে লোক আর্ত্তনাদ করিতেছে, সে লোককে কেহ দেখিতে পাইতেছে না। আর্ত্তনাদ অত্যন্ত ভয়াবহ। এক জন জীবন্ত মানুষকে হাতে পায়ে বন্ধন করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে নিক্ষেপ করিলে তাহার যে রূপ অর্ত্তনাদ হয়, এই আর্ত্তনাদ সেইরূপ।

বাসার লোক মৃত ব্যক্তির এই ভয়াবহ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া ভীত ও চমকিত হইয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ছুটিলেন। তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—

—বাবুর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইতেছিলাম, আমাদের বড় ভয়, ব্যাপার কি বলুন।

গোঁসাই—হাঁ, তিনি আসিয়াছিলেন।

বাসার লোক—তিনি কি জন্য আসিয়াছিলেন এবং এমন ভয়াবহ অর্ত্তনাদই বা কেন ?

গোঁসাই—সহস্র সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিলে মানুষের যেরূপ জ্বালা উপস্থিত হয়, উক্ত বাবু সেইরূপ জ্বালা ভোগ করিতেছেন। জ্বালা অসহ্য হওয়ায় তিনি আমার নিকট রক্ষার জন্য ছুটিয়া আসিলেন।

বাসার লোক—আপনি কি করিলেন ?

গোঁসাই—আমি বলিলাম, পূর্ব্বে আমার কথা শুন নাই, এখন একবৎসর কাল তোমাকে এই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তৎপরে আমি ইহার ব্যবস্থা করিব।

বাসার লোক—বাবু এমন কি অপরাধ করিয়াছিলেন যাহার জন্য তাঁহাকে এই বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে ?

গোঁসাই—তিনি কলিকাতায় এক প্রতিবেশীর একটী বাস্তবাটী কৌশলে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, হয় লোকটীকে টাকা দিয়া সন্তুষ্ট কর, নতুবা ইহার বাস্তবাটী ইহাকে ফিরাইয়া দাও। তিনি আমার কথা শুনিলেন না। এ দুইয়ের মধ্যে কিছুই করেন নাই। পরস্বাপহরণে এক্ষণে তাঁহার এই বিষম শাস্তি ভোগ হইতেছে।

মুখের কথায় কিছু হয় না। এই অবিশ্বাসকর যুগে লোকে মুখের কথায় বিশ্বাস-স্থাপন করিতে পারে না। গোস্বামী মহাশয় শিষ্যগণকে মুখে কোন কথা বলিতেন না। তিনি জানিতেন, শিষ্যগণ মুখের কথা বিশ্বাস করিতে পারিবে না; মুখের কথায় তাহাদের অবিশ্বাস হইবে; তাহারা আজ্ঞাপালনে অসমর্থ হইবে, তাহাতে গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন জন্য বিষম অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে। এজন্য গোস্বামী মহাশয়

নিজের আচরণ ও বিবিধ ঘটনার মধ্য দিয়া শিষ্যগণকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন।

মানুষ যখন সূক্ষ্ম-দেহে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে, এ পৃথিবীর লোক তাহা টের পায় না। সদ্‌গুরুর অসাধ্য কিছুই নাই। পরস্বাপহরণের বিষময় ফল শিষ্যগণকে দেখাইবার জন্য গোস্বামী মহাশয় এই জমিদার-বাবুকে পরলোক হইতে আনাইয়া তাহার দুরবস্থাটা শিষ্যগণকে জানাইয়া দিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মৃগাঙ্কনাথের বেদী

বাবু মৃগাঙ্কনাথ পালিতের নিবাস জেলা বর্দ্ধমানের কোনো পল্লীগ্রামে। ইনি ইংরাজীশিক্ষা পান নাই, বাঙ্গালা লেখাপড়া জানেন, জমিদারী সেরেস্তার কাযে বিশেষ পারদর্শী। ইঁহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ এবং শারীরের বল অসামান্য, অল্প বয়স হইতেই জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করিয়া আসিতেছিলেন।

এ পৃথিবীতে এমন পাপাচরণ নাই, যাহা ইহার দ্বারা অনুষ্ঠিত না হইয়াছে। জীবহিংসা, সুরাপান, ব্যাভিচার, সতীত্বহরণ, গৃহদাহ, জাল-জালিয়াতি, মিথ্যা মোকর্দ্দমা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, অসমগমন, এবং নানা প্রকার দস্যুবৃত্তি ইঁহার নিত্যকর্ম্ম। ইনি একজন গুণ্ডার দলের নেতা ৪টী জেলার লোক ইঁহার অত্যাচার প্রপীড়িত। ইঁহার পিতৃ-উৎসন্ন না করিয়া কেহ জলগ্রহণ করে না। মা নিবারণ করিলেও মায়ের কথা শুনেন না। ইনি নিতান্ত বেহায়া। প্রকাশ্যভাবেই সুরাপান করেন,

প্রকাশ্যভাবেই বেশ্যাবাড়ী যান, রাস্তায় বেশ্যার গলা ধরিয়া বেড়ান, তাহাতে একটু লজ্জাবোধ নাই।

দুর্ব্বৃত্ত জমিদারগণের কায করিতে থাকায় ইঁহার দুষ্প্রবৃত্তি দিন দিন বলবতী হইতে থাকে। কুসঙ্গ ব্যতীত সৎসঙ্গ কথন করেন নাই, সদালাপ কথনও শুনেন নাই; পরপীড়নেই পরমানন্দ। সর্ব্বদাই কুচিন্তা কদালোচনা। দস্যুবৃত্তি যাহাদের পেশা তাহাদের ঘরে অন্ন থাকে না। কুকার্য্যে সমস্ত ব্যয় হইয়া যায়; পৈতৃক সম্পত্তি সমস্ত নষ্ট হয়। ইঁহারও এই দশা। এখন দস্যুবৃত্তিই ইঁহার উপজীবিকা। পাঠক মহাশয় পালিত মহাশয়ের জীবন বৃত্তান্ত অতিশয় কৌতূহলজনক কিন্তু সমস্ত কুকার্য্যে পরিপূর্ণ, সকল কথা লিখিতে হইলে একখানি সুবৃহৎ পুস্তক লিখিতে হয়, আর কুকথা লিখিয়া এই পুস্তকখানি কলুষিত করাও আমার ইচ্ছা নহে, একারণ সে সব কথা লিখিলাম না।

যে যেমন লোক তাহার সঙ্গীও তদ্রূপ। গ্রামের দুর্দ্ধর্ষ জমিদার শত্রু-দমনে অসমর্থ হইয়া উপযুক্ত পাত্র এই দুবৃর্ত্তের সহায়তা প্রার্থনা করে। এই সকল কার্য্যে মৃগাঙ্কনাথের অত্যন্ত রুচি ও দক্ষতা; এরূপ কায পাইলে ইঁহার আনন্দের সীমা থাকে না। মৃগাঙ্কনাথ আনন্দের সহিত জমিদার মহাশয়ের সহায় হইলেন এবং তাঁহার বিপক্ষকে এক মিথ্যা ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় ফেলাইয়া জেল খাটাইয়া দিলেন। জমিদার মহাশয় মৃগাঙ্কনাথের অসামান্য বুদ্ধিমত্তা ও কৌশল দেখিয়া বিমোহিত হইলেন। ইঁহার উপর তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিল, উভয়ে মধ্যে একটা বন্ধুতা স্থাপিত হইল। মৃগাঙ্কনাথ প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া জমিদার মহাশয়ের বাটীতে যান এবং আমোদ-আহ্লাদ করিয়া বাটি আসেন।

জমিদার মহাশয়ের যুবকপুত্র গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য। যুবকটি শান্ত

শিষ্ট এবং অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ, পিতার একমাত্র পুত্র। পুত্রের ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সাধুতায় পিতা সন্তানের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া থাকিতেন এবং সন্তানকে কুপুত্র মনে করিতেন। এক সময় পিতা এই ধর্ম্মপরায়ণ পুত্রকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন। সংসার এইরূপ। সংসারমত্ত লোকেরা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সহ্য করিতে পারে না। ধার্ম্মিক পুত্র-রাও তাহাদের অপ্রিয়। মৃগাঙ্কনাথ যখন জমিদার মহাশয়ের বাটী যাইতেন, তখন দেখিতে পাইতেন যুবক শান্ত ও সমাহিতচিত্তে ইষ্টপূজায় নিমগ্ন আছেন। তাঁহার সম্মুখে গোস্বামী মহাশয়ের ফটো। পার্শ্বে পূজোপ-হার। যুবকের ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি বাটী ফিরিবার সময় ২।১ দিন জানালা দিয়া এই ঘটনাটা দেখিয়া গেলেন, কিন্তু কোন কথা বলিলেন না।

মৃগাঙ্কনাথ, এরূপ দৃশ্য আর কখনও দেখেন নাই। তিনি এক দিন দরজার সন্নিকটে আসিয়া যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন,

—তুমি কি করিতেছ ?

যুবক—আমি ইষ্ট দেবতার পূজা করিতেছি ?

মৃগাঙ্ক—সম্মুখে কাহার ফটো ?

যুবক—আমার ইষ্টদেবের।

মৃগাঙ্ক—ইনি এখন কোথায় আছেন ?

যুবক—কলিকাতায় হ্যারিসন রোডের আশ্রমে।

মৃগাঙ্কনাথ গোস্বামী মহাশয়ের ফটো ও যুবকের প্রশান্তভাব দেখিয়া বিমোহিত হইলেন। যুবক প্রসাদী বাতাসা ইঁহার হাতে দিলেন। মৃগাঙ্কনাথ ভক্তিসহকারে প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন, তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন,

—আমি বহুকাল কুকার্য্যে লিপ্ত আছি, এমন পাপ নাই যাহা আমি করি নাই, আমার যে কি গতি হইবে তাহা আমি জানি না।

আমাদের মত পাপীর কি কোনো উপায় হইতে পারে?

যুবক—পতিত জনকে উদ্ধার করিবার জন্যই ভগবান পতিতপাবন নাম লইয়াছেন। তাঁহার কৃপায় মহা পাপীও ক্ষণকালের মধ্যে পরম সাধু হইয়া যায়, তাঁহার পবিত্রতায় দেশ পবিত্র হয়, কুল পবিত্র লয়, পূর্ব্বপুরুষগণ উদ্ধার হইয়া যায়। তাঁহার প্রতি একবার অনুরাগ জন্মিলেই হইল।

মৃগাঙ্ক—আপনার ইষ্ট দেবতার নাম কি?

যুবক—প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

মৃগাঙ্ক—আমার মত মহা পাপীকে তিনি কি কৃপা করিতে পারেন?

যুবক—তবে আর পতিতোদ্ধারণ নাম কি জন্য? পতিত জনগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই তিনি সদ্‌গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

মৃগাঙ্ক—আমি যে মহা পাপী আমার পাপের যে সীমা নাই।

যুবক—সদ্‌গুরু যখন শিষ্যকে দীক্ষা প্রদান করেন তখন তাহার সমস্ত পাপ নিজে গ্রহণ করেন, শিষ্যকে পাপ হইতে বিমুক্ত করিয়া তবে ভগবানের নাম প্রদান করেন, শিষ্যকে সমস্ত পাপের বোঝা বহিতে হইলে তাহার কি আর উদ্ধার হয়?

মৃগাঙ্ক—বল কি? এ কথাত কখনও শুনি নাই। কেহত বলে না? জগতে কি এমন লোক আছেন, যিনি পরের পাপরাশি নিজে গ্রহণ করেন?

যুবক—হাঁ আছেন! আমি নিশ্চয় বলিতেছি আছেন। এই জন্যইত সদ্‌গুরুর এত মহিমা! পাপী তাপী যে যেখানে থাকুক, তাঁহার স্পর্শ মাত্রই নিশ্চয়ই উদ্ধার হইয়া যাইবে।

মৃগাঙ্ক যুবকের কথা শুনিয়া বিমনা হইলেন, তিনি আর জমিদার বাবুর মজলিশে গেলেন না। এইখান হইতেই বাটি ফিরিলেন।

ইহার পর মৃগাঙ্কনাথ প্রতিদিন জমিদার বাবুর বাটীতে আসিতেন, কিন্তু জমিদার বাবুর সহিত আর দেখা সাক্ষাৎ করিতেন না, যুবকের কাছে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া বাটী ফিরিয়া আসিতেন। একদিন জমিদার বাবু মৃগাঙ্কনাথকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

কি হে? মৃগাঙ্ক! আর যে তোমার দেখা পাই না। তুমি প্রত্যহ আমাদের বাটী আইস অথচ আমার সহিত দেখা কর না, ব্যাপার কি?

মৃগাঙ্ক—হাঁ, আমি প্রত্যহ আসি, আপনার পুত্রের সহিত কথা কহিতে বেলা হইয়া যায় তাই আপনার সহিত দেখা করিতে পারি না। আপনার পুত্রের নিকট হইতেই বাটী ফিরিয়া যাই।

জমিদার—দেখ, ছেলেটাকে যদি বাগাইতে পার তবে চেষ্টা কর। ও একেবারে বয়ে গেছে। এত তিরস্কার এত শাসনে কিছুতেই বশে আসিল না। লেখাপড়াও শিখিল না, সংসারের কাজকর্ম্মও দেখিল না। আমি মরিলে এ সব জমিদারি বিষয় ব্যাপার ও কি চালাইতে পারিবে? এত বয়স হইল এখনও একটু হুঁস হইল না।

মৃগাঙ্ক—বাবু আপনার ছেলের বেশ হুঁস হইয়াছে, ও বুঝিয়াছে সংসার বিষয় আশয় জমিদারী, এসব কিছুই নয়, সংসারে উহার মন নাই।

জমিদার—তাইত বলিতেছি তুমি যদি উহাকে বুঝাইয়া সিধে করিতে পার চেষ্টা কর। নতুবা ছেলেটা একেবারে বয়ে গেল।

মৃগাঙ্ক—বাবু, আমিত অনেক চেষ্টা করিতেছি, কিছুতেই বাগ মানাইতে পারিতেছি না।

জমিদার—তোমার অসাধ্য কিছু নাই, তুমি মনে করিলে না পার এমন

কাজ নাই। ছেলেটাকে এইবার দুরস্ত কর।

মৃগাঙ্ক—(মনে মনে) আমি তাহাকে দুরস্ত করি, কি সেই আমাকে দুরন্ত করে। (প্রকাশ্যে) বাবু আমার চেষ্টার ত্রুটি হইবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

"কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধু সঙ্গে তার কৃষ্ণে রতি উপজয়॥
কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামীরূপে শিখায় আপনে॥
সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ ভক্তে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তি ফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয়॥
সাধু সঙ্গ, সাধু সঙ্গ, সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
লবামাত্র সাধু সঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

মৃগাঙ্ক নাথের সাধুসঙ্গ হইয়াছে। এই সঙ্গের ফলে তাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত, পাপরাশি ধৌত হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে। এখন অনুতাপানলে দগ্ধীভূত, কিসে গোস্বামী মহাশয়ের কৃপা লাভ হইবে এখন কেবল এই চিন্তা। মৃগাঙ্কনাথের সোয়াস্তি নাই, সংসারে বিষয়কর্ম্মে মন নাই।

এই সময় মৃগাঙ্কনাথের বিষম রক্তামশয় রোগ উপস্থিত হইল কবিরাজি চিকিৎসা আরম্ভ হইল, ব্যারাম কিছুতেই উপশম হয় না। আবার মনিবের কাজে তাহাকে বরিশাল রওনা হইতে হইল। সে পূর্ব্বোক্ত জমিদারপুত্র যুবকের নিকট উপস্থিত হইয়া গোস্বামী মহাশয়ের চরণামৃত পান :করিয়া কবিরাজি ঔষধগুলি ফেলিয়া দিয়া সদরে রওনা হইল। মৃগাঙ্কনাথ ভাবিল, এখন গোস্বামী মহাশয়ের কৃপাই একমাত্র ভরসা, তাঁহার কৃপাই ইহকাল ও পরকালের মহৌষধি।

মৃগাঙ্কনাথ জেলার কোন উকীলবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। রাস্তায় ব্যারামটা জানাইল না। উকীলবাবু তাঁহার মনিবের নিযুক্ত উকীল। মৃগাঙ্কনাথ তাঁহাকে কাগজপত্র বুঝাইয়া দিলেন। এই উকীল বাবু গোস্বামী মহাশয়ের জনৈক শিষ্য, তাঁহার বৈঠকখানায় গোস্বামী মহাশয়ের একখানি ফটো টাঙ্গান রহিয়াছে দেখিয়া মৃগাঙ্ক উকীলবাবুকে বলিলেন,

—বাবু, ঐ ফটোখানি আমাকে দিউন না ?

উকীলবাবু—ঐ ফটো আমার ইষ্টদেবের, আমার পূজার জিনিষ, আমি উহা কাহাকেও দিতে পারি না। তুমি ফটো লইয়া কি করিবে ?

মৃগাঙ্ক—আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাই আপনার নিকট চাহিতেছি।

উকীলবাবু—আমি এই ফটোখানি দিতে পারি না, আমার ছেলেদের নিকট আর একখানি ফটো আছে, যদি তাহারা দেয় তবেই তোমাকে দিতে পারিব, নতুবা দিতে পারিব না।

উকীলবাবুর পুত্রগণও গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য, তাহারা ঐ ফটোর পূজা করিয়া থাকে। ফটোর উপযুক্ত মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষিত হইবে না ভাবিয়া, তাহারা ফটো দিতে সম্মত হইল না। সুতরাং মৃগাঙ্কনাথ আর ফটো পাইলেন না।

মৃগাঙ্কনাথ নিতান্ত বিমনা, মনিবের কার্যো তাঁহাকে বাধ্য হইয়া জেলায় আসিতে হইয়াছিল, তিনি এখন চিন্তাসাগরে নিমগ্ন, তাঁহার বুকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রাত্রি আট ঘটিকার সময়ে একটা শিবমন্দিরের দাওয়ায় নির্জ্জনে বসিয়া আপনার গত জীবনের দুষ্কৃতি সকল ভাবিতেছেন আর অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছেন। মনুষ্য জীবন অনিত্য। সমস্ত জীবনটা কুকার্য্যে কাটাইয়াছি, আমার দশা কি হইবে। এই সব ভাবিতে ভাবিতে

মৃগাঙ্কের আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হইল। যেমন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লোপ হইল, অমনি দেখিলেন সম্মুখে গোসাঁই দণ্ডায়মান। তাঁহার মস্তকে জটাভার, হস্তে দণ্ডকমণ্ডলু, পরিধানে গৈরিক বসন। গোস্বামী মহাশয়কে দেখিয়া মৃগাঙ্কনাথ ভক্তিভরে তাঁহার পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত হইলেন, তাঁহার পদরজঃ সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলেন। এমন সময় চমক ভাঙ্গিয়া গেল; দেখিলেন, একাকী সেই শিবমন্দিরের দাওয়ায় পড়িয়া রহিয়াছেন।

এই ঘটনায় মৃগাঙ্কনাথের মন আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। গোসাঁই ধ্যান, গোসাঁই জ্ঞান, কি রূপে গোসাঁয়ের কৃপালাভ হইবে কেবল এই চিন্তা। মৃগাঙ্কনাথ আর বাটিতে স্থির থাকিতে পারিলেন না। কলিকাতা অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তখন গোস্বামী মহাশয় ৪৫ নং হারিসন রোডের আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মৃগাঙ্কনাথ উন্মত্তের ন্যায় তথায় উপস্থিত হইয়া গোস্বামী মহাশয়কে প্রণাম করিলেন। গোস্বামী মহাশয় সেই সময় বহু শিষ্য ও দর্শকবৃন্দে পরিবৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। মৃগাঙ্কনাথ তাঁহাদের সমক্ষে গোস্বামী মহাশয়কে আপনার জীবনের যাবতীয় দুষ্কৃতির কথা বলিতে লাগিলেন। যে সকল দুষ্কর্ম্মের কথা মানুষ কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারে না; সেই সকল কথা অম্লান বদনে অনর্গল বলিতে লাগিলেন। লোক সকল তাঁহার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন, সকলে মনে করিলেন এ লোকটা পাগল। মৃগাঙ্কনাথ এমন সব কথা বলিতে লাগিলেন, যাহা শুনিলে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া হাতকড়ি লাগাইবে। গোস্বামী মহাশয় মৃগাঙ্কনাথকে নিবারণ করায় তিনি নিরস্ত হইল। আর অধিক প্রকাশ করিতে পারিলেন না। সকল লোক অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তখন তিনি গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন—

—মহাশয় আমার পাপজীবনের কথাত শুনিলেন? সকল কথা বলিতে

পাইলাম না, আরও বলিবার অনেক ছিল। আমার মত অপরাধীর কি কোন উপায় হইতে পারে ?

গোসাঁই—ইহা আর অধিক কি ? পর্ব্বত পরিমাণ তুলারাশিতে এক বিন্দু অগ্নিসংযোগ হইলে কতক্ষণ থাকে ?

মৃগাঙ্ক—তবে আমার গতি করুন। আমি আশায় বুক বাঁধিয়া বহুদূর হইতে আসিয়া আপনার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি।

গোসাঁই—তোমার এখন কিছু হইবে না, তুমি তীর্থপর্য্যটন করিয়া আইস।

মৃগাঙ্ক—আমি তীর্থ জানি না, কোন্‌টা তীর্থ কোন্‌টা তীর্থ নয় এ জ্ঞান আমার নাই।

গোসাঁই—তোমাকে অধিক কিছু করিতে হইবে না, কালীঘাটে গিয়া কালীমাকে দর্শন করিয়া আইস; গঙ্গাস্নান কর; তারকেশ্বর ও বৈদ্যনাথ গিয়া বাবাকে দর্শন করিয়া আইস। মুঙ্গেরের কষ্টহারিণীর ঘাটে স্নান কর, এই সব করিলেই হইবে, আর অধিক কিছু করিবার প্রয়োজন নাই।

মৃগাঙ্ক—আমি সুদরিদ্র, আমি কোথায় টাকা পাইব যে এই সব তীর্থপর্য্যটন করিয়া বেড়াইব।

গোস্বামী মহাশয় যোগজীবনকে * ডাকিয়া বলিলেন, ইনি তীর্থপর্য্যটনে যাইবেন, যাহা ব্যয় হইবে সমস্ত ইঁহাকে দাও। যোগজীবন হিসাব করিয়া প্রয়োজন মত টাকা তাঁহার হাতে দিলেন। মৃগাঙ্কনাথ টাকা পাইয়া গোস্বামী মহাশয়কে প্রণাম করিয়া তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইলেন।

মৃগাঙ্কনাথ বৈদ্যনাথ যাইবার অভিপ্রায়ে বর্দ্ধমান ষ্টেশনে বসিয়া আছেন

---

* ইনি গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র ও শিষ্য।

এমন সময় আমার শ্যালক বাবু কালীকৃষ্ণ সরকারের + সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কালীকৃষ্ণ বোলপুর আসিবার জন্য বর্দ্ধমান ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময় ভক্তিভাজন পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় বোলপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মৃগাঙ্কনাথ ও কালীকৃষ্ণ উভয়ে উভয়ের নিকট অপরিচিত। বর্দ্ধমান ষ্টেশনে এই তাঁহাদের প্রথম আলাপ। মৃগাঙ্ক কালীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

—আপনি কোথায় যাইবেন ?

কালীকৃষ্ণ—বোলপুরে।

মৃগাঙ্ক—পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে চেনেন কি ?

কালীকান্ত—খুব চিনি, বোলপুরে তাঁহার আশ্রম আছে, তিনি প্রায়ই আমাদের বাসায় থাকেন, আপনি তাঁহাকে কি করিয়া চিনিলেন ?

মৃগাঙ্ক—তাঁহার সহিত আমার বিশেষরূপ পরিচয় আছে।

কালীকৃষ্ণ—তবে আমার সহিত বোলপুর চলুন। পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

মৃগাঙ্ক—আমার নিকট তীর্থপর্য্যটনের পাথেয় আছে, অন্য কাযে খরচ করিতে পারি না।

কালীকৃষ্ণ—আমার নিকট টাকা আছে, আমি আপনার ব্যয় নির্ব্বাহ করিব, আমার সহিত বোলপুর চলুন।

মৃগাঙ্ক—যে সংকল্প করিয়া বাহির হইয়াছি, তাহা না করিয়া কোন কায করা কর্ত্তব্য নহে, পশ্চাৎ কোন সময়ে সাক্ষাৎ হইবে।

এইরূপ কথাটা যখন হইতেছে এমন সময় ট্রেণ আসিয়া উপস্থিত হইল,

+ ইনি গোস্বামী মহাশয়ের জনৈক শিষ্য। ইঁহার কথা "মহাপাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুর লীলা" নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

উভয়ে আপন আপন গন্তব্য স্থানে যাইবার জন্য পৃথক পৃথক ট্রেণে চড়িয়া বসিল। ট্রেণ গন্তব্য পথে ছুটল।

মৃগাঙ্কনাথ তীর্থপর্যটন করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "এখনও তোমার সময় হয় নাই, সময় হইলে সংবাদ পাইবে"। গোস্বামী মহাশয়ের কথায় মৃগাঙ্কনাথ মর্ম্মাহত হইলেন, বিষণ্ণ-অন্তঃকরণে দেশে ফিরিয়া গেলেন, কিছু দিন পরে গোস্বামী মহাশয়ও পুরী রওনা হইলেন।

দেশে গিয়া মৃগাঙ্কনাথ উৎকণ্ঠার সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন, কিপ্রকারে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষালাভ হইবে কেবল এই চিন্তা। সংসারে মন নাই বিষয়কর্ম্মে মন নাই, ভাবনা কেবল দীক্ষালাভ। মৃগাঙ্কনাথ পূর্ব্বোক্ত জমিদার-পুত্রের সহিত কথাবার্ত্তায় অতি ক্লেশে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অন্য সঙ্গ আর তাঁহার ভাল লাগে না।

কিছুদিন এইরূপে কাটিয়া গেলে, পুরী হইতে পত্র আসিল, তাহাতে লেখা আছে, পুরী আসিলে মৃগাঙ্কের দীক্ষা হইবে। পত্র পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা নাই, তিনি আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন।

মৃগাঙ্কনাথ সুদরিদ্র, তাঁহার পুরী যাইবার সঙ্গতি নাই, বাড়িতে অথবা জনিবের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহের বিলম্ব সহ্য হইল না; তিনি তাড়াতাড়ি পরিচিত কোন মুসলমান ভদ্র মহিলার নিকট গিয়া অর্থ যাচ্ঞা করিলেন, সহৃদয়া মুসলমান মহিলা আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে টাকা দিলেন। মৃগাঙ্ক টাকা লইয়া ঐ মুসলমান রমণীর নিকট হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "যদি ফিরিয়া আসি ও এই ঋণ পরিশোধ করিবার সামর্থ্য হয়, তবেই টাকা পাইবেন, নতুবা আপনার ইহা দান করা হইল জানিবেন। আমি আপনার সন্তান, আপনাকে মাতৃজ্ঞান করিয়া থাকি, আপনার এই উপকার আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। আপনার স্বামীকে আমার

সেলাম দিবেন এবং বলিবেন আমি তাঁহার একটী পুত্র”। মুসলমান মহিলা উহার কথায় আনন্দিত হইয়া সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মৃগাঙ্কনাথ ঐ স্থান হইতেই পুরী রওনা হইলেন; আর বাড়ী ফিরিলেন না। বাড়ীতে একখানা পত্র দিলেন এবং রাস্তা হইতে মনিবকে লিখিলেন—“আপনি আমার অন্নদাতা, আমাকে বহুকাল প্রতিপালন করিয়াছেন, আমি আপনাকে পিতা বলিয়া জানি এবং চিরকাল পিতা বলিয়াই জানিব, আমি আর মানুষের চাকরি করিব না, আমার কাজে অন্য লোক নিযুক্ত করিবেন, আমি বড় দরিদ্র, আমার ভাই আপনার কার্য্য করিতে সমর্থ, যদি বিশেষ প্রতিবন্ধক না হয় তাহা হইলে তাহাকে একটী কাজ দিয়া এই দুঃস্থ পরিবারকে প্রতিপালন করিবেন।”

মৃগাঙ্কনাথ পুরীতে উপস্থিত হইলে গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে ভগবানের অমূল্য নাম প্রদান করিলেন এবং প্রত্যহ পিতৃলোকের তর্পন করিবার জন্য অনুমতি দিলেন। মৃগাঙ্কনাথ মহারত্ন লাভ করিয়া কয়েক দিন পুরীতে অবস্থিতি করিয়া দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এখন আর সে মৃগাঙ্ক নাই। তিনি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট মহামন্ত্র লাভ করিয়াছেন। গ্রামে আসিয়া কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি ছোটলোক, কি ভদ্রলোক, মৃগাঙ্কনাথ যাহাকে দেখেন তাহারই পায়ে পড়িয়া কাঁদেন, আর তার পদধুলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করেন। গ্রামে নানাবিধ লোক আছে, কেহ বলে লোকটা পাগল হইল নাকি? কেহ বলে উহাকে বিশ্বাস নাই, এ যে আবার কি ফন্দি করিতেছে তাহা বুঝা যায় না, হয়ত শীঘ্রই একটা বিষম ফ্যাসাদ উপস্থিত করিবে। আবার যাহারা সৎলোক তাহারা বলিতে লাগিল, মৃগাঙ্ক পুরী গিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা লইয়া আসিয়াছে, তাঁহারই কৃপায় উহার এই পরিবর্ত্তন

উপস্থিত হইয়াছে। মৃগাঙ্ক মহাভাগ্যবান তাহাতে আর সন্দেহ করিবার নাই।

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেলে মৃগাঙ্ক সুস্থ হইলেন। অনন্তর তিনি আড়াই হাত দীর্ঘ ও এক হাত প্রস্থ একটী ইষ্টকনির্ম্মিত বেদী প্রস্তুত করিলেন, এবং সিমেণ্ট মাটি দিয়া উত্তমরূপ মাজিয়া মসৃণ করিলেন। মৃগাঙ্কের ইচ্ছা যে তিনি এই বেদীর উপর গোস্বামী মহাশয়ের ফটো স্থাপন করিয়া পূজা করিবেন এবং ভক্তিগ্রন্থ সকল এই বেদীতে রাখিয়া দিবেন। এই বেদীতে তুলসী বৃক্ষ রাখিবার ব্যবস্থাও করিলেন।

বেদী প্রস্তুত হইয়াছে, প্রাতঃকালে বেদীর উপর গোস্বামী মহাশয়ের ফটো স্থাপিত হইবে, এমন সময় মৃগাঙ্ক দেখিলেন বেদীর উপর দুইটী পায়ের দাগ সিমেণ্ট মাটির উপর গভীরভাবে বসিয়া গিয়াছে। তিনি যেমন এই পায়ের দাগ দেখিতে পাইলেন, অমনি তাঁহার আপাদমস্তক একেবারে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন, গ্রামের প্রায় সকলেই তাঁহার শত্রু; কেহ শত্রুতা করিয়া রাত্রিযোগে বেদীটা মাড়াইয়া অপবিত্র করিয়া গিয়াছে। মৃগাঙ্ক হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে পুরী মোকামে যোগজীবনকে এই মর্ম্মের একখানি পত্র লিখিলেন,—"দাদা আমার দুঃখের বিষয় আর কি লিখিব, আমি বাড়ী আসিয়া একটি ইষ্টকের বেদী নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। সিমেণ্ট মাটি দিয়া মাজিয়া বড় মজবুত করিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম ঐ বেদীর উপর ঠাকুরের ফটো স্থাপন করিয়া প্রত্যহ পূজা করিব, আর ভক্তিগ্রন্থ ও তুলসীবৃক্ষ ঐ বেদীর উপর রক্ষা করিব। গ্রামের লোক এমনি দুষ্ট যে রাত্রিযোগে ঐ বেদীটি মাড়াইয়া অপবিত্র করিয়া গিয়াছে, দুইখানি পা সিমেণ্ট মাটির উপর বসিয়া গিয়াছে। আমি ঝামা দিয়া রগড়াইয়া একটি দাগ কতক পরিমাণে তুলিয়া

দিয়াছি, আর একটি এখনও তোলা হয় নাই। যে ব্যাটা আমার বেদী মাড়াইয়াছে যদি তাহার সন্ধান পাই, তবে নিশ্চয়ই ব্যাটার মুণ্ডপাত করিব। আমি লোকটার অনুসন্ধানে আ ছি, ইত্যাদি।"

যোগজীবন এই পত্রখানি পাঠ করিয়া গোস্বামী মহাশয়কে জানাইলেন। গোস্বামী মহাশয় হাঁসিয়া যোগজীবনকে বলিলেন "মৃগাঙ্ককে লিখিয়া দাও যে বেদীর উপর যে পদচিহ্ন পড়িয়াছে তাহা উঠাইয়া না দিয়া ঐ পদচিহ্নের যেন পূজা করে।" যোগজীবন গোস্বামী মহাশয়ের এই অনুজ্ঞা মৃগাঙ্কনাথকে পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন। তখন মৃগাঙ্কনাথের হুঁস হইল, তিনি বুঝিতে পারিলেন এই পদচিহ্ন কাহার। তিনি অনুতপ্ত হইয়া পদচিহ্নের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মৃগাঙ্কনাথের এই বেদী ও পদচিহ্ন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি প্রতিদিন ঐ পদচিহ্নের পূজা করেন ও ভক্তিগ্রন্থ ও তুলসীবৃক্ষ ঐ বেদীর উপর রক্ষা করেন। মৃগাঙ্ক স্থানান্তরে গমন করিলে তাঁহার কন্যা বা উপযুক্ত লোকের উপর পূজার ভার দিয়া যান।

দীক্ষার পর হইতে যতদিন মৃগাঙ্কের মাতা জীবিত ছিলেন, তিনি প্রতিদিন ফুলচন্দন দিয়া মায়ের চরণ পূজা করিতেন; মাতৃ-আজ্ঞা অবনত-মস্তকে পালন করিতেন, এক দিবসের জন্যও মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই।

স্থানান্তরে যাইতে হইলে মৃগাঙ্ক মাতৃ-আজ্ঞা লইয়া গৃহত্যাগ করিতেন। যাইবার সময় মায়ের চরণামৃত সঙ্গে লইয়া যাইতেন, প্রতিদিন তাহা পান করিতেন।

যে দিন হইতে গোস্বামী মহাশয় তর্পন করিতে অনুমতি দিয়াছেন, সেই দিন হইতে এপর্য্যন্ত তিনি প্রত্যহ তর্পন করিয়া আসিতেছেন; একদিনের

জন্যও কামাই নাই। রোগ প্রভৃতি কোন প্রতিবন্ধকতাই গ্রাহ্য করেন না। মৃগাঙ্কের ভজন যেন পাষাণের রেখা, কিছুতেই নিয়মিত ভজনের ব্যতিক্রম হইবে না।

গোস্বামী মহাশয় তাঁহার প্রত্যেক শিষ্যের জীবনে কত যে লীলা করিতেছেন, কাহার সাধ্য সে সব লীলার কণামাত্র স্পর্শ করে? প্রত্যেক শিষ্যই আপন আপন জীবনে তাঁহার অপার করুণা ও অপূর্ব্ব লীলা দর্শন করিয়া বিমোহিত হইয়াছেন। আমার কি সাধ্য যে সে সব কথা জ্ঞাপন করি।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

পাচক ফকির পাণ্ডার পুরী গমন

ফকির ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার ব্রাহ্মণের আচার অনুষ্ঠান কিছুই ছিল না। সে মহা-মূর্খ, নিতান্ত চরিত্রহীন। তাহার জন্মস্থান উড়িষ্যা।

ফকির যৌবনে গৃহত্যাগ করিয়াছিল এবং কলিকাতায় আসিয়া কলুষিত স্ত্রীলোকের সহবাসে থাকিয়া কলুষিত জীবনযাপন করিত এবং উদরান্নের জন্য ঐ কলিকাতা মোকামেই পাচকের কায করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

১৩০৩ সালে গোস্বামী মহাশয় যখন কলিকাতা হ্যারিসন্ রোডের ৪৫ নম্বর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেন, সেই সময় ফকির গোস্বামী মহাশয়ের ঐ আশ্রমে পাচকের কার্য্যে নিযুক্ত হয়; গোস্বামী মহাশয় কৃপা করিয়া তাহাকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করেন।

গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ভগবানের অমূল্য নাম পাইবা মাত্র ফকির এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিল। আজ আর সে ফকির নাই। সংসারের অতীত স্থানে তাহার মন চলিয়া গিয়াছে। সে প্রেমভক্তিতে মাতয়ারা। তাহার অবস্থা দেবতারও সুদুর্লভ।

গোস্বামী মহাশয় ত্রিতল-গৃহের উপর থাকিতেন, ফকির সর্ব্বনিম্ন তলায় আশ্রমবাসী সকলের জন্য রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত।

হরিনামে মাতয়ারা হইয়া গোস্বামী মহাশয় সশিষ্যে যখন এই ত্রিতল-গৃহে নৃত্য করিতে থাকিতেন, নাম শ্রবণ করিয়া রন্ধন-শালায় ফকির অস্থির হইয়া পড়িত। সে আত্মসম্বরণে অসমর্থ হইয়া রান্না পরিত্যাগ করিয়া হাঁড়ি কড়াই ফেলিয়া দিয়া, হাতা বেড়ি হাতে লইয়াই বায়ুবেগে ছুটিয়া গিয়া তেতলার উপর উঠিত এবং গোস্বামী মহাশয় ও তাঁহার অপরাপর শিষ্যগণের সহিত মিলিত হইয়া ভাব-ভরে অতি সুন্দর নৃত্য করিতে থাকিত। সে হাত ধুইবার সাবকাশ পাইত না, হাতের বেড়ি হাতা হাতেই থাকিয়া যাইত। ফকির একেবারেই বেহুঁস তাহার চক্ষুনিমিলিত, তাহার আদৌ সংজ্ঞা থাকিত না। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য যে একবার দেখিয়াছে সে জীবনে তাহা কখনও ভুলিতে পারিবে না। ফকিরের এইরূপ ভাবাবেশে নৃত্য আমি বহুবার দর্শন করিয়াছি।

১৩০৪ সালের ফাল্গুন মাসে গোস্বামী মহাশয় পুরীধামে গমন করিলে ফকির গোস্বামী মহাশয়ের জামাতা ভক্তিভাজন বাবু জগবন্ধু মৈত্র মহাশয়ের বাসায় কলিকাতা মোকামেই থাকিয়া যায়। গোস্বামী মহাশয়ের সহিত আর তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই।

১৩০৬ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে পুরীধামে গোস্বামী মহাশয়ের দেহত্যাগ হয়। ফকির এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া কলিকাতা মোকামেই অবস্থিতি করিতে থাকেন।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে গোস্বামী মহাশয়ের তীরোভাবের উৎসব উপলক্ষে কলিকাতাবাসী শিষ্যগণ পুরী মোকামে যাইবার উদ্যোগী হইলে ফকির তাঁহাদের সহিত যাইবার প্রার্থী হয়।

তখন ফকির কঠিন যক্ষ্মা-রোগে শয্যাশায়ী, তাহার উত্থানশক্তি নাই। আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে বলিলেই হয়।

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ ফকিরের এই অবস্থা দেখিয়া তাহাকে সঙ্গে লইতে সাহস করিলেন না। সকলেই বিবেচনা করিলেন ফকিরকে সঙ্গে লইলে হয়ত ট্রেণেতেই তাহার মৃত্যু হইবে, পুরী পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে না।

এই অবস্থায় সকলেই ফকিরকে পরিত্যাগ করিয়া হাওড়া রওনা হইলেন, ফকির দীনভাবে কাঁদিতে লাগিল।

পুরীযাত্রীগণকে খোরদা ষ্টেষণে গাড়ি বদল করিতে হইত। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ খোরদা ষ্টেষণে পৌঁছিয়া পুরী লাইনের গাড়িতে যেমন উঠিলেন অমনি দেখিলেন ফকির পাচক গাড়িতে বসিয়া রহিয়াছে। তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

তুমি এখানে কি করিয়া আসিলে?

ফকির—আপনারা ত আমাকে কেহই সঙ্গে লইয়া আসিলেন না; আমার অত্যন্ত কষ্ট হওয়ায় গোস্বামী মহাশয় আমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন।

শিষ্যগণ—তিনি কোথায়?

ফকির—তিনি বরাবর আমার সঙ্গে ছিলেন। আমাকে এই গাড়িতে উঠাইয়া দিয়া গাঁটরিটা নামাইয়া এই মাত্র গেলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ ফকিরের এই কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন। ফকির পাচকের উপর গোস্বামী মহাশয়ের কৃপা দেখিয়া সকলে

ফকিরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তাহাকে অতিশয় যত্নসহকারে পুরীর আশ্রমে লইয়া গেলেন।

ফকির উৎসব দর্শন করিলেন, গুরুর সমাধিতে গড়াগড়ি দিলেন উৎসব শেষ হইলে তিন দিন পরে ফকিরের দেহত্যাগ হইল। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ অতি যত্নসহকারে ফকিরের সৎকার করিলেন।

এখন কথা হইতেছে সাধনভজনহীন অসচ্চরিত্র ফকির কথনও জীবনে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে নাই, সে চিরদিন কুকর্ম্মে রত ছিল, এমন ব্যক্তি যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রের সুদুর্ল্লভ প্রেমভক্তি মুহূর্ত্তকাল মধ্যে কি প্রকারে লাভ করিল? ইহা জনসাধারণের নিকট কোন ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নহে।

একথার উত্তরে আমি এই মাত্র বলিতেছি সদ্‌গুরুর কৃপাই এইরূপ। ইহা পাত্রাপাত্র বাছে না। মানুষ যত কেন দুর্ব্বৃত্ত হউক না, সদ্‌গুরুর কৃপা হইলে সে মুহূর্ত্তমধ্যে ভগবৎ প্রেম লাভ করিয়া থাকে। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্তব করিয়া বলিতেছেন—

"ধর্ম্মস্পৃষ্টঃ সততপরমাবিষ্ট এবাত্যধর্ম্মে
দৃষ্টিং প্রাপ্তো নহি খলু সতাং সৃষ্টিষুকাপি নো সন্।
যদ্দত্তশ্রীহরিরসসুধাস্বাদমত্তঃ প্রনৃত্য
তুচ্চৈর্গায়ত্যথবিলুণ্ঠাতে স্তৌমি তং কঞ্চিদীশম্॥

যে ব্যক্তিকে কখনও ধর্ম্ম স্পর্শ করে নাই, যে সর্ব্বদা অতিশয় অধর্ম্মে আবিষ্ট, যে কখনও পাপপুঞ্জনাশক সাধুজনের দৃষ্টিপথস্থানে গমন করে নাই, সে ব্যক্তিও যাহার প্রদত্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরস সুধার অস্বাদনে মত্ত হইয়া নৃত্য গীত ও ভূমিতে বিলুণ্ঠন করে, সেই কোন অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বরকে আমি স্তব করি।

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম সাধনভজন দ্বারা লাভ হয় না। এই পৃথিবীতে

এমন কোন সাধন নাই যাহা দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেম লাভ হইয়া থাকে। সাধনভজন কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেম সম্পূর্ণ কৃপার বস্তু। একমাত্র মহাপ্রভুর কৃপাতেই ইহা লব্ধ হইয়া থাকে।

ফকিরের প্রতি মহাপ্রভুর যথেষ্ট কৃপা হইয়াছিল, সে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম লাভ না করিবে কেন?

জীবন অনন্ত, আমরা দিন কয়েকের জীবন দেখিয়া মানুষের ভালমন্দের বিচার করি। মহাত্মারা তাহা দেখেন না। তাঁহারা মানুষের আত্মার অবস্থা দেখেন। ফকিরের আত্মার অবস্থা কি মায়াবদ্ধ জীব, আমরা তাহা কি বুঝিব? হয়ত সে কেবল একটা প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিতেছিল। সে কর্ম্মটা শেষ হইলেই তাহার প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পাইত। সেইজন্য মহাত্মাগণের কার্য্যকলাপের প্রতি কাহারও কটাক্ষ করা উচিত নয়।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সুরবালার সান্ত্বনাপ্রদান

সুরবালা উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা রাজমহলে ডাক্তারি করিতেন। সুরবালা বাস্তবিকই যেন সুরবালা, সে বড়ই মধুর ছিল।

সুরবালা স্বামীর প্রতি অত্যন্ত অনুরাগিনী ছিল, তাহার স্বামীও তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত। কেহ কাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না।

ভগবান যাঁহাকে কৃপা করিবেন তাঁহার সংসারসুখ একেবারে নষ্ট করিয়া দেন। পাছে সংসার সুখে মত্ত হইয়া লোকে তাঁহাকে ভুলিয়া

যায়, এই জন্য সংসারসুখের লেশ মাত্র রাখেন না, অধিকন্তু দুঃখের আগুনে দগ্ধীভূত করিয়া তাঁহাকে খাঁটি করিয়া লয়েন।

সুরবালা প্রথম যৌবনে যখন দাম্পত্য-প্রেমে মগ্ন হইয়াছিল, এই সময়েই তাহার স্বামীর বিয়োগ হয়। সুরবালা সংসারের কিছু জানে না, সে এখনও বালিকা, পতিশোকে একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। তাহার অন্তর বিষম দাবানলে দগ্ধীভূত হইতে লাগিল, এ অনলের আর বিরাম নাই।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় সুরবালা সজ্ঞানে জাগ্রত-অবস্থায় তাহার প্রিয়তম পতিকে প্রায়ই দেখিতে পাইত। স্বামীদর্শন হইবা মাত্র তাহার শোকানল আরও পরিবর্দ্ধিত হইত, সে চিৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকিত। কেহ তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিত না।

স্বামীর সাক্ষাৎকারলাভ না হইলে সে ক্রমে ক্রমে স্বামীকে ভুলিয়া যাইত, তাহার শোক নিবারিত হইত, কিন্তু স্বামীকে দেখিতে পাওয়ায় তাহার শোকানল নির্ব্বাপিত হইত না। তাহার যন্ত্রণার সীমা ছিল না।

গোস্বামী মহাশয়ের জনৈক শিষ্য জেলা বীরভূমের অন্তর্গত আলিগ্রাম নিবাসী ভক্তিভাজন শ্রীযুত সূর্য্যনারায়ণ রায়ের পুত্র শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায় গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য। সতীশ বালেশ্বরের পোষ্ট-আপীসে সিগ্নালারের কায করেন। তিনি সুরবালার ভগ্নীপতি।

সুরবালার শোক অপনোদন করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া বাবু সূর্য্যনারায়ণ রায় তাহাকে উপযুক্ত গুরুর নিকট দীক্ষিত করিবার মনস্থ করেন।

তঁহারই আগ্রহে গোস্বামী মহাশয়ের জামাতা ভক্তিভাজন শ্রীযুত বাবু জগদ্বন্ধু মৈত্র ১৩২৪ সালের আষাঢ় মাসে বালেশ্বর মোকামে সুরবালাকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করেন।

দীক্ষা লাভ করিবামাত্র সুরবালার হৃদয়ের সমস্ত তাপ দূরীভূত হইয়াছে। সুরবালা এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিয়া পরম শান্তিতে দিন যাপন করিতেছে।

মন্ত্রপ্রদানের পর হইতে সুরবালা আর স্বামীকে দেখিতে পায় না। সে স্বপ্নাবস্থায় প্রায়ই দেখে গোস্বামী মহাশয় তাহার কাছে বসিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দেন, এবং বলেন—"সুরবালা, সংসারের তুচ্ছ সুখের জন্য তুমি দুঃখিতা হইও না, আমি তোমাকে পরা শান্তি প্রদান করিব। সংসারের সুখ অতি তুচ্ছ এবং ক্ষণস্থায়ী। তুমি ইহার জন্য দুঃখিতা হইও না।"

সুরবালার বয়ঃক্রম এখন ২১ বৎসর হইবে। সুরবালা তাহার শ্বশুর বাটিতে বাস করতেছে। গত পৌষ মাসে সুরবালা তাহার গুরু শ্রীযুত জগদ্বন্ধু মৈত্র মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিয়া বর্তমান অবস্থাটা জ্ঞাপন করিয়াছে। তাহাতে গোস্বামী মহাশয়ের ঐ সকল করুণার কথা লিখিয়াছে এবং বলিয়াছে, এ পৃথিবীতে এমন বস্তু যে আছে তাহা তাহার আদৌ জ্ঞান ছিল না, সে দীক্ষামন্ত্র লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে।

সুরবালা এখন ভগবৎ-আরাধনায় পরমানন্দে সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিষ্যগণের সাধনা

কালের পরিবর্ত্তন ও পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাবে এতদ্দেশীয় লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কমিয়া গিয়াছে। এখন তাহা উপহাসের জিনিষ, ধর্ম্মসাধন নির্ব্বোধের কাজ। অর্থোপার্জ্জন, মানসম্ভ্রম, ইন্দ্রিয়সুখ, নাম যশ, প্রতিপত্তি, লইয়াই লোকে ব্যতিব্যস্ত। কেহ ধর্ম্মের কথা শুনিতে চায় না, ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িতে চায় না। এই সময়ে ধর্ম্মসংস্থাপন সোজা কথা নহে।

পূর্ব্বে লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস ছিল, শ্রদ্ধাভক্তি ছিল, বৈরাগ্য ছিল, লোকে জানিত ধর্ম্মই মনুষ্যজীবনের সারধন, ধর্ম্মলাভ হইলেই সমস্ত লাভ হইল। তখন লোকে ধর্ম্মলাভের জন্য সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল, ধর্ম্মসাধনের জন্য লোকের যথেষ্ট সময় ও সুবিধাও ছিল।

এখন একে অবিশ্বাস, তাহাতে জীবনসংগ্রামের জন্য মানুষ দিনরাত খাটিয়াও উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিতেছে না। ইচ্ছা স্বত্বেও অবস্থা ধর্ম্মপথের প্রতিকূল, ধর্ম্ম কালের উপযোগী না হইলে কাহার সাধ্য যে ধর্ম্ম সংস্থাপন করে? এইজন্যই সদ্‌গুরু অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন।

তিনি শিষ্যগণের মধ্যে শক্তির সঞ্চার করিয়াছেন, শক্তি সঞ্চিত করিয়া ভগবানের অমৃতনাম শিষ্যগণকে প্রদান করিয়াছেন। যতদিন ইষ্টদেবের সহিত শিষ্যগণের পরিচয় না হইয়াছে, যতদিন শিষ্যগণ তাঁহার আদর

মর্য্যাদা না বুঝিয়াছে, ততদিন নিজেই প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজা-অর্চ্চনার ভার লইয়াছেন।

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ইংরাজী-শিক্ষিত; আফিস-আদালতে কাজকর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন এবং স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া গার্হস্থ্যজীবন যাপন করেন। তিনি কাহাকেও ইচ্ছাপূর্ব্বক সংসারত্যাগের ব্যবস্থা দেন নাই।

যদি শিষ্যগণকে পুরুষাকার-বলে ধর্ম্মসাধন করিতে হইত, যদি সাধনের ক্লেশ তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইত, তাহা হইলে বোধ হয় কদাচিৎ কেহ ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে পারিত না; প্রায় সকলেই সাধনভজন পরিত্যাগ করিয়া বসিত।

সাধন-পন্থায় প্রথমে কিছু ক্লেশ স্বীকার করিয়া সকলকেই ভজনসাধন করিতে হয়। ভজনের ক্লেশ দেখিয়া কেহ কেহ সাধনভজন ছাড়িয়া দিয়াছে। গুরুর নিকট তাহারা যে শিক্ষা লইয়াছে, একথাটা তাহাদের স্মরণপথে আছে কিনা সন্দেহ। যদিও গুরু ইঁহাদের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিয়াছেন, তথাপি সাধনভজন অভাবে এই শক্তি প্রকাশিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারিতেছে না, বীজ চাপা পড়িয়া রহিয়াছে।

যদি কখনও তাহাদের সৎসঙ্গ লাভ হয়, যদি তাহারা সাধনভজনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষে পরিণত ও ফলপুষ্পে সুশোভিত হইবে, নতুবা এজন্মটা নষ্ট হইয়া কাটিয়া যাইবে।

বীজ নষ্ট হইবার নহে। যখনই সুযোগ পাইবে তখনই অঙ্কুরিত ও ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। দেহের বিনাশে বীজের বিনাশ হইবে না, যাঁহাদের নিতান্ত কপাল মন্দ তাঁহারাই এই সাধনে অবহেলা করিতেছেন।

গোস্বামী মহাশয়ের ব্রাহ্মশিষ্যগণ প্রায়ই আচার-অনুষ্ঠানে হিন্দু হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অসবর্ণ বা বিধবাবিবাহ করায় হিন্দু-সমাজে স্থান পান নাই, তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া ব্রাহ্মসমাজেই থাকিতে হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ সনাতন হিন্দুধর্ম্মসাধনের প্রতিকূল, এই সমাজে উচিত জ্ঞান নাই, সদাচার নাই, সাধারণতঃ স্বেচ্ছাচারই প্রচলিত। স্বেচ্ছাচারী হইলে গুরুশক্তি ম্লান হইয়া যায়, তমোগুণ বৃদ্ধি পায়, সাধন-ভজনে প্রবৃত্তি থাকে না, একারণ যাঁহারা একাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিতে পারেন নাই তাঁহারা এই সাধন ত্যাগ করিয়া বসিয়াছেন। যদি কখনও সৎসঙ্গলাভ হয়, তবেই রক্ষা নতুবা এ জন্মটায় আর কোন আশা ভরসা নাই।

কাহারো কাহারো মধ্যে প্রথমতঃ গুরুশক্তি অতিপ্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তখন তাঁহাদের ভক্তি ও বৈরাগ্য দেখে কে? তাঁহারা দিবারাত্রি ভাবাবেশে থাকিতেন, নামসাধনে, দেবদর্শনে, ভগবানের লীলাগুণ-শ্রবণে তাঁহারা প্রায়ই সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন; সাত্ত্বিক বিকার সকল দেহে প্রকাশ পাইত। তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া আমি বিমোহিত হইতাম, নিজের অন্তরের দুরবস্থা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতাম, আপনাকে শত শত ধিক্কার দিতাম।

কুসঙ্গে সিদ্ধপুরুষদেরও পতন হইয়া থাকে। যতদিন মায়া আছে, ততদিন কাহারও অবস্থা নিরাপদ নহে। মানুষ হঠাৎ ধনী হইতে পারে, কিন্তু ধন রক্ষা করাই সুকঠিন। বহুযত্ন না করিলে ধনরক্ষা হয় না। গোস্বামী মহাশয়ের এই শ্রেণীর শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ কুসঙ্গে পড়িয়া সংসারের প্রলোভনে মজিয়া সাধনভজন একবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন—তাঁহাদের গুরুশক্তি ম্লান হইয়া গিয়াছে, প্রাণ শুষ্ক হইয়াছে। এখন তাঁহাদের এমনি দুরবস্থা যে, এখন আর তাঁহারা আদৌ নাম করিতে

পারেন না। অপরাধের শাস্তি অপরাধ; তাঁহারা ক্রমাগত অপরাধ করিতেছেন, আর তাঁহাদের মধ্যে আসুরিক বৃত্তি সকল ক্রমশঃ জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। যে স্থানে সাধুসঙ্গ হয়, যে স্থানে দেবার্চ্চনা হয়, যে স্থানে শাস্ত্রপাঠ বা ভগবানের লীলাগুণ-কীর্ত্তন হয়, সে স্থানে ক্ষণকালের জন্যও তাঁহারা তিষ্ঠিতে পারেন না। তাঁহারা ক্রমাগত অপরাধ করিয়া আত্মঘাতী হইতেছেন। ইঁহাদের দুরবস্থা দেখিয়া বাস্তবিক প্রাণে বড় কষ্ট হয়।

আবার গোস্বামী মহাশয়ের এমনও শিষ্য আছেন, যিনি প্রাণপণে সাধন-ভজন করিয়া অতি অল্প দিন মধ্যে মহাপ্রভাবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন; প্রবল গুরুশক্তির প্রভাবে আত্মহারা হইয়াছিলেন। নিজের মধ্যে অলৌকিক শক্তির খেলা দেখিয়া আপনাকে অবতার কল্পনা করিয়াছেন।

মহামায়া বড়ই চতুরা। ইনি কোন্ অলক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া কাহার মধ্যে কখন্ প্রবেশ করিয়া আপন প্রভাব বিস্তার করিবেন কে বলিতে পারে?

ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক সৎ লোকের সাধুকার্য্যের মধ্যেও ইঁহার লীলা। মহাতপস্বী ভরত দুস্থ হরিণশিশুকে রক্ষা করিয়া সাধনভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাকে হরিণজন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। একারণ সাধনপন্থায় বড় সাবধানে চলিতে হয়।

দয়া সাধনপন্থায় বড় অত্যাবশ্যক জিনিষ। যাহার দয়া নাই, সে ব্যক্তি সাধনপন্থায় কখনও অগ্রসর হইতে পারে না। সাধনপন্থায় দয়াবৃত্তি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। কিন্তু একটু অসাবধান হইলেই এই দয়াই আবার মায়ায় পরিণত হইয়া অতি উচ্চসাধককেও সাধনভ্রষ্ট করিয়া তুলে। আমি এরূপ অনেক ঘটনা দেখিয়াছি। নিজের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি না রাখিয়া চলিলে পতনের বড়ই সম্ভাবনা।

একারণ আমি সকলকে বলিতেছি, আপনারা নিজেকে আদৌ বিশ্বাস করিবেন না। নিজের কার্য্যকলাপের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিবেন, ত্রুটী দেখিলেই প্রতিকারের চেষ্টা করিবেন। কদাচ অন্যমনস্ক হইবেন না। মায়ার প্রভাব যে প্রকার, তাহাতে একটু অন্যমনস্ক হইলে আর রক্ষা নাই।

যাঁহারা নাম পরিত্যাগ করেন নাই, প্রতিদিন অন্ততঃ আধঘণ্টা নাম করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে ক্রমশঃ গুরুশক্তি প্রবল হইতেছে। এই শক্তিই তাঁহাদের মধ্যে নামকে পরিচালিত করিতেছে। ইঁহারা ইচ্ছা-পূর্ব্বক নাম না করিলেও নাম ইঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন না। নাম ইঁহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া ইঁহাদিগকে সাধনপথে পরিচালিত করিতেছেন। শাস্ত্র, সদাচার ও ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব সকল ইঁহাদের মধ্যে প্রকাশিত হইতেছে। দিন দিন প্রবল বৈরাগ্য ইঁহাদের জীবনে উপস্থিত হইতেছে। ইঁহাদের সর্ব্বপ্রকার আসক্তি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ভগবানের নাম, লীলাগুণের মধুরাস্বাদন ইঁহারা ভোগ করিতেছেন, ইঁহাদের মধ্যে অমৃতের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

এই সকল লোকের সাধুর বেশ নাই, সাধুতার ভাণ নাই। ইঁহারা সামান্য গৃহস্থ লোক, আপীস-আদালতে চাকরী করিয়া এবং স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। আমি দেখিতেছি, অনেক পরমহংসের অবস্থা অপেক্ষাও ইঁহাদের অবস্থা অতি উচ্চতর। ইঁহাদের বৈরাগ্য অতুলনীয়।

আহার, বিহার, কাজ, কর্ম্ম, এমন কি নিদ্রাকালেও ইঁহাদের মধ্যে নামের বিশ্রাম হয় না। নাম ইঁহাদিগকে দিন দিন নূতন রাজ্যে লইয়া যাইতেছেন। কম্পাসের কাঁটা যেমন উত্তর-মুখেই থাকে, হাজার বার ফিরাইয়া দিলেও সে আপনা হইতে উত্তরমুখী হইবে, তেমনি বিষয়কর্ম্ম

কিছু কালের জন্য ইঁহাদিগকে সংসারমুখী করিলেও, ক্ষণকালের জন্য ইঁহাদের মন আপনা হইতে ভগবন্মুখী হইবেই হইবে। সংসারের সাধ্য কি যে ইঁহাদিগকে ভুলাইয়া রাখে।

ইঁহাদের নিকট টাকা পয়সাও নগণ্য, খোলামকুচী তুল্য। আর স্ত্রী, পুত্র, টাকা, পয়সা, বিষয়, আশয়, সব আছে সত্য, কিন্তু ইঁহারা কিছুতেই নাই। ইঁহারা জানেন, যদি এ জগতে আপনার বলিতে কিছু থাকে তবে এক গুরুই আপনার, আর গুরুদত্ত নামই আপনার।

গুরুদত্ত নাম গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণকে কিরূপ পরিচালিত করিতেছেন, তাহার দুই চারিটি উদাহরণ না দিলে পাঠক মহাশয় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। এজন্য ২।৪টি দৃষ্টান্ত দিতেছি, ইহা হইতে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের উপর নামের আধিপত্য বুঝিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভক্ত জগদ্বন্ধু মৈত্র

ইনি গোস্বামী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা। গোস্বামী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবীর সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছে। ইনি গোস্বামী মহাশয়ের একখানি জীবনচরিত প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহারই জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম বৃন্দাবনচন্দ্র প্রকাশ্য দাউজী। এই দাউজীর জীবন-চরিত তাঁহার পিতা কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত হওয়ায় আমি আর দাউজী সম্বন্ধে কোন কথা লিখিলাম না।

যখন কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীটে রাখালবাবুর বাড়ীতে গোস্বামী মহাশয় অবস্থিতি করিতেন, তখন তাঁহার পার্শ্বের ঘরে ভক্তিভাজন জগদ্বন্ধুবাবু

সপরিবারে থাকিতেন। তিনি একদিন আসনে বসিয়া নাম করিতেছিলেন। দীর্ঘকাল নাম করিতে থাকায় নামের শক্তি গুরুশক্তিকে জাগাইয়া তুলিল। শক্তিশালী নাম ও গুরুশক্তি পরস্পর পরস্পরের পরিপোষক। শক্তিশালী নাম গুরুশক্তিকে পরিবর্দ্ধিত করে, আবার গুরুশক্তি নামকে প্রবল করিয়া প্রবলবেগে পরিচালিত করিতে থাকে। নাম করিতে করিতে যেমন গুরুশক্তি প্রবল হইয়া উঠিল, অমনি জগদ্বন্ধুবাবুকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। জগদ্বন্ধুবাবুর বাহ্যজ্ঞান লোপ হইল। তিনি আসনে উপবিষ্ট থাকিলেন।

তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র তখন নিতান্ত শিশু, কেবলমাত্র হামাগুড়ি দিতে শিখিয়াছে। দৈবাৎ এই শিশু কড়াইয়ের গরম দুগ্ধে হাত দেওয়ায় তাহার কচি হাতখানি দগ্ধ হইয়া গেল। বালক চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বালকের চীৎকারে জগদ্বন্ধুবাবুর চৈতন্য হইল বটে, কিন্তু তাঁহার শরীর এমনি অবশ হইয়া পড়িয়াছে যে, তিনি আসন হইতে উঠিয়া বালককে রক্ষা করিতে অথবা শান্তিসুধা বা গৃহের অন্য কোন লোককে ডাকিতে পারিলেন না। তিনি কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কথা বাহির হইল না। এই অবস্থায় তিনি বালকের বিপদ স্বচক্ষে দেখিয়াও কোন সাহায্য করিতে পারিলেন না।

বালকের ক্রন্দনে কিছুক্ষণ পরে শান্তিসুধা ছুটিয়া আসিয়া বালককে কোলে করিয়া বালকের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল।

সন্তানের ক্লেশ দেখিয়া মায়ের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। শান্তিসুধা জগদ্বন্ধুবাবুর অবস্থা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি স্বামীকে নানাপ্রকারে অভিযোগ দিতে লাগিলেন। জগদ্বন্ধুবাবু সমস্ত অনুযোগের কথা স্বকর্ণে শুনিতে লাগিলেন এবং একটি কথারও প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে জগদ্বন্ধুবাবু প্রকৃতিস্থ হইলে শান্তিসুধাকে সমস্ত অবস্থাটা ভাঙ্গিয়া বলিলেন। তাহাতে শান্তিসুধা লজ্জিতা হইয়া আর অনুযোগ করিলেন না।

শক্তিশালী নাম স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। ইনি যখন ভক্তকে কৃপা করিয়া নিজের বিক্রম প্রকাশ করেন তখন কাহার সাধ্য যে ইহার গতি রোধ করে? নামসাধন সর্বেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া রহিত করিয়া ফেলে এবং অমৃত-পাথারে ভাসাইতে থাকেন।

নাম মহামাদক, ব্রাণ্ডির নেশা আর কতটুকু; নামের নেশার নিকট ব্রাণ্ডির নেশা অতি সামান্য। এ নেশা যাহার একবার উপস্থিত হইয়াছে, সেই ইহার বিক্রম বুঝিতে পারে। অন্যে বুঝিতে পারিবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

ভক্তিভাজন বাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ৺রাজেন্দ্র দত্তের (রাজাবাবুর) পৌত্র ও সুবিখ্যাত জষ্টীস্ দ্বারকানাথ মিত্রের দৌহিত্র। ইঁহার নিবাস কলিকাতা ভবানীপুর। ইনি গোস্বামী মহাশয়ের জনৈক শিষ্য। সংসারী লোক, চাকরী করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

সাহেববাড়ী যাইতে হইবে বলিয়া তিনি একদিন পাচক ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "ঠাকুর! আমাকে বেলা দশটার মধ্যে সাহেববাড়ি যাইতে হইবে, তুমি শীঘ্র খাবার প্রস্তুত কর, আমি শীঘ্র স্নান করিয়া লই।" অমরেন্দ্রবাবুর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণঠাকুর তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে খাবার

সাজাইতে গেলেন ; অমরেন্দ্রনাথবাবু কলের জলে স্নান করিয়া তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘরে আহ্নিক করিতে বসিলেন।

অমরেন্দ্রবাবু যেমন ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলেন, অমনি তাঁহার সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া গেল, প্রবল গুরুশক্তি ও নাম তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। অমরেন্দ্রবাবু বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন। তিনি যেমন আসনে বসিয়া ছিলেন, ঠিক সেইভাবে বসিয়া থাকিলেন। নামের প্রবাহ আপনা হইতে প্রবলবেগে তাঁহার মধ্যে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

খাবারঘরে আসনের নিকট ভাত দিয়া পাচকঠাকুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, অমরেন্দ্রবাবুর আর দেখা সাক্ষাৎ নাই। ডাকাডাকি, হাঁকা-হাঁকি করিবার আর উপায় নাই, অনেকক্ষণ ভাতের নিকট দাঁড়াইয়া থাকিয়া বামুনঠাকুর যখন দেখিলেন, অমরেন্দ্রবাবুর আর আসিবার সম্ভাবনা নাই ; তখন ভাতের থালা রান্নাঘরে লইয়া গিয়া রাখিয়া দিলেন।

দশটা বাজিয়া গেল, মেয়েরা ঠাকুরঘরে উঁকি মারিয়া দেখিল, অমরেন্দ্রবাবু আসনে উপবিষ্ট ; নামে অভিভূত ; তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন। ক্রমে এগারটা বাজিল, বারটা বাজিল, সকলে তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলেন। কাহারও আহার হইল না। বেলা পাঁচটার সময় অমরেন্দ্রবাবুর হুঁস্ হইল, তিনি তখন আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন। সেই দিন এই পর্য্যন্ত। সাহেববাড়ী আর যাওয়া হইল না।

এরূপ ঘটনা যে ক্বচিৎ কখন ঘটে তাহা নহে, এরূপ ঘটনা প্রায়ই মাঝে মাঝে ঘটিয়া থাকে। অমরেন্দ্রবাবু সামান্য গৃহস্থ লোক, বয়সে যুবক অথচ অবস্থা এইরূপ।

অমরেন্দ্রবাবুর ভাবাবেশের নৃত্য এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। ইনি যখন

করে, অঙ্গ-সঞ্চালন অতি সুললিত হইয়া থাকে। বাহ্যজ্ঞান থাকে না। ইঁহার মনোহর নৃত্য যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়।

পাঠক মহাশয়, আপনারা অনেক নাচ দেখিয়াছেন, বাইজীর নাচ, খেমটাওয়ালীর নাচ, থিয়েটারে নর্ত্তকীর নাচ, যাত্রায় বিভিন্ন প্রকারের নাচও দেখিয়াছেন কিন্তু এমন নাচ কখনও দেখেন নাই। আপনারা যে সকল নাচ দেখিয়াছেন তাহাতে মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, হৃদয়ের গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয়, ধর্ম্মভাব বিদূরিত হয়। এ নাচ তাহার বিপরীত। এ নাচ দেখিলে মনের চাঞ্চল্য নষ্ট হয়, ধর্ম্মভাব জাগ্রত হয়, সংসার-বন্ধন ছিন্ন হয়।

"নাচিতে না জানি তবু, নাচিরে গৌরাঙ্গ বলি,
গাইতে না জানি তবু গাই।
সুখে বা দুখেতে থাকি, হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকি
নিরন্তর এই মতি চাই॥"

এ নাচ সে নাচ নয়। জানাজানির সহিত এ নাচের কোন সম্বন্ধ নাই। এ নাচ কাহারও নিকট শিক্ষা করিতে হয় না। কাহারও শিখাইবার ক্ষমতা নাই। ইহা বুদ্ধি, বিবেচনা, চিন্তার অতীত। অন্যূন সাড়ে চারি বৎসর পূর্ব্বে সুরধুনী-তীরে একবার শচীর দুলাল এই নাচ নাচিয়াছিলেন। তাহার পর গোস্বামী মহাশয় নাচিয়া দেখাইলেন; এখন তাঁহার শিষ্যগণ নাচিতেছেন। এ নৃত্য আর কোথাও দেখিতে পাইবেন না।

এ নাচ মানুষের নাচ নহে, মানুষের অনুকরণীয় নহে, এ নাচে শ্রম নাই, ক্লান্তি নাই। নৃত্যকারীর সহিত ইহার কোন সম্বন্ধও নাই। সদ্গুরু কৃপা করিয়া যে দেবতাকে ভক্তহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, ইহা সেই দেবতার নাচ, মহাভাবের নাচ, মহাভাবস্বরূপিণীর নাচ। মানুষ এ নাচ কোথায় পাইবে?

ধন্য বঙ্গদেশ! যে দেশে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন, যে দেশ ভগবানের পাদপদ্মের রেণুকণায় অভিষিক্ত, যে দেশ ভক্ত-পদরজে চর্চ্চিত।

গোস্বামী মহাশয়ের বহু শিষ্য ও প্রশিষ্যের মধ্যে নামের বহুবিধ লীলা হইতেছে। আমি অনেকের মধ্যে অনেকপ্রকার লীলার কথা জ্ঞাত আছি। অধিক লিখিয়া প্রয়োজন নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভক্ত কৈলাশচন্দ্র বসু ও মনোরমা

শ্রীরূপগোস্বামী, বিদগ্ধমাধব নাটকে লিখিয়াছেন—

> "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে,
> কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
> চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
> নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥"

নান্দীমুখীকে বলিতেছেন,—যিনি তুণ্ডাগ্রে নৃত্য আরম্ভ করিয়া তুণ্ডাবলী-লাভের জন্য রতি বিস্তার করেন, যিনি কর্ণপথে অঙ্কুরিতা হইয়াই অর্ব্বুদ সংখ্যক কর্ণেন্দ্রিয়লাভের ইচ্ছা উৎপাদন করেন, যিনি চিত্তপ্রাঙ্গণের সঙ্গিনী হইয়াই সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপারকে রহিত করেন, হে নান্দীমুখি! এতাদৃশ "কৃষ্ণ" এই অক্ষরদ্বয় কত অমৃত দিয়া যে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা আমি বলিতে পারি না।

শ্রীরূপগোস্বামী এই শ্লোক রচনা করিয়া আপন নাটকে কৃষ্ণনামের মধুরিমা বর্ণন করিয়াছেন। পাঠকমহাশয় নাটকের শ্লোক মনে করিয়া ইহা যে কেবল কবির রচিত অতিরঞ্জিত বর্ণনা, ইহা কদাচ মনে করিবেন

না। ভগবানের নামের মাধুর্য্য যথার্থই এইরূপ; ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ঘোর অপরাধে আমরা কেবল নামের প্রকৃত আস্বাদন টের পাই না। আমাদের দুর্দ্দৈবই আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা নরকের কীট, নরকের পূতিগন্ধই আমাদিগকে ভাল লাগে, আমরা নরক-কুণ্ডেই বিচরণ করিতে ভালবাসি।

নাম মধুর হইতে সুমধুর; ইহার আস্বাদন অনুভব করিলে মানুষের আর ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না। এই পন্থায় পূর্ব্বতন আচার্য্য শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী অযাচক ছিলেন। নামামৃত পান করিয়া বিভোর হইয়া থাকিতেন। ক্ষুধাতৃষ্ণা তাঁহাকে পীড়া দিতে পারিত না।

"অযাচিত বৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস।
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস॥
প্রেমামৃতে তৃপ্ত নাহি ক্ষুধাতৃষ্ণা বাধে।
ক্ষীরে ইচ্ছা হইলে তাহে মানি অপরাধে॥"

চৈ, চ, ম, ৪ পরিচ্ছেদ।

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য ভক্তিভাজন বাবু হেমেন্দ্রনাথ মিত্র আলিপুরের পাবলিক প্রসিকিউটার। তাঁহার বাড়ী ভবানীপুর ৬নং পদ্মপুকুর রোড। ইষ্টদেবের জন্মতিথির পূজা-উপলক্ষে প্রতি বৎসর ঝুলন-পূর্ণিমা তিথিতে তাঁহার বাটীতে উৎসব হইয়া থাকে। ১৯১৯ সালের ভাদ্র মাসে এই উৎসব-উপলক্ষে আমি তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলাম। দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ ভবানীপুরের একটা পুকুরে স্নান করায় আমি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়ি।

গোস্বামী মহাশয়ের জনৈক শিষ্য ভক্তিভাজন বাবু রায় অতুলচন্দ্র সিংহ কলিকাতায় অখিল মিস্ত্রীর লেনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই ব্যারামের সময় আমি কয়েক দিন তাঁহার বাসায় অবস্থিতি করিয়া

ছিলাম। অতুলবাবুর সহধর্ম্মিনী ভক্তিমতী শ্রীমতী রাজরাণী দাসীও গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যা, আমার এই ব্যারামের সময় তিনি মায়ের ন্যায় আমার যথেষ্ট শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

রুগ্নাবস্থায় পূর্ব্বাহ্ন ৭ঘটিকার সময় আমি একখানা তক্তাপোষের উপর শুইয়া আছি, এমন সময় ভক্ত কৈলাশচন্দ্র বসু আমাকে দেখিতে আসিলেন। ইনি গোস্বামী মহাশয়ের জনৈক শিষ্য। ইহার পিতার নাম ৺ঈশ্বরচন্দ্র বসু। নিবাস চাঁদসী, জেলা বরিশাল। ইনি আমার কাছে তক্তপোষের উপর বসিয়া ব্যারামের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সস্নেহে গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন এবং বিবিধ সদালাপে আমার রোগযন্ত্রণার উপশম করিতে লাগিলেন।

কথাবার্ত্তা শেষ হইলে তিনি মনে মনে নাম জপ করিতে লাগিলেন। নামের অমৃতময় আস্বাদন যেমন তাঁহার অনুভূত হইল, অমনি তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল। তিনি বাহ্যজ্ঞানরহিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর ও মনে অমৃতধারা সিঞ্চিত হইতে লাগিল। তিনি স্পন্দনরহিত হইলেন, কেবল তাঁহার মধ্যে প্রবলবেগে নামের প্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নাম স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। নাম কাহারও বশীভূত নহে। নামকে আয়ত্ত করিতে পারে এজগতে এমন কেহ নাই। নাম কৃপাপূর্ব্বক ভক্তহৃদয়ে নৃত্য করিতে করিতে প্রবাহিত হন মাত্র। নাম কৃপা করিয়া ভক্তহৃদয়ে যখন প্রবাহিত হইতে থাকেন,, তখন তাঁহার গতি রোধ করা যেমন কঠিন, নামের ইচ্ছা না হইলে তাঁহাকে আনয়ন করাও তেমনি কঠিন। নামের কৃপা না হইলে কাহার সাধ্য নাম করে? নাম জীবন্ত ও মহাশক্তিশালী।

পাছে ভক্ত কৈলাশচন্দ্র তক্তপোষ হইতে পড়িয়া গিয়া আঘাত প্রাপ্ত

হন, এই জন্য আমার একটা ভাবনা হইল। তাঁহাকে তক্তপোষের প্রান্ত হইতে স্থানান্তরিত করিয়া নিরাপদ স্থানে বসাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু বহু যত্নেও তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিতে পারিলাম না। তখন ভাবিলাম, যে দেবতা তাঁহার মধ্যে আনন্দোৎসব করিতেছেন, তিনিই তাঁহার শরীর রক্ষা করিবেন।

বেলা একটা বাজিয়া গেল, তাঁহার স্ত্রী ও পরিবারবর্গ তাঁহার অপেক্ষায় অনশনে থাকিলেন। যখন বেলা ৪টা বাজিয়া গেল তখনও তাঁহার হুঁস হইল না। এমন সময় ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু ও তাঁহার সঙ্গে আরও ২।১টি সতীর্থ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেলা অবসান হইতে দেখিয়া কৈলাশবাবুর স্ত্রী কৈলাশবাবুকে সচেতন করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিলেন। সুরেন্দ্রবাবু কৈলাশবাবুর কর্ণে অনেক ক্ষণ ধরিয়া নাম দিতে লাগিলেন, তাহাতেও কৈলাশবাবুর চৈতন্য হইল না।

সুরেন্দ্রবাবু মধুরকণ্ঠে একতারা লইয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন; ভগবানের লীলা গুণ কৈলাশবাবুকে শ্রবণ করাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও কিছু হইল না। সকলে হতাশ হইলেন। কৈলাশবাবুর সমাধি আর কিছুতেই ভঙ্গ হইল না। অনেকে অনেক রকম চেষ্টা করার পর সন্ধ্যার সময় সমাধি ভঙ্গ হইল।

যদিচ কৈলাশবাবুর সমাধি ভঙ্গ হইল কিন্তু নামের ঘোরটা ঘুচিল না। হাত পায়েও বল পাইলেন না। কাহারও সহিত কথা কহিতে সমর্থ হইলেন না। সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে নিকটস্থ তাঁহার নিজের বাসাবাটিতে লইয়া গেলেন। । কৈলাশবাবুর এইরূপ সমাধির অবস্থা প্রায়ই হইয়া থাকে।

পুণ্য ভূমি ভারতবর্ষে বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। পাঠক মহাশয়গণ, ভগবানের নামে সমাধি আর কি কোথায়ও দেখিতে পান?

কোথায়ও কি শুনিয়াছেন যে, সাধক ভগবানের নামে সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছেন? ভগবানের নামে সমাধি আমরা একমাত্র কলিপাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুতে দেখিতে পাই। তৎপরে গোস্বামী মহাশয়ের মধ্যে দেখিলাম। শেষের কয়েক বৎসরকাল গোস্বামী মহাশয় ভগবানের নামে পুনঃ পুনঃ সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। কেবল শিষ্যগণের মনস্তুষ্টির জন্য তিনি একএকবার মাত্র ক্ষণকালের জন্য সমাধি ভঙ্গ করিতেন।

এই যে ভগবানের নামে সমাধি, এখন কেবল আমার গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি। এ দৃশ্য আর কোথাও দেখিতে পাইতেছি না। কৈলাশবাবু সামান্য গৃহস্থ লোক, চাকরী করিয়া স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। বেলা ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত আপিসের কাজে তাঁকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়। এই সমস্ত নির্ব্বাহ করিয়াও তাঁহার এই অবস্থা!

আপনারা ভক্তিমতী মনোরমার কথাও শুনিয়াছেন। তিনি স্বনামখ্যাত ভক্তিভাজন বাবু মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার সহধর্ম্মিনী। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে আকাশবৃত্তি দিয়াছিলেন। ঘোর দরিদ্রতার নিষ্পেষণে তাঁহাকে নিষ্পেষিত হইতে হইয়াছিল। তিনি নিজে সমস্ত গৃহকার্য্য করিতেন, স্বামী ও অতিথি অভ্যাগতের তিনিই সেবা করিতেন। রন্ধন-কার্য্য নিজহস্তে সম্পন্ন করিতেন। কতকগুলি সন্তান পালন করিতেন, ইহার উপর তিনি কোন কোন সময়ে ছত্রিশ ঘণ্টা কাল সমাধিস্থ থাকিতেন।

সংসারের কায না করিলে চলে না, একারণ প্রতিদিন তিনি সমাধিস্থ হইয়া থাকিতে পারিতেন না। মধ্যে মধ্যে আসন করিয়া বসিতেন ও ভগবানের নামে সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। কোন কোন সময়ে ছত্রিশ ঘণ্টার

মধ্যে কোনক্রমে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইত না। কচি ছেলে স্তন্যপান করিবার জন্য কাঁদিলে মনোরঞ্জনবাবু ছেলেকে মায়ের বুকের গোড়ায় ধরিয়া স্তন্যপান করাইয়া আনিতেন। মনোরমার জীবনচরিত বাহির হইয়াছে। একারণ আমি এই ভক্তিমতী অসামান্যার কথা লিখিলাম না। পাঠক মহাশয় মনোরমার জীবনচরিত পাঠ করিবেন। ভক্তের জীবন-চরিতপাঠে বহু উপকার লাভ হইয়া থাকে।

ভগবানের নামে যে কেবল সামাধি হয় তাহা নহে, সাধকের সমস্ত যোগাঙ্গ প্রকাশ হইতে থাকে। একটীও বাদ যায় না। নাম করিতে করিতে যদি যোগাঙ্গ সকল প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, নাম করা হইতেছে না। অথবা নামে শক্তি নাই, অর্থাৎ নামী বর্ত্তমান নাই। নাম করা হইবে অথচ যোগতত্ত্ব প্রকাশিত হইবে না ইহা অসম্ভব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লীলা-দর্শন

আমি পুর্ব্বেই বলিয়াছি লীলাদর্শনের জন্য রাগানুরাগ ভক্তি বা কল্পনার আশ্রয় লইবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা শুদ্ধাভক্তি সাধন করিয়া থাকেন, তাঁহারা কোনরূপ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের মধ্যে বহুবিধ লীলা আপনা হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে, ইহা সাধনপন্থার একটা নিয়ম। গোস্বামী মহাশয়ের বহু শিষ্য সাধনপন্থায় ভগবানের বিবিধ লীলা দর্শন করিয়া থাকেন। ২।১টা দৃষ্টান্ত না দিলে পাঠক মহাশয়ের কৌতূহল নিবারণ হইবে না। একারণ আমি নিজের দৃষ্ট দুইটি মাত্র বৃত্তান্ত পাঠক মহাশয়কে উপহার দিলাম।

একবার আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা জগৎপ্রিয় নন্দী বহু দূর দেশ হইতে একটি মৃণ্ময় রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি খরিদ করিয়া আনেন। রাধাকৃষ্ণ একটি পদ্মের উপর জড়াজড়ি করিয়া ত্রিভঙ্গিম ঠামে দাঁড়াইয়া আছেন। উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রেমদৃষ্টি। একটি বাঁশী উভয়েই ধরিয়া আছেন। মূর্ত্তিটি বড়ই মনোরম। এই মূর্ত্তিটি দেখিয়া জগৎপ্রিয়কে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম —এ মূর্ত্তিটী কেন আনিয়াছ?

জগৎ—মূর্ত্তিটী বড় সুন্দর, দেখিতে অতি মনোহর, আমার বড় ভাল লাগিল, তাই খরিদ করিয়া আনিয়াছি।

আমি—তুমি এই মূর্ত্তি লইয়া কি করিবে?

জগৎ—আমি আর এ মূর্ত্তি লইয়া কি করিব? ছেলেরা ইহা লইয়া খেলা করিবে।

আমি—তুমি বড়ই কুকাজ করিয়াছ, ভগবানের মূর্ত্তি খেলাধূলার জিনিস বা ঘর সাজাইবার জিনিস নয়। ভগবানের মূর্ত্তি ঘরে রাখিলে তাঁহার উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে হয়। যদি প্রত্যহ পূজা করিতে পার, তবে এ মূর্ত্তি ঘরে রাখ নতুবা জলে বিসর্জ্জন করিয়া আইস।

জগৎপ্রিয় মনে করিয়াছিল, আমি এই মূর্ত্তিটি দেখিয়া আনন্দিত হইব, কিন্তু আমার কথা শুনিয়া সে নিতান্ত বিমনা হইল। মূর্ত্তিটি জলে বিসর্জ্জন দিতেও পারে না এবং প্রত্যহ পূজা করিবারও ক্ষমতা নাই। তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বলিলাম—"যাও ঠাকুরঘরে সিংহাসনের উপর এই মূর্ত্তিটি রাখিয়া আইস, আমি প্রত্যহ ইঁহার পূজা করিব।" জগৎপ্রিয় আনন্দিত হইয়া তাহাই করিল। আমি প্রতিদিন পূজা করিতে লগিলাম।

আমি তখন এই ঠাকুরঘরের একপার্শ্বে শয়ন করিতাম। এক দিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় দেখিলাম, রাধাকৃষ্ণ চুপে চুপে পরস্পর কি বলাবলি করিলেন এবং তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ জড়াজড়িটা ছাড়াইয়া সিংহাসন

হইতে নামিয়া আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি এই দৃশ্যটা স্থিরদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। আমি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম—"মজা মন্দ নয়, মাটির ঠাকুর কথা কয়, আবার চলাফেরাও করে।" এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ মুখব্যাদন করিয়া আমাকে বলিলেন, "আমার ক্ষুধা হইয়াছে, আমাকে কিছু খাইতে দাও।" আমি শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া ভাবিলাম "এত রাত্রে কি খাইতে দিব? ব্যাপার ত মন্দ নয়!" এমন সময় শ্রীমতী সিংহাসন হইতে নামিয়া দ্রুতপদে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বাম হস্তটা ঘন ঘন নাড়িয়া আমাকে বলিলেন, "উনি এ সময় কিছু খান না, কেবল তোমার মন বুঝিবার জন্য তোমাকে খাবার কথা বলিলেন।"।

এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন এবং সিংহাসনে আরোহণ করিয়া উভয়ে পূর্ব্ববৎ জড়াজড়ি করিয়া ত্রিভঙ্গিম-ঠামে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি এই ব্যাপার দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম।

মূর্ত্তিটী মৃণ্ময়, চরণে চন্দন তুলসি দিয়া পূজা করিতে করিতে দিন কয়েক পরে দেখিলাম, চরণে ক্ষত হইয়াছে। শুনিয়াছি ক্ষত মূর্ত্তির পূজা করিতে নাই, একারণ ঐ মূর্ত্তিটি জলে বিসর্জ্জন দিলাম।

পাঠকমহাশয়কে আর একটী লীলাদর্শনের কথা বলি। পুত্রের জন্মতিথি-উপলক্ষে আমি বিবিধ খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের আসন করিয়া ভোগ দিলাম। গুরুপূজা শেষ করিয়া যেমনি ভোগসামগ্রী নিবেদন করিয়া দিলাম, অমনি দেখি শ্রীকৃষ্ণ মলিনবদনে যেন গোঁসা করিয়া করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি রসিক চূড়ামণিকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম "এতক্ষণ ছিলে কোথায়? একটু

আগে আসিতে পার নাই ? একটু আগে আসিলে তুমিও পাইতে। আমি সমস্ত নিবেদন করিয়া দিয়াছি। যদি খাবার জিনিষ দেখিয়া এতই লোভ হইয়াছে, তবে লজ্জা কিসের ? তুমি চিরকালই নির্লজ্জ। গোপ-বালিকাদের ক্ষীর সর নবনী কাড়িয়া খাইতে; আবার গোস্বামী মহাশয় যখন আহার করিতে বসিতেন, তখন শুক্তার ঝোলের বাটি ধরিয়া টানা-টানি করিতে; যখন তিনি ডাবের জল খাইতে যাইতেন, তখন ছুটিয়া আসিয়া হাত হইতে ডাবটা কাড়িয়া লইয়া এক চুমুকেই তাহা শেষ করিতে, তোমার বিষয়ে ত আমার জানা আছে; আমি গোস্বামী মহাশয়কে নিবেদন করিয়া দিয়াছি; যাও বসিয়া যাও, কাড়াকাড়ি করিয়া খাওগে, আমাকে দেখিয়া আর লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই।"

আমি এই কথা বলিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কপাট ঠেসাইয়া দিয়া বাহিরে বসিয়া নাম করিতে লগিলাম।

এই সময় হইতে আমি যখনই গোস্বামী মহাশয়ের ভোগ দিই, শ্রীকৃষ্ণেরও একখানি আসন করিয়া আলাহিদা ভোগ দিই।

এরূপ নানাবিধ দেব দর্শন হইয়া থাকে। বিশ্বাসী পাঠকমহাশয়গণ এই সব দর্শনের কথা পাঠ করিয়া আমাকে এক জন সাধু মনে করিবেন না। সাধনপন্থায় এ সব ঘটিয়াই থাকে। এসব মায়িক দর্শন। এ দর্শনের মূল্য অতি সামান্য। যত দিন মায়া আছে, তত দিন ধর্ম্ম বহু দূরে জানিবেন। আমি এখনও যে নাস্তিক হইতে পারি না, একথা বলিতে পারি না। যতক্ষণ মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ না হইয়াছে, যতক্ষণ নিরাপদ ভূমিতে দাঁড়াইতে না পারিয়াছি, ততক্ষণ নিজের উপর কিছু মাত্র বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। যতদিন গুরুকৃপায় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের দর্শন লাভ না হইয়াছে, তত দিন কিছুতেই মায়া যাইবে না, নিরাপদ ভূমিতে পৌঁছিতে পারিব না। এখন গুরু কৃপাই একমাত্র

ভরসা। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন গুরু-আজ্ঞা পালন করিয়া যাইতে পারি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দেবতার মর্য্যাদা

বাবু কুঞ্জবিহারী ঘোষ ঢাকা কলেজের্ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। এখন পেন্সন লইয়া গেণ্ডারিয়া মোকামে বসবাস করিতেছেন। ইনি শাক্ত-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং শাক্তকূলে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইনি যৌবনে থিয়সফিষ্ট ছিলেন (Theosophtst) ছিলেন। পরে সপরিবারে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করেন। ইঁহার শ্বাশুড়ি ইঁহার নিকট থাকিতেন, ইনিও গোস্বামী মহাশয়ের জনৈক শিষ্যা।

ভক্ত যখন যেখানে বসিয়া ভগবানের নাম করেন, তখন সেখানে সমস্ত দেবতা উপস্থিত হইয়া থাকেন। কোন কোন দেবতা কৃপা করিয়া ভক্তকে দর্শনও দিয়া থাকেন। গোস্বামীমহাশয়ের বহু শিষ্য এইরূপ দেবদর্শন করিয়া থাকেন। গোস্বামী মহাশয় বলিয়া দিয়াছিলেন, দেবদর্শন সাধনপন্থার একটি নিয়ম। দেবতাদর্শন হইলে, এমন মনে করিতে হইবে না যে উচ্চ-অবস্থা লাভ হইয়াছে। এই দর্শনের প্রতি মনোনিবেশ করিলে বা মনোমধ্যে অহঙ্কার উপস্থিত হইলে, সাধনের হানি হইয়া থাকে। যাহাতে সাধক সাধনভ্রষ্ট হইয়া না পড়েন এজন্য দেবদর্শনের প্রতি মনোনিবেশ না করিয়া সাধনে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া থাকাই উচিত।

কুঞ্জবাবুর শ্বাশুড়ী যখন নিবিষ্টচিত্তে নাম করিতে বসিতেন, তখন তাঁহার কুলদেবতা ভদ্রকালী প্রকাশিতা হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেন। এই দেবতার প্রকাশকে সাধনের বিঘ্নকারী মনে করিয়া কুঞ্জ

বাবুর শাশুড়ী ভদ্রকালীকে সরিয়া যাইতে বলিতেন। কালী কিন্তু সরিয়া যাইতেন না। উপর্য্যুপরি এইরূপ হইতে থাকায় অবোধ স্ত্রীলোক কালীর প্রতি বিরক্ত হইলেন।

কুঞ্জবাবুর শ্বাশুড়ী পূর্ব্বে শাক্ত পরিবারে কন্যা ছিলেন, কুলগুরুর নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিতও হইয়াছিলেন। তাহাতে জীবনে কোন উপকার পান নাই। ধর্ম্ম যে একটা সম্ভোগের জিনিষ, ইহা তাঁহার উপলব্ধি হয় নাই। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া ধর্ম্ম যে একটা ধরিবার ছুঁইবার জিনিষ, উহা যে সম্ভোগের বস্তু, ইহা তাঁহার উপলব্ধি হইয়াছে। কুলধর্ম্মে আর তাঁহার শ্রদ্ধা নাই। সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করিয়া তিনি বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছেন। ভদ্রকালীর উপর আর তাঁহার আস্থা নাই।

একদিন কুঞ্জবাবুর শ্বাশুড়ী আসনে উপবিষ্ট হইয়া নাম করিতেছেন, এমন সময় ভদ্রকালী সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন। তাঁহার প্রকাশ নামের বিঘ্নকারী মনে করিয়া তিনি দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ কালীকে একগাছা ঝাঁটা ছুড়িয়া মারিলেন, কালী অন্তর্হিতা হইলেন।

এইদিন হইতে কুঞ্জবাবুর বাটিতে প্রতিদিন রক্তবৃষ্টি আরম্ভ হইল। পাড়ার লোক সকলে রক্তবৃষ্টি দেখিতে লাগিল, কোথাও রক্তবৃষ্টি নাই, কেবল কুঞ্জবাবুর বাটিতে রক্তবৃষ্টি। সকলে রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিল যাথার্থই তাহা রক্ত। জীবদেহের রক্তের সহিত কোন পার্থক্য নাই। বাটির পরিবারবর্গ প্রত্যহ বাড়িঘর পরিষ্কার করিতে লাগিল, ক্রমে বিরক্ত ও হয়রাম হইয়া পড়িল।

কুঞ্জবাবু এই ঘটনা গোস্বামী মহাশয়ের গোচর করিলেন। তিনি কুঞ্জবাবুকে বলিলেন—

—ভদ্রকালীর নিকট তোমাদের ঘোর অপরাধ হইয়াছে।

কুঞ্জবাবু—ভদ্রকালীর নিকট আমাদের কি অপরাধ হইয়াছে?

গোসাঁই—তোমার শাশুড়ী তাঁহাকে ঝাঁটা ছুড়িয়া মারিয়াছেন। দেবতার কি অমর্য্যাদা করিতে আছে? দেবতা প্রকাশিত হইলে তাঁহার উপযুক্ত মর্য্যাদা করিতে হয়, তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে হয়।

এই কথোপকথনের সময় কুঞ্জবাবুর শাশুড়ী তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি গোস্বামী মহাশয়ের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন—

—আমি নাম করি, কালী আমার নিকট কি জন্য আসেন?

গোসাঁই—তুমি তাঁহাকে ডাকিবে আর তিনি আসিবেন না?

কুঞ্জবাবুর শাশুড়ী—আমি ত তাঁহাকে ডাকি না, তিনি আপনা হইতেই আসেন।

গোসাঁই—না, তুমি ডাক, সেই জন্যই তিনি আসেন। তুমি যে নাম কর তাহাতেই তাঁহাকে ডাকা হয়।

কুঞ্জবাবুর শাশুড়ী—আমার ইষ্টমন্ত্রের সহিত কালীর কোন সম্বন্ধ নাই।

গোসাঁই—তোমাকে ভগবানের নাম দেওয়া হইয়াছে, কালী কি ভগবান ছাড়া।

কুঞ্জবাবুর শাশুড়ী—আমি ত শ্রীকৃষ্ণকেই ভগবান বলিয়া জানি।

গোসাঁই—তুমিই পৃথক মনে কর। ভগবান একই, কালী, কৃষ্ণ, পৃথক নহেন। এক ভগবানেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। কৃষ্ণ যেমন ভগবান, কালীও তেমনি ভগবতী।

কুঞ্জবাবু এই সকল কথপোকথন শ্রবণ করিয়া গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—

—এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমরা কি করিব?

গোসাঁই—সত্বর কালীপূজা কর। তাঁহাকে প্রসন্ন কর, তিনি প্রসন্ন না হইলে অনিষ্ট হইবে।

কুঞ্জবাবু—আমরা সদ্‌গুরুর কৃপাপাত্র। সদ্‌গুরু আমাদের সহায় আছেন, কালীপূজা না করিলে তিনি আমাদের কি অনিষ্ট করিতে পারেন?

গোসাঁই—কালী আমাদের অনিষ্ট করিতে সক্ষম না হইলেও তিনি যদি তোমার ছেলের মাথাটি ভাঙ্গিয়া দেন, তখন তোমরা কি করিবে?

এই কথা শুনিয়া কুঞ্জবাবুর স্ত্রী ও শাশুড়ী মহা-ভীতা হইলেন। তাঁহারা আপনাদিগকে ভদ্রকালীর নিকট মহা অপরাধিনী জ্ঞান করিয়া অনুতাপিতা হইলেন। গলবস্ত্র হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ও বিবিধ স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন।

অবিলম্বে কালীপূজার মহা আয়োজন আরম্ভ হইল। সুন্দর প্রতিমা প্রস্তুত হইয়া আসিল। গ্রামের পুরোহিত ও আত্মীয় স্বজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহা-ধূমধামের সহিত ষোড়শোপচারে ভদ্রকালীর পূজা নির্ব্বাহ হইল। কুঞ্জবাবু সপরিবারে গললগ্নীকৃতবাসে ভক্তিভরে জবা বিল্বদলে মায়ের পূজা করিলেন, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। ভগবতী প্রসন্না হইলেন। তাঁহাদের অপরাধ ক্ষমা করিলেন। সেই দিন হইতে রক্তবৃষ্টি একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

যাঁহারা ভক্তি-পথে চলেন, সকলের পদানত হইয়া, সকলের কৃপা-ভিখারী হইয়া তাঁহাদের ভজন করা কর্ত্তব্য। দেবতাদের কথা কি বলিব? মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলের উপযুক্ত মর্য্যাদা দেওয়া উচিত। সকলের পদানত হইয়া চলা কর্ত্তব্য। মনের মধ্যে একটু অহঙ্কার উপস্থিত হইলে বা অমর্য্যাদার একটু কাজ করিলে ভক্তিদেবী আর সেখানে থাকেন না। হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়। যতই আদর দিবেন, যতই মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবেন, ততই প্রাণ বিগলিত হইবে, ততই চিত্ত প্রসন্ন হইবে ও ততই ভজন সরস হইবে। নামের প্রবাহ প্রবাহিত

হইতে থাকিবে। সাধনপন্থায় কেহ যেন কাহারও মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মের লক্ষণ

ভজনসাধন করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছি কি না এইটী সকলের পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। সাধনভজন করিতেছি অথচ জীবন এক-ভাবেই রহিয়া গিয়াছে, কোন পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইতেছে না, যদি এরূপ হয় তবে বুঝিতে হইবে সাধনভজনে ফল হইতেছে না।

সাধনভজন করিলেই যে সঙ্গে সঙ্গে ফললাভ হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। কাহারও জীবনে অল্পদিনের মধ্যে ফললাভ হয়, আবার কাহারও জীবনে বিলম্বে ফললাভ হয়। ধর্ম্মসাধন করিয়া কত-টুকু অগ্রসর হওয়া গেল কোন কোন সাধক তাহা টেরও পায় না।

যাহা হউক অন্তত পাঁচবৎসর কাল ভজনসাধন করিয়া জীবনে যদি পরিবর্ত্তন উপলব্ধি না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সাধনে কোন ফল নাই, নিশ্চয় কোথাও না কোথাও ত্রুটি আছে। সাধন ভজন করিব অথচ জীবন পরিবর্ত্তিত হইবে না ইহা অসম্ভব।

যদি ৫।৭ বৎসর যথা নিয়মে সাধনভজন করিয়া কোন পরিবর্ত্তন উপস্থিত না হয় এবং নিজের কোন ত্রুটি দেখিতে পাওয়া না যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে পন্থার দোষ। যে পন্থায় চলা হইতেছে সে পন্থায় গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে পারা যাইবে না। তখন সে পন্থা পরিত্যাগ করিয়া উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

এক পন্থা হইতে পন্থান্তর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে নিজের গুরুর অবস্থাটা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যদি বুঝিতে পারা যায়, যে গুরু নিজেই ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে পারেন নাই এবং যে পন্থায় সাধনভজন করা যাইতেছে তাহা ভারতের চিরপ্রতিষ্ঠিত অথবা কোন মহাপুরুষের প্রবর্ত্তিত পন্থা, তাহা হইলে সেই পন্থার কোন উপযুক্ত লোককে গুরুপদে বরণ করা কর্ত্তব্য। যদি সে পন্থায় কোন উপযুক্ত গুরু পাওয়া না যায়, তাহা হইলে পন্থান্তর গ্রহণ করা উচিত।

ভারতবর্ষে অনেকগুলি ধর্ম্মসম্প্রদায় চিরপ্রতিষ্ঠিত আছে; যেমন শাক্ত শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি। আবার সময়ে সময়ে এক এক জন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া এক একটি পন্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন; যেমন গুরু নানক, মহাপ্রভু, কবীর ইত্যাদি।

যে পন্থা কোন মহাপুরুষ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নহে (যেমন ব্রাহ্মসমাজ, থিয়সফিক্যাল সোসাইটি, বাউল দরবেশ, কর্ত্তাভজাদিগের পন্থা ইত্যাদি) সে পন্থা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

এই সকল পন্থায় মানুষ সহস্র বৎসর ধর্ম্মসাধন করিয়াও ধর্ম্মলাভ করিতে পারিবে না।

এখন ধর্ম্মের লক্ষণ কি, সকলের জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

জীবনের পরিবর্ত্তন বুঝিতে হইলে ধর্ম্মের লক্ষণগুলি জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। লক্ষণগুলি না জানিলে জীবনের পরিবর্ত্তন বুঝিয়া উঠা কঠিন হইবে

নীতি শাস্ত্র বলেন—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥"

ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্য্য, ক্ষমা, দম অর্থাৎ কুকর্ম্ম হইতে মনোনিবৃত্তি, অস্তেয়

অর্থাৎ অচৌর্য্য, শৌচ অর্থাৎ সদাচার ও সদাহার, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী অর্থাৎ বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য, ও অক্রোধ এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ।

ধর্ম্মজগতে নীতিশাস্ত্রের সকল কথা খাটে না। আমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি না। এইটি ধর্ম্ম, এইটি অধর্ম্ম, আমরা বিবেচনা মত ঠিক করিয়া রাখিয়াছি এবং তাহাই অকাট্য সত্য মনে করিয়া সংস্কারে ঘুরিয়া মরিতেছি।

আমরা যে চক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করি, ভগবান সে চক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করেন না। আমরা যে মাপকাটিতে ধর্ম্মাধর্ম্মের পরিমাপ করি, ভগবান সে মাপকাটিতে ধর্ম্মাধর্ম্মের পরিমাপ করেন না।

যাহা একের পক্ষে ধর্ম্ম, তাহা অন্যের পক্ষে অধর্ম্ম। যে দুষ্কার্য্য আমরা মহাপাপ বলিয়া মনে করি, সেই দুষ্কার্য্যই সময় সময় মানুষের ধর্ম্ম-জীবন প্রস্তুত করিয়া দেয়। আবার কেহ প্রাণপণে ধর্ম্মসাধন করিয়া ক্রমশঃ নরকের দিকেই অগ্রসর হইতে থাকেন। ধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝিয়া উঠা বড় কঠিন। যাঁহারা সাধনভজন লইয়া থাকেন সর্ব্বদাই তাঁহাদের নিজের প্রতি একটা দৃষ্টি রাখিয়া চলা কর্ত্তব্য।

এখন দেখিতেছি জীবনের প্রতি মানুষের দৃষ্টি নাই। লোকে আচার আচরণ ও অনুষ্ঠানকেই ধর্ম্ম বলিয়া ঠিক করিয়া লইয়াছে।

সদাচার পালন করা, সদাহার করা, একাদশী, চাতুর্ম্মাস্য, ব্রত-নিয়মাদি পালন করা, পূজা অর্চ্চনা প্রণাম বন্দনা স্তবপাঠ পরিক্রমা তীর্থপর্য্যটন হরিনাম ইত্যাদি ভক্তির অঙ্গগুলি যাজন করাই লোকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে।

এইগুলি যে করণীয় নহে একথা আমি বলিতেছি না, ইহা করাই কর্ত্তব্য। ইহা না করিলে ধর্ম্ম হয় না সত্য, কিন্তু করিলেই যে ধর্ম্ম হয় তাহা কদাচ মনে করিবেন না। অনেকে এই সকল ভক্তি-অঙ্গ যাজন

করিয়া ক্রমশঃ নরকের দিকেই অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহারা যতই ভক্তি-অঙ্গগুলি যাজন করিতেছেন, ততই তাঁহাদের মধ্যে অহঙ্কার, ধর্ম্মাভিমান, দোষ-দর্শন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, ধর্ম্মজীবন আদৌ গঠিত হইতেছে না। ধর্ম্মরাজ্যে এইগুলির ন্যায় মহাশত্রু আর নাই। ইহাতে সমস্ত ধর্ম্ম একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

ধর্ম্ম কোন জিনিস নয়, যাহা উপার্জ্জন করিয়া মজুত করিতে হইবে। ধর্ম্ম প্রাণের অবস্থা। ভজনসাধন করিতে করিতে যদি প্রাণের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে না থাকে তাহা হইলে তুষাবঘাতীর ন্যায় সাধনভজন বৃথা হইতেছে মনে করিতে হইবে।

মায়াবাদিগণের ব্রহ্মাহং ভাবনা, পণ্ডিতগণের শাস্ত্রবিচার ও নিত্য নৈমিত্তিকাদি ক্রিয়াকলাপ, যোগিগণের যোগাভ্যাস, তাপসগণের তপস্যা, এবং যতিগণের জ্ঞানাভ্যাস ইত্যাদি ধর্ম্মরাজ্যের কিছুই নহে, ইহা নামে ধর্ম্ম কাযে কিছুই নয় বলিলেই হয়। পণ্ডশ্রম মাত্র।

সাধনপন্থায় সাধন করিতে করিতে কোন কোন লোকের মধ্যে স্বেদ কম্প, অশ্রু, পুলক, বৈবর্ণ, স্বরভঙ্গ, বিবিধ অঙ্গচেষ্টা, প্রণায়াম, সমাধি ইত্যাদি বহুবিধ স্বাত্বিক লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে থাকে।

যাঁহাদের মধ্যে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে, বুঝিতে হইবে সেই সকল লোক শক্তিশালী গুরুর নিকট শক্তিশালী নাম পাইয়াছেন। শক্তিশালী নাম সাধন ব্যতীত এসব লক্ষণ সাধকের মধ্যে প্রকাশ পায় না।

এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইতে থাকিলে বুঝিতে হইবে সাধক ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার মধ্যে স্বত্ব রজ তম গুণ যাহা আছে, তাহা ক্রমশ নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ভগবানের নামে রুচি জন্মিতেছে, সাধন সহজ ও সুখকর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সাধন পন্থায় টিকিয়া

থাকিলে সময়ে পরাশান্তি লাভ হইবে। মায়ার বন্ধন ছিন্ন হইবে।

মানুষের কোথায়ও সুশান্তি নাই। সাধনরাজ্যও নিরাপদ নহে। মানুষ যখন ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে থাকে তখন নিদারুণ মায়া তাহাকে সাধনভ্রষ্ট করিবার জন্য সচেষ্টিত হন।

কোন কোন ব্যক্তির উপর ঘোর নির্য্যাতন উপস্থিত হয়। বিবাদ বিসম্বাদ সংসারের অভাব অশান্তি, জ্বালা পোড়ার বাকী থাকে না। আবার কোন কোন ব্যক্তিকে ধন, মান, যশ, স্ত্রীলোক ইত্যাদির প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া মায়া তাহাকে সাধনভ্রষ্ট করেন। রাবণের চুলীর ন্যায় প্রাণ সদাই হুহু করিতে থাকে। না আছে আহারে রুচি, না আছে লোক-জনের সহিত কথাবার্ত্তায় সুখ, প্রাণ সদাই বিষণ্ণ ও মহা বিরক্ত। একটা না একটা দুশ্চিন্তা সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে। সাধনভজনে রুচি থাকে না। দারুণ মায়া যাহাকে যেরূপে বাগে পান, তাহাকে সেইরূপে আক্রমণ করিয়া সাধনভ্রষ্ট করিয়া ফেলেন। মায়া কি ভাবে আক্রমণ করিবেন বুঝে উঠা বড় কঠিন।

মায়ার এই আক্রমণে গোস্বামী মহাশয়ের বহু শিষ্যের পতন দেখিলাম। এই শিষ্যগণ প্রথমতঃ দেবদুর্ল্লভ অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যেমন সাধন, তেমনি বৈরাগ্য ছিল। সাধনভজন ব্যতীত তাঁহাদের আর কিছুই ভাল লাগিত না।

এখন মায়ার কুহকে পড়িয়া তাঁহারা সব হারাইয়াছেন। তাঁহারা সাধুসঙ্গ করিতে পারেন না। তাঁহাদের সৎপ্রসঙ্গ, সদালোচনা একেবারেই নাই। যে স্থানে ভগবানের নাম বা পুজা অর্চ্চনা হয়, সে স্থানে তাঁহাদের যাইতে বা থাকিতে প্রবৃত্তি হয় না। কেবল কুসঙ্গে, কুকার্য্যে কাল যাপন করিতেছেন। গুরুদত্ত নামটি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছেন।

তাঁহাদিগকে পুর্ব্বের অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া দিলে তাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করেন বটে কিন্তু সাধনভজন বা সৎসঙ্গ করিবার নাম করিতে চান না। তাঁহাদের এ জন্মের আশাভরসা আর আমি দেখি না।

সাধন-পন্থায় প্রত্যেকের জীবনে একবার মায়ার আক্রমণ হইবেই হইবে। তাঁহার হাতে কাহারও নিস্তার নাই। শাস্ত্রে ইহা ইন্দ্রদেবের অত্যাচার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহাদের উপর এ আক্রমণ হয় নাই বুঝিতে হইবে ভবিষ্যতের জন্য তাহা সঞ্চিত আছে।

মানুষ যতক্ষণ মায়ার অনুগত হইয়া চলিবে, ততক্ষণ তাহার প্রতি তাঁহার কোন অত্যাচার আরম্ভ হয় না। কিন্তু যখনই মায়া বুঝিবেন এই সাধকটা তাঁহার আনুগত্য পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সে অধীনতাশৃঙ্খল ভগ্ন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে, রাজা যেমন বিদ্রোহী প্রজাকে নির্য্যাতন করেন, নিদারুণ মায়া তেমনি সেই সাধককে ভীষণ বেগে আক্রমণ করিবেন। যে কোন উপায়ে হউক তাহাকে সাধনভ্রষ্ট করিয়া, তবে ছাড়িবেন।

মায়ার আক্রমণ বড়ই সাংঘাতিক। অনেক উচ্চ সাধকও ইঁহার আক্রমণে পরাস্ত হইয়াছেন। অতি অল্প লোকই ইহার আক্রমণে টিকে থাকিতে পারেন।

আমি সমস্ত গুরু ভাই-ভগ্নীদিগকে বলিতেছি; সাধনপন্থায় আপনারা কদাচ নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। একবার মায়ার আক্রমণ হইবেই হইবে। আপনারা এখন হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকুন। কাহার উপর কোনভাবে আক্রমণ হইবে কিছু বলা যায় না। আপনারা মায়ার উপর খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন।

মায়ার আক্রমণ বড় সাংঘাতিক হইলেও আপনারা ভীত বা হতাশ হইবেন না। সদ্‌গুরু সারথি আছেন। তিনি আপনাদের মধ্যে শক্তি

সঞ্চার করিয়াছেন। আপনারা ব্রহ্মতেজে তেজীয়ান। *ভগবানের নাম এক অমোঘ অস্ত্র, ইহা আপনাদিগের হাতে। আপনাদের ভয় কি ?

সমস্ত বিশ্ব মায়ার অধীন। তিনি কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না। সমস্ত বিশ্ব তাঁহার পদানত। আপনারা সদ্‌গুরুর তেজে তেজীয়ান হওয়াতেই আপনাদের উপর মায়ার লক্ষ্য পড়িয়াছে। নতুবা আপনাদের উপর তাঁহার লক্ষ্য পড়িবার আদৌ কারণ ছিল না।

মায়ার আক্রমণ যতই কেন সাংঘাতিক হউক না, আপনারা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিবেন না। ধৈর্য্য-সহকারে জ্বালা, যন্ত্রণা, অভাব আসক্তি, অপমান লাঞ্ছনা ইত্যাদি যাবতীয় নির্য্যাতন ভোগ করিতে থাকিবেন। গুরুকে স্মরণ করিয়া নাম ধরিয়া পড়িয়া থাকিবেন। নামকে কদাচ পরিত্যাগ করিবেন না। সাধন-সমরে আপনারা নিশ্চয়ই জয় লাভ করিবেন। মায়া পরাস্ত হইবেই হইবে।

মায়ার আক্রমণ ৫।৬ বৎসরের অধিক থাকে না। এই কয়েক বৎসরকাল অতি ভয়াবহ মর্ম্মযাতনা ভোগ করিতে হয়, প্রাণটা যেন গেলেই বাঁচি। সময় সময় আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইবার ইচ্ছা হয়।

নাম যে কিরূপ পরমহিতৈষী, তাঁহার শক্তিই বা কিরূপ, এই দারুণ বিপদকালে আপনারা টের পাইবেন। বিপদে না পড়িলে কাহার কত-টুকু ভালবাসা, কে কেমন বন্ধু চেনা যায় না। এই বিপদ-কালে সংসারের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সকলেই আপনাকে পরিত্যাগ করিবে, কেবল নামই আপনার সহায় হইয়া আপনাকে প্রাণপণে রক্ষা করিবেন, আপনার প্রাণে সান্ত্বনা দিবেন, এবং ক্ষতস্থানে ঔষধ দিয়া জ্বালাযন্ত্রণা জুড়াইয়া দিতে থাকিবেন। নামের মহিমা তখন টের পাইবেন। নাম যে কি প্রাণের বস্তু তখন বুঝিবেন। আজ নাম বীভৎস মনে হইতেছে, তখন কিন্তু নাম অমৃত অপেক্ষাও সুমধুর মনে হইবে। নামের বিরহ সহ্য করিতে পারিবেন না।

আমি পূর্ব্বে মনে করিতাম, নামের মেজাজটা বড় চটা। নাম বড় অহঙ্কারী ও স্বার্থপর। নাম কথায় কথায় চটিয়া উঠেন, একটু ত্রুটি দেখিলেই অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করেন, আমার মুখ দর্শন করিতে চান না। নামের উপর আমার একটা বড় মন্দ ধারণা ছিল।

এখন দেখিতেছি, নামের তুল্য সুহৃদ এজগতে কেহ নাই। নামের স্নেহ-মমতা অতুলনীয়। নাম যেমন আদর যত্ন জানেন, এমন আদর যত্ন কেহ জানে না। তাঁহার স্বার্থের লেশমাত্র নাই।

নাম যেন একেবারে মাটির মানুষ। তাঁহার অহঙ্কার অভিমান বিন্দুমাত্র নাই। তিনি পৃথিবীর ন্যায় ধৈর্য্যশীল এবং একেবারে অদোষ-দর্শন।

নাম যেমন ভালবাসিতে জানেন, এমন আর কেহ জানেন না। সংসারের বন্ধুগণ প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারেন না, একটু মতভেদ হইলে বন্ধুত্ব শত্রুতায় পরিণত হয়। আর ভালবাসা থাকে না।

নাম কিন্তু সেরূপ নহেন। তিনি প্রেমাস্পদের নিকট কিছুমাত্র প্রতি-দান চান না। ভালবাসিয়াই খালাস। তিনি প্রেমাস্পদের কল্যাণের জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। নামের সহিত যাঁহার কিছুমাত্র পরিচয় হইয়াছে, সংসারের ভালবাসা সংসারের আত্মীয়তা তাঁহার নিকট একেবারে অকিঞ্চিৎকর হইয়াছে।

যদি প্রেমের তত্ত্ব শিখিতে চাও, তবে নামের পাঠশালায় ভর্ত্তি হও। প্রেম জিনিষটা কি, এই নাম তোমাকে শিখাইয়া দিবেন। এমন শিক্ষা আর কোথাও পাইবে না।

প্রেমের অর্থ আত্মত্যাগ, আত্মবিসর্জ্জন। প্রেমিক প্রেমাস্পদকে কেবল ভালবাসিয়া খালাস। প্রেমাস্পদ যাহাতে সুখী হয়, প্রেমাস্পদের যাহাতে কল্যাণ হয়, প্রেমিকের দৃষ্টি কেবল সেই দিকেই থাকে।

প্রেমিক প্রেমাস্পদের নিকট কিছুমাত্র প্রতিদান চান না। প্রেমাস্পদ

প্রেমিককে ভালবাসে কি না, তিনি তাঁহার কল্যাণকামী কি না। তাঁহার দুঃখে তিনি দুঃখিত ও সুখে সুখী কি না, এ সকল দিকে প্রেমিকের দৃষ্টি থাকে না।

প্রেমাস্পদের দুঃখক্লেশ বিপদ আপদ উপস্থিত হইলে, প্রেমিক যথা-সর্ব্বস্ব পণ করিয়া তাহার দুঃখক্লেশ ও বিপদ-আপদ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন। নিজের ক্ষতি ক্লেশ দুঃখ যন্ত্রণার প্রতি তাঁহার আদৌ দৃষ্টি থাকে না।

প্রেমাস্পদের সুখই প্রেমিকের সুখ। প্রেমাস্পদের দুঃখই তাহার দুঃখ। তাহার স্মরণ, মননে, কথাবার্ত্তায়, সহবাসে প্রেমিকের আনন্দ ধরে না। প্রেমাস্পদের বিরহ প্রেমিকের বড়ই অসহ্য।

দুরন্ত স্বার্থ, এবং ঘোর আসক্তি, প্রেমের তত্ত্বটি মানুষকে বুঝিতে দেয় না। এই স্বার্থ ও আসক্তির জন্যই এখন মানুষকে বড় একটা প্রেমের উপাসক হইতে দেখি না।

নাম, এই স্বার্থ ও আসক্তি নষ্ট করিয়া মানুষকে প্রেমের রাজ্যে লইয়া যায়। প্রেম অপার্থিব বস্তু; বহুভাগ্যে ইহা মানুষের লাভ হইয়া থাকে।

মায়ার আক্রমণের ৫।৬ বৎসর কাটাইয়া দিতে পারিলেই আর মায়ার আক্রমণ থাকিবে না। সমস্ত অনর্থের নিবৃত্তি হইবে। ভজনসাধন সরস হইবে। সাধক নিরাপদ হইবেন।

দুষ্প্রবৃত্তি ও আসক্তি বড় সর্ব্বনেশে জিনিস, ইহা কিছুতেই যায় না। মানুষ প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং এই প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ শুভাশুভ কার্য্য করিয়া থাকে। প্রকৃতির দ্বারা মানুষ জীবন-পথে পরিচালিত হয়। প্রকৃতির পরিবর্ত্তন অসম্ভব।

সকলের সকল বিষয়ে আসক্তি থাকে না। কাহারও ধনে আসক্তি,

কাহারও সন্তানে আসক্তি, কাহারও স্ত্রীতে আসক্তি, কাহারও বা প্রতিষ্ঠায় আসক্তি ইত্যাদি।

কাহারও সন্তানবিয়োগে আদৌ কষ্ট হয় না, কিন্তু একটা পয়সার হানি হইলে প্রাণটা যেন বাহির হইয়া যায়। কেহ স্ত্রীবিয়োগে আদৌ ক্লেশানুভব করে না, কিন্তু একটু নিন্দাতেই মরিয়া যায়। এইরূপ যাহার যেখানে আসক্তি সেইখানে আঘাত পড়িলেই সর্ব্বনাশ। সেইখানেই পরীক্ষা।

আসক্তি নষ্ট হইতে থাকিলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। হিংসা দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা অহঙ্কার অভিমান নিষ্ঠুরতা জীবহিংসা প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তি সকল কমিতে আরম্ভ হয়। দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকার, সত্যনিষ্ঠা শৌচ প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি সকল জাগরূক হইতে থাকে; দীনতা, লোকমর্য্যাদা ইত্যাদি আসিয়া উপস্থিত হয়। ভগবানের নামে ও ভগবৎ প্রসঙ্গে প্রাণ অধিকতর বিগলিত হইতে থাকে। এইগুলিকেই ধর্ম্মলাভের স্থায়ী ও শ্রেষ্ঠ লক্ষণ বলিয়া জানিবেন।

সাধনপন্থায় এই সমস্ত লক্ষণের অতি সামান্য একটু লাভ হইলেই যথেষ্ট লাভ হইয়াছে মনে করিতে হইবে। কারণ একটু লাভ হইলেই বুঝিতে হইবে ক্রমে ক্রমে সমস্তটুকুই লাভ হইবে।

যখন এই সমস্ত অবস্থা লাভ হইতে থাকিবে, তখন অশ্রু কম্পাদি স্বাত্ত্বিক লক্ষণ সকল ও অধিকতররূপে প্রকাশ পাইতে থাকিবে।

সাধনপন্থায় ধর্ম্মজীবন-লাভের আরও একটি শ্রেষ্ঠ লক্ষণ আছে। এ লক্ষণটি বাহিরে প্রকাশ পায় না, সাধক নিজেই বুঝিতে পারেন।

সাধনপন্থায় সাধকের এমনি অবস্থা হয় যে, তিনি মনে করেন তাঁহার স্বাধীনতা নষ্ট হইয়াছে। তিনি এমন এক শক্তির হাতে পড়িয়াছেন যাঁহার হাত ছাড়াইয়া তাঁহার আর পলাইবার উপায় নাই। তিনিই যেন

তাঁহার জীবনের নিয়ামক। তিনিই যেন তাঁহাকে জীবনপথে পরিচালিত করিতেছেন।

এই লক্ষণটি বড় সুলক্ষণ। এই লক্ষণ উপস্থিত হইলে বুঝিতে হইবে ভগবান সাধকের সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন; তিনি সততই সাধককে নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন।

এই আকর্ষণ একবার উপস্থিত হইলে আকর্ষণের অনুগত হইয়া চলাই সাধকের কর্ত্তব্য। যতই অনুগত হইয়া চলিবেন ততই তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবেন কিন্তু এদিক ওদিক করিলে বা বিমুখ হইলে এ আকর্ষণ আর থকিবে না। তোমার স্বাধীনতা তোমাকে দিয়া ভগবান তোমাকে ছাড়িয়া দিবেন, ভগবান কাহারও স্বাধিনতায় হস্তক্ষেপ করেন না।

যাঁহারা ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে চান যাঁহারা তজ্জন্য সাধনভজন করিয়া আসিতেছেন, এই লক্ষণগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাদের চলা কর্ত্তব্য নতুবা ভজনসাধন কেবল তুষারঘাতির ন্যায় পণ্ডশ্রম হইলে তাঁহাদিগকে পরিণামে অনুতাপিত হইতে হইবে।

অনেক সাধু সজ্জন লোক আজীবন কঠোর ধর্ম্ম সাধন করিয়া আসিতে-ছেন। বহু ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন। শেষে কিন্তু তাঁহাদিগকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে ও অনুতাপিত হইতেই দেখিতেছি।

সামান্য বিষয়কর্ম্ম করিতে হইলে কত সাবধানে চলিতে হয়। একটু ত্রুটি হইলেই ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়, আর ধর্ম্মলাভ করিতে গিয়া অসাবধান হইয়া চলিলে কি ধর্ম্ম লাভ হইবে? ঋষিরা ধর্ম্মের পথকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় বর্ণন করিয়াছেন, একটু অসাবধান হইলে আর কি রক্ষা আছে? একেবারে রক্তারক্তি হইয়া যাইবে। এইজন্য বলিতেছি, যাঁহারা ধর্ম্মপথে বিচরণ করিবেন তাঁহারা যেন খুব সাবধানে থাকেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গুরু অপরাধীর পরিণাম

শ্রীযুত হরিমোহন চৌধুরী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জন্মস্থান ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রাম। তথায় ইঁহার স্ত্রী ও সন্তান বর্ত্তমান আছেন। ইনি ঢাকা কলেজের স্কুলবিভাগে শিক্ষকতা করিতেন।

গোস্বামী মহাশয় ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ বাড়ীতে অবস্থিতি কালীন হরিমোহন বাবু গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষিত হইয়া সাধনভজনে প্রবৃত্ত হন।

হরিমোহন বাবু যতই সাধন করিতে লাগিলেন ততই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তিনি নূতন নূতন অবস্থা লাভ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার সন্ন্যাস লইবার বাসনা জাগিয়া উঠিল। সংসারে আর মন টেকে না।

বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালীর পক্ষে সন্ন্যাসাশ্রম উপযুক্ত নহে। ধর্ম্ম-সংস্থাপন জন্য শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইয়াছিল বটে কিন্তু তিনি সন্ন্যাসের পক্ষপাতী ছিলেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পন্থাই গোস্বামী মহাশয়ের পন্থা, সুতরাং তিনিও সন্ন্যাসের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার বহু শিষ্যের মধ্যে তিনি কাহাকেও সন্ন্যাস দেন নাই।

দীক্ষা গ্রহণের পর হরিমোহন বাবু নিজের মধ্যে গুরুদত্ত ভগবৎ শক্তির অলৌকিক ক্রিয়া দেখিয়া তাঁহার মধ্যে প্রতিষ্ঠা বলবতী হইয়া দাঁড়াইল, সন্ন্যাস লইবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

গোস্বামী মহাশয় কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতেন না।

তিনি সন্ন্যাসের পক্ষপাতীও ছিলেন না, কেবল হরিমোহন বাবুর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য সন ১৩৯৫ সালে কলিকাতা মোকামে তাঁহাকে সন্ন্যাস দিলেন।

সসন্ন্যাস দিতে হইলে বিরজা হোম করিতে ও হোমাগ্নিতে শিখা সূত্র আহুতি দিতে ও আর আর ক্রিয়াকলাপ করিতে হয়। হরিমোহন বাবুর সন্ন্যাসে এ সব কিছুই হয় নাই। তাঁহার নামেরও পরিবর্ত্তন হয় নাই। গোস্বামী মহাশয় সন্ন্যাসের উপদেশ দিয়া কেবল সন্ন্যাস দেওয়া হইল এই কথা হরিমোহন বাবুকে বলিয়াছিলেন। সদ্‌গুরুর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

সন্ন্যাস দিবার সময় গোস্বামী মহাশয় হরিমোহন বাবুকে যে সকল সন্ন্যাসের নিয়ম প্রতিপালন করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

১ম। ধাতু দ্রব্য স্পর্শ করিবে না। থালা, ঘটি, বাটী, গেলাস প্রভৃতি ধাতুপাত্রে আহার কিম্বা জল পান করিবে না। কেহ ধাতুপাত্রে খাদ্যবস্তু ও পানীয় প্রদান করিলে, খাদ্য দ্রব্য পাতা অথবা কোঁচড়ে ঢালিয়া লইবে।

২য়। পানীয় দ্রব্য হাতে করিয়া পান করিবে। নদী পার হইতে হইলে, পয়সার অভাবে নদীতীরে বসিয়া থাকিবে, তথাপি পয়সা স্পর্শ করিবে না। সন্তরণ দ্বারা নদী পার হওয়া সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রশস্ত নহে।

৩য়। করঙ্গ ব্যবহার করিলে অলাবু, কাষ্ঠ এবং নারিকেলের করঙ্গ ব্যবহার করিবে।

৪র্থ। স্ত্রীলোক স্পর্শ করিবে না। যদি কোন সাধু রমণী দয়া করিয়া স্পর্শ করেন, তাহাতে আপত্য নাই। কিন্তু নিজে কদাচ স্পর্শ করিবে না। কোন নারীকে প্রণাম করিতে হইলে, দূরে থাকিয়া প্রণাম করিবে। মৃত্তিকার দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে।

৫ম। গৃহস্থের বাড়ীতে এক রাত্রির অধিক বাস করিবে না। বৃষ্টি প্রভৃতি অনিবার্য্য কারণে থাকিতে বাধ্য হইলে সেই গ্রামের অন্য গৃহস্থের বাড়ীতে থাকিবে।

৬ষ্ঠ। কোন সাধুর আশ্রমে গমন করিলে তথায় দীর্ঘকাল বাস করিতে পারিবে। কিন্তু এক দিন মাত্র তাঁহাদের অন্ন ভোজন করিয়া পরে নিজে ভিক্ষা করিয়া খাইবে। তাঁহাদের গৃহে বাস করিতে বাধা নাই।

৭ম। গুরু ভাইদিগের গৃহে যত দিন ইচ্ছা থাকিতে পারিবে। তাহাদিগকে গৃহস্থ মনে করিবে না। গৃহস্থ হইলেও তাঁহারা উদাসীন।

৮ম। খাদ্য বস্তু ভিন্ন অন্য বস্তু ভিক্ষা করিবে না। তিন বাড়ীতে ভিক্ষা না পাইলে উপবাস করিয়া থাকিবে। উচ্ছিষ্ট রাখিবে না এবং কাহাকেও দিবে না।

৯ম। শ্রাদ্ধের অন্ন কদাচ ভোজন করিবে না। এই কথাটি বিশেষ করিয়া মনে রাখিবে।

১০ম। তিন চারি ক্রোশের অধিক পথ চলিবে না। আড্ডা না পাইলে অধিক পথ চলিতে পারিবে।

১১শ। সদা সন্তুষ্ট, নিরহঙ্কার ও নির্বৈর হইবে।

১২শ। তুমি যে পথে পদার্পণ করিতেছ, তাহা রাজপদ হইতেও শ্রেষ্ঠ গৌরবময়। সনক, সনন্দ, সনৎ কুমার শুকদেব মহাপ্রভু প্রভৃতি মহা-পুরুষদিগের বংশে আজি তুমি জন্মগ্রহণ করিলে। সাবধান যেন পথের গৌরব নষ্ট না হয়।

গোস্বামী মহাশয় হরিমোহনকে সন্ন্যাস দিয়া তাঁহাকে চারিধাম ভ্রমণ করিবার অনুমতি দিলেন।

প্রতিপালন করিয়া চলা বড়ই কঠিন। কিন্তু হরিমোহনের পশ্চাতে সদ্‌গুরু বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে সমস্ত বিপদ-আপদে রক্ষা করিয়া থাকেন, সমস্ত অভাব মোচন করিয়া থাকেন। তিনি গুরুদত্ত মহা শক্তিতে শক্তিমান্। হরিমোহনের পক্ষে সন্ন্যাসের নিয়ম প্রতিপালন করা বড় একটা কঠিন ব্যাপার ছিল না।

হরিমোহনবাবু যদিও সন্ন্যাসের নিয়মগুলি প্রতিপালন করিতে পারিলেন না, তথাপি তিনি অতি অল্পদিন মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী ও মহা প্রভাবান্বিত হইয়া উঠিলেন। বনে, জঙ্গলে, পাহাড়-পর্ব্বতে গভীর সাধনায় নিযুক্ত থাকায় গুরুশক্তি তাঁহার মধ্যে দিনদিন প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল। তাঁহার প্রভাব দেখিয়া লোকে বিস্ময়ান্বিত হইতে লাগিল।

আমি "মহাপাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুর লীলা" নামক গ্রন্থে এই হরিমোহন বাবুর প্রভাবের কথা বর্ণন করিয়াছি; আর লিখিবার প্রয়োজন নাই। পাঠক মহাশয় ঐ গ্রন্থের ১৭৩ পৃষ্ঠা হইতে ১৯৭ পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন।

হরিমোহন বাবু নিজের মধ্যে প্রবল গুরুশক্তির অলৌকিক কার্য্যকলাপ দেখিয়া আপনাকে আর মানুষ বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না; তাঁহার ধারণা হইল, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার। ঘোর প্রতিষ্ঠা তাঁহার অন্তর অধিকার করিয়া ফেলিল।

গুরু বর্ত্তমানেই হরিমোহন শিষ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। হরিমোহনের প্রভাব দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় অপেক্ষা লোকে হরিমোহনকেই পছন্দ করিতে লাগিল। নিজে ধর্ম্ম লাভ করা অপেক্ষা পরকে ধর্ম্ম প্রদান করিবার জন্য হরিমোহন ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার পতন আরম্ভ হইল।

১৩০১ সালে হরিমোহন বাবু কিছু দিন আমার নিকট বোলপুরে ছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন

—আমি এইখানেই থাকিয়া সাধনভজন করিব। আর কোথায়ও যাইব না। এখানকার আশ্রম অতি রমণীয় ও নির্জ্জন। সাধনভজনের বড় অনুকূল।

আমি—বিজাতীয় সঙ্গ ভাল নয়। বোলপুরের আশ্রমেই থাক, কোথাও যাইবার প্রয়োজন নাই। একটা পেট তাহার জন্য ভাবনা কি? আমিত আছিই।

হরিমোহন—ভাই অনেক জায়গা ঘুরিয়া বেড়াইলাম, কোথাও তৃপ্তি পাইলাম না, যেখানে যাই সেইখানেই আঘাত পাই। এ জায়গা পরিত্যাগ করিয়া আর কোথাও যাইব না।

হরিমোহন বাবু কিছু দিন এখানে থাকিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

হরিমোহন বাবু শ্রীবৃন্দাবন যাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে আমি বলিলাম —ভাই, তুমি শ্রীবৃন্দাবন যাইও না। সেখানে ঘোর সাম্প্রদায়িকতা। যাহার গলায় মালা নাই, ললাটে হরিমন্দিরের তিলক নাই, হাতে হরিনামের ঝুলি নাই, সেখানকার বৈষ্ণবগণ তাহাকে মানুষের মধ্যে গণ্য করে না। অত্যন্ত অন্ত্যজ বলিয়া ঘৃণা করে। তোমার ভাব তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারিবে না। তোমার গৈরিক বসন, ও গলায় মালা নাই দেখিয়াই তাহারা চটিয়া যাইবে। সে স্থান তোমার ভজনের অনুকূল নয়। ভাবের মর্য্যাদা না দিলে ভাব খেলে না। বিজাতীয় লোকের সহবাসে থাকিলে ভজন নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিজাতীয় লোক দেখিলেই ভাব সম্বরণ করিতেন।

হরিমোহন—আমি বেশী দিন থাকিব না, অল্পদিন মধ্যে আবার ফিরিয়া আসিব।

আমি—তোমার যাইবার প্রয়োজন কি? তুমি জানিও তুমি যেখানে বসিয়া ভগবানের নাম কর, সেই স্থানই শ্রীবৃন্দাবন। সেই স্থানে সমস্ত তীর্থ, সমস্ত দেবতাগণ উপস্থিত থাকেন। নাম লইয়া এইখানেই পড়িয়া থাক। অনেক ছুটাছুটি করিয়াছ, আর ছুটাছুটি করিবার আবশ্যক নাই।

হরিমোহন—গুরু শ্রীবৃন্দাবনে রহিয়াছেন, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য প্রাণটা বড় ব্যাকুল হইয়াছে, রাত্রে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি গুরুদর্শন না করিয়া আর জলগ্রহণ করিব না।

আমি আর কোন কথা না বলিয়া অচিরাৎ তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন যাইবার বন্দবস্ত করিয়া দিলাম, পাথেয় খরচা সমস্ত দিলাম। হরিমোহন শ্রীবৃন্দাবন রওনা হইলেন।

হরিমোহন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন গুরুদর্শন না করিয়া জলস্পর্শ করিবেন না, একারণ শ্রীবৃন্দাবনের পথে আর তিনি জলস্পর্শ করিলেন না, অনাহারেই থাকিলেন।

হরিমোহন বাবু এই অবস্থায় শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, গোস্বামী মহাশয় শ্রীবৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা দেশে রওনা হইয়াছেন।

হরিমোহন একে ক্ষুধাতৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর, তাহাতে শ্রীবৃন্দাবনে গুরু নাই শুনিয়া তাঁহার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। সেই সময় কলিকাতা আসিবার জন্য গোস্বামী মহাশয় শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে রওনা হইয়া মথুরায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

হরিমোহন এই কথা শুনিয়া হাতে মুখে জল না দিয়াই মথুরাভিমুখে

ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হইলেন এবং ট্রেণের মধ্যে গুরুকে দর্শন করিয়া গোস্বামী মহাশয়কে প্লাটফরম হইতে অভিবাদন করিলেন।

গোস্বামী মহাশয় হরিমোহনকে এই অবস্থায় দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন; তিনি হরিমোহনকে বলিলেন "শ্রীবৃন্দাবন চেতাও।" ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ হরিমোহনের প্রভাব দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন, তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া তাঁহাদের ধারণা হইল।

সন্ন্যাস লইবার কিছুদিন পরে কুষ্ঠিয়ার মুন্সেফ-বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত হরিমোহন বাবুকে সচ্চিদানন্দস্বামী বলিয়া ডাকিতেন, শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া হরিমোহন ঐ উপাধির সহিত বালকৃষ্ণ যোগ করিয়া এইবার বালকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ স্বামী হইলেন।

এমন একজন প্রভাবান্বিত লোককে দলভুক্ত করিয়া না লইলে বৈষ্ণব-গণের আর তৃপ্তি নাই, তাঁহারা হরিমোহনের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগি-লেন। প্রতিষ্ঠা বড়ই কর্ণরসায়ন। ইহার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া বড়ই কঠিন। এই জন্য সাধুগণ প্রতিষ্ঠাকে শূকরী বিষ্ঠা বলেন এবং তদ্বৎ তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। প্রতিষ্ঠা সাধনরাজ্যের বড়ই কণ্টক।

হরিমোহনবাবু প্রতিষ্ঠার বশবর্ত্তী হইয়া বৈষ্ণবগণের দলে মিশিয়া গেলেন। তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভক্তিভাজন শ্রীযুত রাধিকানাথ গোস্বামী মহাশয়ের দ্বারা হরিমোহনকে দীক্ষিত করিলেন। এইবার হরিমোহনের নাম হইল রাইদাসী ব্রজবালা।

শ্রীবৃন্দাবনবাসী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ গোফার মধ্যে নিভৃতে ভজন করিয়া থাকেন; তাঁহারা সাধারণ বৈষ্ণবগণের সহিত প্রায়ই মিশেন না। সাধারণ বৈষ্ণবগণ প্রায়ই কামিনীকাঞ্চনের দাস।

হরিমোহন এই সকল বৈষ্ণবের সহবাসে থাকিয়া শ্রীবৃন্দাবনে এক আশ্রম করিয়া ঠাকুরসেবা প্রকাশ করিলেন। সুতরাং

ও সেবা চালাইবার জন্য তাঁহার অর্থের প্রয়োজন হইল; সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকেরও দরকার হইল।

হরিমোহন ছিলেন সন্ন্যাসী, এখন কিন্তু ঘোর সংসারী হইলেন। গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশ একেবারে ভুলিয়া গেলেন। অর্থের জন্য তাঁহাকে নানা স্থানে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইল। সাধনভজন সব ফুরাইল। গুরুশক্তি অন্তরিত হইল; তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি সব গেল, এখন তিনি ঠিক যেন একখানা পোড়া কাঠ।

আশ্রম-রক্ষা ও সেবার খরচ নির্ব্বাহের জন্য হরিমোহন ক্রমশঃ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। ঋণ আদায়ের জন্য পাওনাদার ব্রজবাসিগণ তাঁহাকে বিরক্ত করিতে লাগিলেন সুতরাং সেবা ফেলিয়া হরিমোহন শ্রীবৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া ব্রজের গ্রামে ফেরার হইয়া থাকিলেন। ঠাকুরসেবার ত্রুটি দেখিয়া ভক্তপ্রবর বনমালী রায় বাহাদুর নিজে খরচ দিয়া অন্য লোক দ্বারা সেবা চালাইতে লাগিলেন।

১৩০৬ সালে আশ্বিন মাসে আমি শ্রীবৃন্দাবন ধাম গমন করিয়াছিলাম। হরিমোহন তখন ব্রজের গ্রাম-মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

আমার শ্রীবৃন্দাবনে থাকা শুনিয়া ব্রজের গ্রাম হইতে হরিমোহন বাবু আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন; বহুদিনের পর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় বড়ই আনন্দিত হইলেন।

হরিমোহন বাবুর প্রাণটা বড় খোলা। তিনি আমার নিকট নিজের দুরবস্থার কথা সমস্ত ব্যক্ত করিয়া বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

—দাদা, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমার পতন হওয়ায় সর্ব্বদাই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। গুরুশক্তি চলিয়া গিয়াছে। এখন আমি অপদার্থ একখানা পোড়া কাঠ মাত্র।

আমি—তুমি স্থির হও। মনের চাঞ্চল্য দূর কর। আশ্রম ও সেবা প্রকাশ করিয়া বড়ই কুকাজ করিয়াছ। স্ত্রীপুত্র বিষয়বৈভব লইয়া থাকা একপ্রকার সংসার করা, আর ঠাকুরসেবা ইত্যাদি লইয়া থাকা আর এক প্রকার সংসার করা, ফলতঃ দুইই সংসার। সংসার ত্যাগ করিয়া আবার সংসারী হওয়া কেন? আশ্রম ও ঠাকুরসেবা ত্যাগ কর; নিষ্কিঞ্চন হইয়া ভজন কর; সব ফিরিয়া আসিবে। গুরুশক্তি একেবারে নষ্ট হইবার জিনিস নয়। গুরুর পন্থায় ভজন করিতে থাকিলেই গুরুশক্তি আবার ফিরিয়া আসিবে।

হরিমোহন—আমাকে বড়ই বিপন্ন হইতে হইয়াছে।

আমি—সাধুর পক্ষে অর্থাভাব ক্লেশকর নয়। অর্থ সমস্ত অনর্থের মূল। ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করা তোমার পক্ষে নিষিদ্ধ। তোমাকে স্ত্রীলোক স্পর্শ করিতে নাই। মাটির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলাই ব্যবস্থা, সে সমস্ত কি ভুলিয়া গিয়াছ? এখানে আর তোমার ক্ষণকাল থাকা কর্ত্তব্য নয়। বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়া চল। আমি শীঘ্রই দেশে যাইব; আমার সঙ্গে তুমি যাইবে।

হরিমোহনের সঙ্গে নানারূপ কথাবার্ত্তার পর হরিমোহন আমাদিগকে তাঁহার আশ্রমে লইয়া গেলেন। সেখানে বেশ একটু কীর্ত্তন করিলেন। তাঁহার বেশ একটু ভাব হইল। তাহার পর তিনি আমাদিগকে প্রসাদ খাওয়াইয়া বলিতে লাগিলেন

—দাদা আমি মরিয়া গিয়াছিলাম। দুই বৎসরকাল, গুরুশক্তি আমাকে ত্যাগ করিয়াছিল। আমার জীবন শুষ্ক ও দুঃখময় হইয়াছিল। আপনার সহবাসে আজ গুরুশক্তি দেখা দিল। আজ আমি মৃতদেহে জীবন পাইলাম।

আমি—শক্তিশালী লোকের সহবাসে শক্তির আদানপ্রদান হইয়া থাকে। সতীর্থ ভিন্ন অন্য লোকের সহবাস করা তোমার কর্ত্তব্য নয়। সতীর্থগণের সহবাসে থাকিলে তোমার যা ছিল সব ফিরিয়া আসিবে। তুমি একাকা বিজাতীয় সঙ্গে থাকিলে মারা যাইবে। শ্রীবৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা দেশে গিয়া গুরু ভাইদের সঙ্গে থাকিবে, আর বিপথগামী হইও না।

হরিমোহন—আমি আশ্রম ও সেবার বন্দবস্ত করিয়া শীঘ্রই এস্থান পরিত্যাগ করিব, আর এভাবে জীবন কাটাইব না।

আমি দিন কয়েক পরেই দেশে ফিরিলাম, কিন্তু হরিমোহন আর ফিরিলেন না। তিনি ব্রজধামেই থাকিয়া গেলেন। দেনার জ্বালায় ব্রজবাসিগণের নির্য্যাতন ভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহর মানসম্ভ্রম সব গেল। চারিদিকে কুৎসার প্রচার হইতে লাগিল।

হরিমোহনের অন্তরে প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত বলবতী। এই প্রতিষ্ঠায় আঘাত পড়ায় ও ব্রজবাসিগণের নির্য্যাতন সহ্য করিতে না পারায় হরিমোহন ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা দেশে আসিয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

হরিমোহন বিপথগামী, তিনি সতীর্থগণের নিকট আদরযত্ন পাইবেন না, তাঁহার প্রতিষ্ঠাবৃত্তি চরিতার্থ হইবে না, একারণ হরিমোহন বাঙ্গালা দেশে আসিয়া তফাতে তফাতে বেড়াইতে লাগিলেন; কোন গুরুভাইয়ের সহিত দেখা করিলেন না। দিন দিন মলিন হইতে লাগিলেন।

শুনিয়াছি, কিছুদিন হইল তিনি কতকগুলি শিষ্য সংগ্রহ করিয়া হাবড়ায় এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য নানা ভঙ্গিতে সাজসজ্জা করেন। গুরুর ধর্ম্ম একেবারে

পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন অবধৌত বলিয়া পরিচয় দেন। পঞ্চমকার নাকি আরম্ভ করিয়াছেন।

পাঠক মহাশয় হাবড়ায় দ্বিতীয় মুন্সফী আদালতে যে এক বালিকা স্ত্রী পাইবার জন্য তিনি মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতে আপনারা তাঁহার কতক পরিচয় পাইয়াছেন।

হাবড়ায় তিনি এখন "নোলক বাবাজী" বলিয়া পরিচিত। জনসমাজে ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং প্রতারিত পর্য্যন্ত হইয়াছেন।

আমি শুনিয়াছি সদ্‌গুরুর সহিত হরিমোহনের যে যোগ ছিল, তাহা ঘুচিয়া গিয়াছে। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে যে ভগবৎ-শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তিনি এখন হরণ করিয়াছেন। এখন তিনি নিতান্তই দরিদ্র।

সাধুরা বলিয়া থাকেন—
"যব গুরু মেহেরবান।
তব চেলা পালিয়ান॥"

যতদিন সদ্‌গুরু হরিমোহনের সহায় ছিলেন, ততদিনই তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, এখন গুরুকৃপায় বঞ্চিত হওয়ায়, হরিমোহন যে কাঙ্গাল সেই কাঙ্গাল।

যাহার প্রতি গুরুর অকৃপা, সাধুগণ তাহাকে দরিদ্র বলিয়া থাকেন। হরিমোহন এখন বড়ই দরিদ্র। বড়ই পরিতাপের বিষয় এমন গুরুর শিষ্য হইয়া এজন্মটা তাঁহার বৃথাই গেল।

আমি সতীর্থগণকে বলিতেছি—সাবধান, আপনারা কেহ মনমুখী হইবেন না। গুরুর পন্থা পরিত্যাগ করিবেন না। সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। সংসারের আমোদ-আহ্লাদ আর কয় দিন? দুই দিন পরে সব ফুরাইয়া যাইবে। এমন সুযোগ আর পাইবেন না।

———o———

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অভিব্যক্তি

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ঋষিগণের তপস্যার স্থান। যুগযুগান্তর হইতে আর্য্য ঋষিগণ এইস্থানে ঘোরতর তপস্যা করিয়া সৃষ্টির আদি কারণ সেই অচিন্ত্য অব্যক্ত পরম পুরুষকে প্রকৃতির অন্তরাল হইতে বাহির করিয়াছেন এবং তাঁহাকে হস্তামলকবৎ বলিয়া গিয়াছেন।

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম অতি প্রাচীনকাল হইতে ক্রমশঃ উন্নতির পথে ছুটিয়াছে। ইঁহাকে বহুকাল হইতে, বহু শত্রু হস্তে বহু নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। তথাপি ইঁহার উন্নতিস্রোত বন্ধ হয় নাই।

এক সময় শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাহাদের হস্তে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মুমূর্ষু কাল উপস্থিত হইয়াছিল। লাঞ্ছনার বাকী ছিল না। সে বিপদ কাটিয়া গেলে আবার মুসলমানের হস্তে ইঁহাকে ঘোরতর নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী মুসলমানগণ হিন্দুধর্ম্ম নাশ করিবার জন্য প্রায় ৭০০ শত বর্ষকাল তলোয়ার চালাইয়াছিল। শাস্ত্রগ্রন্থ সকল ভস্মীভূত করিয়াছিল। প্রকাশ্যভাবে কাহারও ধর্ম্মাচরণ করিবার অধিকার ছিল না।

ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দু নারীগণ ধর্ম্মরক্ষার্থ দলে দলে প্রজ্বলিত চিতায় জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। মুসলমান বাদসাহের সিংহাসন তাঁহারা বামপদে ঠেলিয়া তাহাতে পদাঘাত করিয়াছিলেন।

দুরন্ত মুসলমানগণ হিন্দুর দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তি সকল ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছিল ; ছলে বলে কলে কৌশলে হিন্দুর জাতিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ; রাজনীতির কৌশলজাল বিস্তার করিয়া ও নানা প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণকে মুসলমান করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল।

এই সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ক্রমশঃ উন্নতির পথেই ছুটিয়া আসিয়াছে। ভগবান যাঁহার রক্ষক, তাঁহাকে কে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় ? ভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম ক্রমাগত উৎকর্ষ লাভ করিয়া আসিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে এই উৎকর্ষের পরিসমাপ্তি।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎকর্ষ ও বিশুদ্ধি ধর্ম্মজগতের শীর্ষস্থানীয়। এই ধর্ম্ম চিন্তা ও বিচারের অতীত। স্বয়ং ভগবান ইহার প্রতিষ্ঠাতা।

এই অবতারে ভগবান অস্ত্র ধারণ করেন নাই, অসুরের রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত হয় নাই। এবার কেবল প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়া অসুর দমন করিয়াছেন। অসুরগণের কঠিন হৃদয় ভক্তিরসে গলাইয়াছেন, তাহাদিগকে ভগবৎ-প্রেমে মাতোয়ারা করিয়া কাঁদাইয়াছেন এবং তাহাদের সঙ্গে নিজেও কাঁদিয়াছেন।

যাঁহারা বলেন, ভগবান অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অরূপ, তাহাদের নিকট তিনি তাহাই বটেন। কিন্তু ভক্তের নিকট তিনি সেরূপ নহেন।

নিকট ব্যক্ত, অরূপ হইলেও ভক্তের নিকট পরম রূপবান। সে রূপের সীমা নাই, বর্ণনা নাই। তিনি ভক্তের পরম সুহৃদ। এই জন্যে শাস্ত্রে বলে, ভক্তাধীন গোবিন্দ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম এক অচিন্ত্য ব্যাপার। ইহা লোকাতীত, শাস্ত্রাতীত। ইহা কেহ জানিত না, কেহ শুনে নাই, শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়াও ইহা টের পাইবার উপায় নাই। ইহা শাস্ত্রকার ঋষিগণেরও সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল।

ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করিলে কেবল প্রাকৃত ভক্তি ও পুরুষকারের ধর্ম্মই আমরা দেখিতে পাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধা ভক্তির কোন কথা দেখিতে পাই না।

পরিব্রাজকচূড়ামণি শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম কি তাহা তিনি আদৌ জানিতেন না। এই ধর্ম্মশাস্ত্রকার ঋষিগণের অবিদিত থাকায় ইহা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয় নাই, সুতরাং তিনি টের পান নাই।

এই পরিব্রাজকচূড়ামণি যখন মহাপ্রভুর ধর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি স্পষ্টই বলিলেন—

"ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন্ ক্ষমা মণ্ডলে
কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধীষণা যদ্বেদ নো বা শুকঃ।
যন্ন ক্বাপি কৃপাময়েন চ নিজেঽপ্যুদ্‌ঘাটিতং শৌরিণা
তস্মিন্নুজ্জ্বলভক্তিবর্ত্মনি সুখং খেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ॥

যে মধুর ভক্তিপথে ব্যাস প্রভৃতি মুনীন্দ্রগণও ভ্রান্ত হইয়াছেন, যাহাতে পূর্ব্বে পৃথিবীতলে কাহারও বুদ্ধি প্রবেশ করে নাই, যাহা শুকদেবও অবগত ছিলেন না, এবং যাহা কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভক্তের প্রতিও প্রকাশ

করেন নাই, তাহাতে এক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ সুখে ক্রীড়া করিতেছেন।

"স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মারিষ্কুর্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্ রসঃ॥
অভূদ্‌গেহে গেহে তুমুলহরিসঙ্কীর্ত্তনরবো
বভৌ দেহে দেহে বিপুলপুলকাশ্রুব্যতিকরঃ।
অপি স্নেহে স্নেহে পরমমধুরোৎকর্ষপদবী
দবীয়স্যাম্নায়াদপি জগতি গৌরেঽবতরতি॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরম ভক্তিযোগমার্গ প্রকাশ করিলে পর অন্য কোন রসই দেখিতে পাওয়া যায় না; যেহেতু বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা স্ত্রীপুত্রাদির কথা, পণ্ডিতরা শাস্ত্র বিচার, যোগীরা প্রাণায়ামাদিতে বায়ু বশীকরণ জন্য ক্লেশ, তাপসেরা তপোজন্য ক্লেশ এবং যতিরা জ্ঞানাভ্যাসবিধি অর্থাৎ নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ইহলোকে গৌরহরির অবতার হইলে প্রতি গৃহই হরিসঙ্কীর্ত্তন-রবে পূর্ণ, প্রতি দেহই বিপুল রোমাঞ্চ ও প্রেমাশ্রুধারায় শোভিত এবং বেদের অগোচর মধুর হইতেও মধুর প্রেমপথ প্রকাশিত হইয়াছে।

তিনি আরও বলিয়াছেন—

প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার॥

প্রেম নামক পরমপুরুষার্থ যাহা পূর্ব্বে কাহারও শ্রবণপথে গমন করে

নাই, নাম-মহিমা যাহা পূর্ব্বে কেহই জানিতেন না, শ্রীবৃন্দাবনের পরম মাধুরী যাহাতে কেহই প্রবেশ করিতে পারেন নাই, এবং পরমাশ্চর্য্য মাধুর্য্যরসের পরাকাষ্ঠা স্বরূপা শ্রীরাধা যাঁহাকে পূর্ব্বে কেহই অবগত ছিলেন না, কেবল এক চৈতন্যচন্দ্র প্রকটিত হইয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন।

পাঠক মহাশয় পরিব্রাজক-চূড়ামণি শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর এই কথাগুলি অতিরঞ্জিত, ভ্রান্তি বা সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিমূলক মনে করিবেন না। কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামধর্ম্ম ও অপ্রাকৃত প্রেমভক্তি শাস্ত্রের অতীত, শাস্ত্রকার ঋষিগণের ইহা অবিদিত ছিল। বেদাদি কোন শাস্ত্র পাঠ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম টের পাইবার উপায় নাই। উহা সম্পূর্ণ গুরুমুখী।

গোস্বামিপাদগণ মধ্যে যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একজনও মহাপ্রভুর ধর্ম্ম টের পান নাই। মহাপ্রভুর নামধর্ম্ম ও অপ্রাকৃত প্রেমভক্তি তাঁহাদের গ্রন্থে নাই। তাঁহারা ভাগবত ধর্ম্মকেই মহাপ্রভুর ধর্ম্ম মনে করিয়া তাহাতে নিজেদের মনগড়া মত সকল সন্নিবেশিত করিয়া বর্ত্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

মহাপ্রভুর ধর্ম্ম অবগত থাকিলে তাঁহাব নামধর্ম্ম ও অপ্রাকৃত প্রেমভক্তির কিছু না কিছু লিপিবদ্ধ থাকিত। তাঁহাদের গ্রন্থসকল কেবলমাত্র পুরুষকারের ধর্ম্ম, ও প্রাকৃত প্রেম ও প্রাকৃত ভক্তির কথাতেই পরিপূর্ণ।

যদিও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামধর্ম্ম এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আমি সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছি, তথাপি দৃঢ়তার জন্য এই খণ্ডেও কিছু কিছু বর্ণিত হইল। আপনারা পাঠ করুন, কৃতার্থ হইবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামধর্ম্ম

পরিব্রাজক-চূড়ামণি দণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী কাশীধামে শিষ্যগণকে বেদান্ত পড়াইতেছেন, এমন সময় এক বিপ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা উত্থাপন করিলেন। তাহাতে স্বামীজি হাঁসিয়া বলিলেন—

"শুনিয়া প্রকাশানন্দ বহুত হাঁসিলা।
বিপ্রে উপহাস করি কহিতে লাগিলা॥
শুনিয়াছি গৌড় দেশে সন্ন্যাসীভাবক।
কেশব ভারতী শিষ্য লোক প্রতারক॥
চৈতন্য নাম তার ভাবকগণ লঞা।
দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে লোক নাচাইয়া॥
যেই তারে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে।
ঐছে মোহনবিদ্যা যে দেখে সে মোহে॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত প্রবল।
শুনি চৈতন্যের সঙ্গে হইলা পাগল॥
সন্ন্যাসী নাম মাত্র মহা ইন্দ্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালি॥
বেদান্ত শ্রবণ কর না যাইও তার পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুই লোক নাশ॥"

এই ঘটনার কিছুদিন পরে শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক বিপ্র তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন বাটিতে লইয়া গেলেন। সেই স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া কাশীবাসী অনেক সন্ন্যাসী উপস্থিত হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসিগণ মহাপ্রভুর প্রভাব

দেখিয়া বিমোহিত হইলেন, তাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়া আসন ছাড়িয়া উঠিলেন এবং শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন।

"প্রকাশানন্দ নামে সর্ব্ব সন্ন্যাসী প্রধান।
প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান॥
ইহা আইস ইহা আইস শুনহ শ্রীপাদ।
অপবিত্র স্থানে বৈস কিবা অবসাদ॥
প্রভু কহেন আমি হই হীন সম্প্রদায়।
তোমা সবার সভায় বসিতে না যুয়ায়॥
আপনি প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া।
বসাইলা সভা মধ্যে সম্মান করিয়া॥
পুছিল তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
কেশব ভারতীর শিষ্য তাতে তুমি ধন্য॥
সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে।
কি কারণে আমা সবার না কর দর্শনে॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন।
ভাবক সব সঙ্গে লইয়া কর সংকীর্ত্তন॥
বেদান্ত পঠন প্রধান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কেন কর ভাবকের কর্ম্ম॥
প্রভাবে দেখি যে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেন কি ইহার কারণ॥

এই কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বলিলেন—

প্রভু কহে শ্রীপাদ শুন ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন॥

মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার ।।
কৃষ্ণ নাম হইতে হবে সংসার মোচন ।
কৃষ্ণনাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ।।
নাম বিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম ।
সর্ব্ব মন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম ।।
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে ।
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করহ বিচারে ।।

তথাহি বৃহন্নারদীয় বচনং

হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ।।

কলিযুগে কেবলমাত্র হরিনাম, হরিনাম, হরিনামই ।
ইহা ছাড়া আর গতি নাই-ই, নাই-ই নাই-ই ।।

"এই আজ্ঞা পেয়ে নাম লই অনুক্ষণ ।
নাম লইতে লইতে মোর ভ্রান্ত হইল মন ।।
ধৈর্য্য করিতে নারি হইলাম উন্মত্ত ।
হাসি কান্দি, নাচি গাই যৈছে মদোন্মত্ত ।।
তবে ধৈর্য্য করি মনে করিল বিচার ।
কৃষ্ণ নামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার ।।
পাগল হইলাম আমি ধৈর্য্য নাহি মনে ।
এত চিন্তি নিবেদিল গুরুর চরণে ।।
কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার বল ।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ।।
হাঁসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন ।

এত শুনি গুরু হাঁসি বলিলা বচন ॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয় ভাব ॥
কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেম পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দমৃত সিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥
কৃষ্ণ নামের ফল প্রেম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেম তোমায় করিল উদয় ॥
প্রেমের স্বভাব করে চিত্ত তনু ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্তে উপজয়ে লোভ ॥
প্রেমের স্বভাবে ভক্ত হাসে কাঁদে গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায় ॥
স্বেদ কম্প রোমাঞ্চ গদ্গদ বৈবর্ণ।
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য ॥
এত ভাবে প্রেম ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃত সাগরে ভাসায় ॥
ভাল হইল পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হইলাম কৃতার্থ ॥
নাচ গাও ভক্ত সঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি তার ত্রিভুবন ॥
তাঁর এই বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করি ॥
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়।

গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায় ॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দ সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খদ্যোতক সম ॥

এই সকল কথার পর প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত অতি সদ্ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শাস্ত্রীয় বিচার হইতে লাগিল। প্রকাশানন্দ সরস্বতী বিচারে পরাস্ত হইয়া সশিষ্যে মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইলেন। এই প্রকাশানন্দ সরস্বতী পরে প্রবোধানন্দ নাম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর ভক্তগণ মধ্যে ইনি এক জন পরম শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

এই যে "হরের্নামৈব কেবলম্" ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম। ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কলির জীবের পক্ষে আর ইহা অপেক্ষা কিছুই সহজ ধর্ম্ম হইতে পারে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু অবস্থা দেখিয়াই ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মে অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস নাই। উর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে তপস্যা করিতে হয় না। পঞ্চতপা হইতে হয় না। অগ্নিতে জলেতে শীতে বা গ্রীষ্মে কোন প্রকার কৃচ্ছ্র সাধন করিতে হয় না। কোন উদ্যোগ নাই, আয়োজন নাই, কোন অর্থব্যয় নাই। মানুষকে কোন প্রকার প্রয়াস পাইতে হয় না। ইহা অপেক্ষা আর সহজ ধর্ম্ম কি হইতে পারে? এখানে কেবল পেট ভরিয়া খাও, আর বসে বসে হরিনাম কর। মানুষ এতেও যদি পরাঙ্মুখ হয় তবে নাচার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হরের্নামৈব কেবলম্

ভগবান যেমন বাক্যমনের অতীত, তেমনি তিনি নামরূপেরও

করা হয়, তাঁহাকে ছোট করা হয়। কৃষ্ণ বলিলে তিনি কালী নন, দুর্গা নন, রাম নন, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ইত্যাদি কিছুই নন, এসব ছাড়া আর কিছু বুঝিতে লইবে। সিংহ বলিলে বাঘ নয়, গণ্ডার নয়, গরুমহিষ প্রভৃতি কিছুই নয়, এসব ছাড়া আর কিছু বুঝিতে হইবে। এজন্য যাহাতে নাম অর্পিত হয় তাহাই সীমাবদ্ধ হয়, তাহাই ছোট হইয়া যায়। ভগবান অসীম অনন্ত এই কারণ তাহার কোন নাম হইতে পারে না।

এসব দর্শন-শাস্ত্রের কথা। দার্শনিক পণ্ডিতেরাই বলিয়া থাকেন, ভগবান অচিন্ত্য অব্যক্ত। তাঁহারাই বলেন, ভগবান নামরূপের অতীত। এসব ভক্তের মুখের কথা নহে।

ভগবান অচিন্ত্য হইলেও ভক্তের চিন্তার বিষয়। তিনি অব্যক্ত হইলেও ভক্তের নিকট ব্যক্ত। তিনি অসীম হইলেও ভক্তের নিকট সসীম, তিনি অনন্ত হইলেও ভক্তের নিকট সান্ত, অরূপ হইলেও পরম রূপবান, বৃহৎ হইলেও ক্ষুদ্র। ভক্ত দর্শনশাস্ত্রের কথা মানে না।

ভক্তগণ নিজেদের উপাসনা জন্য আপন আপন রুচি-অনুসারে সেই অনামা পুরুষের নামকরণ করিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে কৃষ্ণ বলেন, কেহ তাঁহকে কালী বলেন, কেহ দুর্গা বলেন, কেহ শিব বলেন, কেহ গণেশ বলেন, আবার কেহ আল্লা, কেহবা জিহবা বলিয়া সম্বোধন করেন।

ভগবানের উদ্দেশে যিনি যে নামে তাঁহাকে ডাকেন, সেই নামে ভগবানকেই বুঝায়, ভগবানকেই ডাকা হয়, পাঁচটা ছেলের মধ্যে যে ছেলেটার নাম যদু, যদু বলিলে যেমন তাহাকেই বুঝায়, শ্যামাচরণ রামচরণ ইত্যাদিকে বুঝায় না, ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া যিনি যে নামে তাঁহাকে ডাকেন, সেই নামে ভগবানকেই ডাকা হয়।

এই যে মহাপ্রভু বলিয়াছেন "হরের্নামৈব কেবলম্" ইহাতে এমন বুঝিতে হইবে না যে হরি নামই নাম, অন্য নাম হরিনাম নহে। যিনি

যে নামে ভগবানকে ডাকেন, যে নামে জীব-উদ্ধার হইয়া যায়, তাঁহার পক্ষে সেই নামই হরিনাম।

শাক্ত সম্প্রদায়ের লোক ভগবতীকে যে কালী বা দুর্গানামে ডাকেন, এই নামই তাহাদের পক্ষে হরিনাম। মুসলমানগণ ভগবানকে যে আল্লা বলিয়া ডাকেন, এই আল্লা নামই তাঁহাদের পক্ষে হরিনাম।

এই কথা শুনিয়া হয়ত আমার বৈষ্ণব শ্রোতৃগণ আমার উপর চটিয়া যাইবেন, আমাকে অবৈষ্ণব বলিয়া আমার নিন্দা করিবেন, কিন্তু আমি কি করিব? যাহা সত্য, যাহা মন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম, তাহা আমাকে বলিতেই হইবে। সম্প্রদায়ের অনুরোধে আমিত কোন কথা গোপন করিতে পারিব না। যাহা সত্য, তাহা নির্ভীক হইয়া বলিব, কাহারও মুখের দিকে চাহিব না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম অতি উদার। ইহা জাতিবিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্ম্ম নয়। পৃথিবীর যাবতীয় জাতি, পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক, এই ধর্ম্মের অধিকারী। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে কেবল বৈষ্ণবগণকে এই ধর্ম্ম দিয়া গিয়াছেন, তাহা আপনারা মনে করিবেন না। ভগবানের নিকট কোন দল নাই, কোন সম্প্রদায় নাই, পৃথিবীর সমস্ত নরনারী তাঁহার নিকট সমান। মহাপ্রভু করুণাপরবশ হইয়া জগতের কল্যাণের জন্য সমস্ত নরনারীকে অনর্পিত ধর্ম্ম প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নামের পার্থক্য

আজ আমি আপনাদিগকে অতি নিষ্ঠুর কথা শুনাইব। যে কথা কেহ কখনও বলে নাই, যে কথা কেহ কখনও শুনে নাই, শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন

করিয়াও যে কথা টের পাইবার উপায় নাই, আজ আমি সেই কথা আপনাদিগকে শুনাইব। নামের পার্থক্য প্রকাশ করিয়া দিব।

কথাটা আমি বহুকাল চাপিয়া রাখিয়াছিলাম, কাহাকেও ঘুণাক্ষরে টের পাইতে দিই নাই। যখন আমি "মহাপাতকীর জীবনে সদ্গুরুর লীলা" নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলাম, তখন আমার ধর্ম্মবন্ধুগণের নিকট এই কথাটা উঠিয়াছিল।

তাঁহারা সকলেই আমাকে একবাক্যে একথাটা গোপন করিতে বলিয়াছিলেন। কারণ ভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

কদাচ অবিবেকী কর্ম্মাসক্ত লোকদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না, প্রত্যুত অনাসক্তভাবে স্বয়ং ঐ সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করতঃ তাহাদিগকেও কর্ম্মেতেই যোজিত করিবে।

মানুষের বুদ্ধিভেদ জন্মাইলে তাহাদের কোন উপকার করা যায় না, বরং তাহাদের নিজ নিজ কর্ম্মে অনাস্থা জন্মাইয়া দিয়া অপকারই করা হয়।

একথা আমি অনেকদিন চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি। সহসা অবিবেচনাপূর্ব্বক নামের পার্থক্য বর্ণন করিতে অগ্রসর হই নাই।

শাস্ত্রকারগণ নামাভাসে মুক্তি পর্য্যন্ত বর্ণন করিয়াছেন। নাম শুদ্ধ, অশুদ্ধ ব্যবহিত অথবা কোন অংশে রহিত হইলেও ক্ষতি নাই, একথা পর্য্যন্ত বলিয়াছেন। এমতাবস্থায় আমি কি করিয়া নামের পার্থক্য বর্ণন করিব?

নামের পার্থক্য বর্ণন করিলে আমার কি নামাপরাধ হইবে না? শাস্ত্রশাসন যেরূপ তাহাতে নামাপরাধ হইবারই কথা। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া এতকাল চুপ করিয়া ছিলাম।

সত্য গোপন করাও মহাপরাধ। সত্যগোপনে অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ধর্ম্মজগতে ইহা মানুষের পক্ষে ঘোরতর অনিষ্টকারী। মানুষ আজীবন বহু আয়াসে ধর্ম্মসাধন করিয়া অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত তুষার-ঘাতীর ন্যায় বিফল-মনোরথ হইতেছে, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? শাস্ত্রকারগণ নামের পার্থক্য যে বর্ণন করেন নাই এমতও নহে, এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি প্রথম খণ্ডেও কিছু কিছু নামের পার্থক্য বর্ণন করিয়াছি, এবার এবার একটু বিশদভাবে বর্ণন করিলাম।

যদিও ভগবানের সকল নামই এক, নামের প্রভেদ করা উচিত নয়, তথাপি পুরাণকর্ত্তা ও গোস্বামিপাদগণ প্রকারান্তরে নামের পার্থক্য বর্ণন করিয়াছেন।

পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে—

রাম রামেতি রামেতি রমে! রামে! মনোরমে!
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে!

মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিলেন, হে মনোরমে! তুমি রাম এই নাম শ্রবণ কর। হে বরাননে! সহস্র নামের তুল্য এক রামনাম।

আবার ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে লিখিত হইয়াছে—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি

পবিত্র সহস্র নামের তিনবার পাঠে যে ফল হয়, কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধীয় যে কোন নাম একবার পাঠে সেই ফল প্রদান করে। শ্রীরূপগোস্বামী পদ্যাবলীতে শ্রীকৃষ্ণনাম-মহিমায় মহাপ্রভুর বাক্য উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

চেতো দর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম।
আনন্দাম্বুবির্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতস্বাদনং।
সর্ব্বাত্মস্নাপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

যাহা চিত্তরূপ দর্পণের মালিন্য অপসারণ করে, যাহা সংসাররূপ দাবাগ্নির নির্ব্বাণকর, যাহা পরমমঙ্গল পরাবিদ্যারূপ বধূর প্রাণস্বরূপ, যাহা শ্রবণ করিলে সুখসাগর উদ্বেল হইয়া উঠে, যাহার পদে পদে অমৃত আস্বাদ পূর্ণরূপে বিরাজমান, যাহা আত্মাকে রসতরে স্নাত করাইয়া অভূতপূর্ব্ব প্রীতিসুখ প্রদান করে, সেই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন জয়যুক্ত হউক।

এমন যে শ্রীকৃষ্ণনাম, কবিরাজ গোস্বামী ইহা অপেক্ষাও নিতাই-চৈতন্য নামের মাহাত্ম্য অধিক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তিনি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদি লীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণ নাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিতে অপরাধীর না হয় বিকার॥
এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্ব পাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ কম্প পুলকাদি গদ্গদাশ্রুধার॥
অনায়াসে ভব ক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ নামের ফল পাই এত ধন॥
হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণ নাম বীজ তাহা না হয় অঙ্কুর॥

চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥

আপনারা এই যে নামের পার্থক্য দেখিতেছেন, প্রকৃতপক্ষে এসব পার্থক্য নহে। নামের প্রতিপাদ্য বস্তু একমাত্র ভগবান, যিনি যে নামে ডাকেন সেই ভগবানকেই ডাকেন। নামের লক্ষ্য এক থাকায় নামের ফলের তারতম্য হইতে পারে না। এই যে তারতম্য এসব সাম্প্রদায়িকতা মাত্র।

নামের পার্থক্য আপনাদিগকে বলিতেছি শ্রবণ করুন।

নাম দুই প্রকার, শক্তিশালী ও শক্তিহীন। যে নামে ভগবৎ-শক্তি আছে, সেই নাম শক্তিশালী আর যাহাতে সে শক্তি নাই তাহা শক্তি-হীন।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ গুরুগণ, শিষ্যকে যে নাম প্রদান করেন ও যে সকল নাম সাধারণতঃ লোকে জপ করে সে সমস্ত নামই শক্তিহীন।

এখন জনসমাজে এমন একটি লোকও দেখিতে পাই না, যিনি নাম শক্তি-সমন্বিত (নামীকে অর্পণ) করিতে সমর্থ। পাহাড়, পর্ব্বত, বন, জঙ্গলে যে দুই একজন মহাত্মা আছেন, তাহাদের সহিত জনসাধারণের কোন সম্বন্ধ নাই। শক্তিশালী গুরুর অভাবে লোকে শক্তিহীন নাম লইয়া সাধনভজন করিতেছেন। সেই জন্য আশানুরূপ ফল পাইতেছেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু দৈন্য করিয়া শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমাদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

হে ভগবান ! তোমার এরূপ করুণা যে তদীয় নাম সমূহে তুমি বহুধা স্বশক্তি নিহিত করিয়াছ, এবং সেই সকল নাম স্মরণার্থ অনেক অবসরও দিয়াছ, কিন্তু আমার এমনি দুরদৃষ্ট যে সেই নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না।

শ্রীরূপগোস্বামী পদ্যাবলীতে নামমাহাত্ম্যে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাহা হইতে কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই শ্লোক তুলিয়াছেন। এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারায় বৈষ্ণবসমাজের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে।

এই শ্লোক পাঠ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মনে করেন, ভগবান তাঁহার যাবতীয় নামে আপনার সমস্ত শক্তি স্বতঃই অর্পণ করিয়া রাখিয়াছেন। একারণ তাঁহারা গুরুদত্ত নাম বড় একটা জপ করেন না, কেহ তিনবার, কেহ সাতবার, উর্দ্ধসংখ্যায় কেহ একশত আট বার, জপ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন, যখন ভগবানের সকল নামেই ভগবৎ-শক্তি নিহিত আছে, তখন গুরুদত্ত নামের আর বিশেষত্ব কি ? তাহারা এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া যে কেবল দীক্ষামন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছেন তাহা নহে, দীক্ষাগুরুর সহিতও এক প্রকার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন তাঁহাদের যত কিছু সম্বন্ধ শিক্ষাগুরুর সহিত।

আবার শাস্ত্রে নামমহিমার তারতম্য দেখিয়া তাঁহারা গুরুদত্ত নামের পরিবর্ত্তে তারকব্রহ্ম-হরিনাম অর্থাৎ ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর জপ করেন।

গুরুর নিকট দীক্ষা লইবার একটা চিরপ্রথা আছে বলিয়াই তাঁহারা দীক্ষাগুরুর নিকট নামমাত্র একটা দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করেন।

প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কোন নামেই ভগবান কর্ত্তৃক তাঁহার শক্তি

অর্পিত হয় নাই। তাঁহার যাবতীয় নাম ভগবৎশক্তিবিহীন। ভগবানের নামে তাঁহার কর্তৃক স্বতঃই শক্তি অর্পিত আছে মনে করা মহাভ্রান্তি।

এক মাত্র সদ্‌গুরুই নামে ভগবৎ-শক্তি অর্পণ করিতে সমর্থ। ভগবানের ইঙ্গিতে তিনিই শক্তি অর্পণ করেন এবং শিষ্যের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে শক্তিশালী নাম প্রদান করেন। এ ক্ষমতা যাহাঁর-তাহার নাই। সাধারণ গুরুর সাধ্য কি যে শিষ্যের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করেন, অথবা শক্তিশালী নাম প্রদান করেন; একমাত্র শক্তিশালী নাম-সাধনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম। অন্য কিছু নহে।

শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী, নামে ভগবৎ-শক্তি অর্পণ করিয়া মহাপ্রভুকে দশাক্ষরী মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শক্তিশালী নাম পাইয়াছিলেন। একারণে তিনি শক্তিশালী নামের ঐরূপ মহিমা বর্ণন করিয়াছিলেন, উহা দ্বারা মনে করিতে হইবে না যে ভগবানের সমস্ত নামই শক্তি সম্পন্ন।

শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর নিকট নাম পাইবামাত্র মহাপ্রভু নামের শক্তিতে অভিভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল। শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মহাপ্রভুর প্রেমপ্রকাশ এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন; মহাপ্রভু প্রেমে বিহ্বল হইয়া কাঁদিতেছেন—

"কৃষ্ণরে বাপরে! মোর জীবন শ্রীহরি।
কোন দিকে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি॥
পাইলো ঈশ্বর মোর কোন্ দিগে গেলা।
শ্লোক পড়ি পড়ি প্রভু কাঁদিতে লাগিলা॥
প্রেমভক্তি রসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর।
সকল শ্রীঅঙ্গ হইল ধুলায় ধূসর॥
আর্ত্তনাদ করি প্রভু ডাকে উচ্চৈস্বরে।

কেথা গেলা বাপ কৃষ্ণ ছাড়াইয়া মোহারে ॥
যে প্রভু আছিলা অতি পরম গম্ভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির ॥
গড়াগড়ি যায়েন কাঁদেন উচ্চৈস্বরে।
ভাসিলেন নিজ ভক্তি বিরহ-সাগরে ॥

শ্রীধাম নবদ্বীপে মহাপ্রভুর অবস্থা দেখিয়া শচীমাতা বিলাপ করিতেছেন—

বিধাতারে স্বামী নিল, নিল পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে এক জন ॥
তাহারও কিরূপ মতি বুঝন না যায়।
ক্ষণে হাঁসে, ক্ষণে কাঁদে, ক্ষণে মূর্চ্ছা যায় ॥
আপনে আপনে কহে মনে মনে কথা।
ক্ষণে বলে ছিণ্ডো ছিণ্ডো পাষণ্ডীর মাথা ॥
ক্ষণে গিয়া গাছের উপর ডালে চড়ে।
না মেলে লোচন, ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে ॥
দন্ত কড়মড়ি করে, মালসাট মারে।
গড়াগড়ি যায়, কিছু বচন না স্ফুরে ॥"
নাহি শুনে দেখে লোক কৃষ্ণের বিকারে।
বায়ুজ্ঞান করি লোক বোলে বান্ধিবারে ॥
শচী মুখে শুনি যায় যে যে দেখিবারে।
বায়ু জ্ঞান করি লোক বোলে বান্ধিবারে ॥
পাষণ্ডী দেখিয়া প্রভু খেদাড়িয়া যায়।
বায়ু জ্ঞান করি, লোক হাঁসিয়া পলায় ॥
আস্তে ব্যস্তে মায়ে গিয়া আনয়ে ধরিয়া।
লোকে বলে পূর্ব্ব বায়ু জন্মিল আসিয়া ॥

লোকে বলে তুমিত অবোধ ঠাকুরাণি।
আর বা ইহার বার্ত্তা জিজ্ঞাসহ কেনি॥
পূর্ব্বগ্রহের বায়ু আসি জন্মিল শরীরে।
দুই পায়ে বন্ধন করিয়া রাখ ঘরে॥
খাইবারে দেহ ডাবু নারিকেলের জল।
যাবত উন্মাদ বায়ু নাহি করে বল॥
কেহ বলে ইথে অল্প ঔষধে কি করে।
শিবা ঘৃত প্রয়োগে সে এবায়ু নিস্তারে॥
পাক তৈল শিরে দিয়া করাইবে স্নান।
যাবত প্রবল নাহি হইয়াছে জ্ঞান॥
পরম উদার শচী জগতের মাতা।
যার মুখে যেই শুনে কহে সেই কথা॥
চিন্তায় ব্যাকুল শচী কিছু নাহি জানে।
গোবিন্দ শরণে গেলা কায় বাক্য মনে॥”

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ম ২ অধ্যায়

কলিকাতা কলেজষ্ট্রীটের পুস্তক বিক্রেতা বাবু জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র হালদারের নাম অনেকেই জ্ঞাত আছেন। আমার প্রভু (প্রভুপাদ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী) তাঁহার মাতাকে কলিকাতায় সীতানাথ ঘোষের ষ্ট্রীটে ১৪।২ নম্বর বাটিতে দীক্ষা দিয়াছিলেন। মন্ত্রপ্রদান মাত্র জ্ঞানবাবুর মাতা নামের শক্তিতে অভিভূত হইলেন। তিনি সংজ্ঞাশূন্যা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন জন্য গুরুদেব তাঁহাকে নাম শুনাইতে লাগিলেন এবং বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষের মাতা ও আপন জামাতা ভক্তিভাজন জগদ্বন্ধু মৈত্রকে জ্ঞান বাবুর মাতার পিঠের শিরদাঁড়াটা উপর দিক হইতে নীচের দিকে দলিতে বলিলেন।

তাঁহারা বহুক্ষণ ঐরূপ করিলে নাম শুনাইতে শুনাইতে জ্ঞানবাবুর মায়ের সংজ্ঞা লাভ হইল। তিনি অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে গুরুকে বলিলেন—

—আমি অতি রমণীয় সুখকর স্থানে গমন করিয়াছিলাম, সেখানে পরম সুখে ছিলাম। আপনি সেস্থান হইতে কেন আমাকে এখানে আনিলেন?

গুরু—যদি পাহাড়, পর্ব্বত, বনজঙ্গলের মধ্যে এ ঘটনা ঘটিত, তাহা হইলে তোমাকে ফিরাইয়া না আনিলেও চলত। কিন্তু এটা পাহাড় পর্ব্বত, বন, জঙ্গল, বা জনশূন্য স্থান নহে। এটা কলিকাতা সহর। চারিদিকে পুলিশ-প্রহরী ঘুরিতেছে। তোমাকে দেহের মধ্যে ফিরাইয়া না আনিলে পুলিশের লোক মনে করিত, আমরা দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া তোমাকে হত্যা করিয়াছি। এখন কিছু দিন এখানে থাক, সাধনভজন কর, পরে আবার সেই রমণীয় স্থানেই গমন করিবে।

গোস্বামী মহাশয় নাম দিবা মাত্র অধিকাংশ স্থলেই, নামের শক্তিতে শিষ্যগণ অভিভূত হইতেন। তাঁহাদের বিবিধ অঙ্গচেষ্টা হইত। আমি ইহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। কুলীন গ্রামবাসিগণের দীক্ষার ব্যাপারটা আমি "মহাপাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুর লীলা" নামক গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছি। নাম শক্তিশালী হইলে শক্তির ক্রিয়া প্রায়ই শিষ্য অনুভব করিয়া থাকে।

যাঁহারা মনে করেন, ভগবানের সমস্ত নামেই ভগবান আপন শক্তি স্বতঃই অর্পিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত।

দার্শনিক পণ্ডিতগণ ভগবানের নাম আদৌ স্বীকার করেন না। ভক্তেরা উপাসনার জন্য আপন আপন রুচি-অনুসারে ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন। নামে ভগবৎ-শক্তি কোথা হইতে আসিবে? এসব ভ্রান্তবিশ্বাস।

নামের পার্থক্য ও শ্রীকৃষ্ণ নামের মহিমা দেখাইবার জন্য কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণনাম "দীক্ষা পুরশ্চরণের অপেক্ষা না করে"। এই পাঠ, পাঠ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মনে করেন, দীক্ষার আবশ্যকতা নাই, তাহা হইলেও হয়, না হইলেও হয়। ইহাতে এই ফল হইতেছে যে, দীক্ষাগুরু ও দীক্ষামন্ত্রের প্রতি তাঁহাদের ঔদাসীন্য জন্মিয়াছে।

সদ্‌গুরুর মুখে যখন শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ করা যায়, তখনই দীক্ষা পুরশ্চরণের আবশ্যক হয় না, নতুবা দীক্ষা ও পুরশ্চরণের আবশ্যকতা আছে। একথাটি সকলের জানা কর্ত্তব্য।

সদ্‌গুরু সুদুর্ল্লভ। একারণ শাস্ত্রীয় বিধি মানিয়া সকলের চলা উচিত।

যদিও কবিরাজ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণনাম অপেক্ষা নিতাইচৈতন্য নামের মাহাত্ম্য অধিক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তথাপি বৈষ্ণবসমাজ বহুকালের প্রথা পরিত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা হরেকৃষ্ণ নামই জপ করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠ দেখিয়া, অধুনা চরণদাস বাবাজী মহাশয় হরেকৃষ্ণ নামের পরিবর্ত্তে নিতাইগৌর নাম চালাইতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনাম একেবারে ত্যাগ করিতে সাহসী হন নাই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে চরণদাস বাবাজীর যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তাঁহার দলস্থ লোকের সংখ্যাও কম নয়। তাঁহারা হরেকৃষ্ণ নামের পরিবর্ত্তে "নিতাইগৌর রাধাশ্যাম, হরেকৃষ্ণ হরেনাম" এই নাম জপ করিয়া থাকেন।

আপনারা এই যে নামের পার্থক্য দেখিতেছেন, এসব কিছুই নয়। শক্তিহীন সকল নামই সমান, ইহার ফলাফলও সমান।

ভগবানের বহুবিধ নাম প্রবর্ত্তিত আছে। নামের ফলাফল সমান

হইলেও গুরুগণ শিষ্যকে রুচি ও প্রকৃতি-অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া থাকেন। এবিষয়ে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা মানিয়া সকলের চলা উচিত।

শক্তিহীন নামে নামাপরাধ আছে। সুতরাং * অপরাধবর্জ্জিত হইয়া নাম করিতে হয়।

অপরাধের সহিত নাম করিলে, নামের ফল আদৌ পাওয়া যায় না, অধিকন্তু নামকারীকে নিরয়গামী হইতে হয়। সুতরাং সকলের সাবধানে নাম করা কর্ত্তব্য।

যাঁহারা শক্তিহীন নাম সাধন করেন, তাঁহাদিগকে শুচি হইয়া বিশুদ্ধ

---

* অপরাধ দুই প্রকার, সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। যাঁহারা ভগবৎসেবা দৈনন্দিন স্তোত্র পাঠ দ্বারা তাঁহাদের সেবাপরাধ ক্ষয় হইয়া থাকে, কিন্তু নামাপরাধের কোন ক্রমে ক্ষয় হয় না। একারণ ইহা ভগবদ্ভক্তির একান্ত বিঘ্নকারী। নামাপরাধ দশ প্রকার।

১। সাধুনিন্দা।

২। শিবের সত্ত্বা, নাম, গুণ প্রভৃতি শ্রীনারায়ণ হইতে পৃথক জ্ঞান করা।

৩। শ্রীগুরুকে অবজ্ঞা অর্থাৎ সামান্য মনুষ্য বোধ করা।

৪। হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা, অর্থাৎ হরিনামের মহিমা সকলকে কেবল প্রশংসা মাত্র মনে করা।

৫। বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দা।

৬। নামের বলে পাপে প্রবৃত্তি।

৭। ধর্ম্ম ব্রত দান প্রভৃতি শুভকর্ম্মের সহিত শ্রীহরিনামের তুলনা।

৮। শ্রদ্ধাহীন, বিমুখ, এবং যে শুনিতে অনিচ্ছুক তাহাকে নাম করিতে উপদেশ দেওয়া।

অন্তঃকরণে, পবিত্রভাবে নাম করিতে হয়। নামের উপর্যুক্ত মর্য্যাদা না দিলে নাম ফলপ্রদ হন না।

অশ্রদ্ধা বা অপরাধযুক্ত হইয়া নাম করিলে নামসাধককে নিরয়গামী হইতে হয়, ইহাই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা।

ভগবান শক্তিরূপে সমস্ত বিশ্বে ওতপ্রোত হইয়া লীলা করিতেছেন। মানুষের মধ্যেও তিনি শক্তিরূপে বিরাজমান আছেন।

সদ্‌গুরু কৃপা করিয়া নামে যখন শক্তিরূপী ভগবানকে অর্পন করেন, তখনই নাম শক্তিশালী হইয়া উঠে, নাম ও নামী এক হইয়া যায়। এই জন্যই নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥

নামে শক্তি অর্পিত হইবার পূর্ব্বে নাম ও নামী সম্পূর্ণ পৃথক জানিবেন।

নামে শক্তি অর্পিত হইলে নাম যে সাধারণভাবে শক্তিশালী হইয়া উঠিবে তাহা নহে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনামে যদি সদ্‌গুরু শক্তি অর্পণ করেন, তাহা হইলে ঐ নাম যে সকলের পক্ষে শক্তিশালী হইবেন, তাহা নহে। গুরু যাঁহাকে নাম প্রদান করেন, কেবল তাঁহারই সম্বন্ধে ঐ নাম শক্তিশালী হইবে অন্যের পক্ষে হইবে না।

নামে শক্তি অর্পণ করাকেই নামের চৈতন্য-সম্পাদন বলে। নামে

৯। নামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নামে প্রবৃত্ত না হওয়া।

১০। নামে অহংমমতাপর হওয়া অর্থাৎ আমি বহুতর নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকি এবং ইতস্ততঃ নামকীর্ত্তন প্রচার করিতেছি, আমি যে পরিমাণ করিয়া থাকি, এইরূপ আর কেহ করিতে পারে না, নাম আমার জিহ্বার অধীন ইত্যাদি মনে করা।

চৈতন্যরূপী ভগবান বর্ত্তমান না হইলে নাম অচেতন অবস্থাতেই থাকে। এই জন্য শক্তিহীন নামসাধনে তাদৃশ ফল লাভ হয় না।

শক্তিহীন নাম জপে যদি উপযুক্ত ফললাভ হইত, তাহা হইলে গুরু-করণের ব্যবস্থাটা থাকিত না। লোকে ইচ্ছামত কেবল নাম জপ করিয়াই সাধ্য বস্তু লাভ করিতে পারিত।

ভগবানকে লাভ করিতে হইলে শক্তিশালী নাম সাধন করা একান্ত আবশ্যক। ইহা ভগবানের অব্যর্থ নিয়ম। ইহা ব্যতীত ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়ান্তর নাই জানিবেন।

শক্তিহীন নাম জপে ভগবৎ-প্রাপ্তি না হইলেও বহু উপকার আছে। ইহাতে গুরুকরণের একটা চিরপ্রথা রক্ষিত হইতেছে। লোকে নিষ্ঠা-পূর্ব্বক নাম সাধন করিলে চরিত্র গঠিত হয়, জীবন উন্নত হয়, মন পবিত্র হয়, এবং ভবিষ্যতে শক্তিশালী নাম লাভ করিবার অধিকার জন্মে। ভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

শ্রীভগবদ্গীতা, অধ্যায় ১০

যাহারা যোগযুক্ত হইয়া আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে এরূপ জ্ঞান দিই যাহাতে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে।

সুতরাং কাহারও নৈরাশ হইবার কারণ নাই। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শক্তিহীন নাম জপ করিলে, সময়ে ভগবান এমন উপায় করিয়া দিবেন, যাহাতে সাধকের সদ্‌গুরু লাভ হইবে এবং তাঁহার নিকট শক্তিশালী নাম পাইয়া ভগবানকে লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

শক্তিশালী নামে নামাপরাধ নাই। অপরাধ-বর্জ্জিত হইয়া নাম করিতে না পারিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না, কারণ বস্তু শক্তি কোথায়

যাইবে? বস্তুশক্তি আপন কাজ করিবেই করিবে। উহা কিছুতেই নষ্ট হয় না।

এই নামসাধনে শৌচ অশৌচ নাই, কালাকাল নাই, স্থানাস্থান নাই। আহার, বিহার, খেলাধূলা, শৌচ, প্রস্রাব সকল সময়েই নাম করা যাইতে পারে।

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্, ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ হরের্নামনি লুব্ধক॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর

নামের পার্থক্য বর্ণন করিলে পাছে আমার নামাপরাধ হয় ও লোকের অনিষ্ট ঘটে, এই আশঙ্কায় আমি একাল পর্য্যন্ত নামের পার্থক্য মুখফুটে প্রকাশ করি নাই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দারুণ কর্ত্তব্যের অনুরোধে নামের পার্থক্য বর্ণন করিয়াছি।

নামের পার্থক্য বর্ণন করায়, নামের নিকট আমার যদি কোন অপ-রাধ হইয়া থাকে, আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন নাম যেন আমার সে অপরাধ ক্ষমা করেন। আমি নামের নিকটও করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমার প্রতি তাঁহার যে দয়াটুকু আছে, তাহাতে যেন বঞ্চিত না হই।

আমি অতি সদ্ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, জনসমাজের বিশেষ ধর্ম্মজগতের কল্যাণসাধন কামনায় এই অতি গোপনীয় কথা প্রকাশ করিয়া দিলাম। ইহাতে আপনাদের কাহারও অন্তরে যদি ব্যথা লাগে বা নিষ্ঠার হানি হয়, তিনি যেন আমাকে নিজগুণে ক্ষমা করেন। তাঁহারা যদি শক্তিশালী নাম পাইবার প্রয়াসী হন, তাহা হইলে ইহাতে তাঁহাদের উপকারও হইবে।

নামের পার্থক্য বর্ণনা করায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে আমার নিন্দিত

হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আমার ধর্ম্মবন্ধুগণও এসব কথা প্রকাশে আমার ঘোর বিরোধী।

ধর্ম্ম অপেক্ষা অধিক আদরের ও আবশ্যক জিনিস এজগতে কিছু নাই। একারণ দলের খাতির করিয়া চলা, লোকের মুখাপেক্ষা করা, আমার মতে অনুচিত।

অদৃষ্টে যাহাই হউক, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিব, তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইব না, ইহাই আমার প্রকৃতি। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন সত্যকে অবলম্বন করিয়া যেন জীবনের শেষ কয়টা দিন কাটাইতে পারি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নামের স্বরূপ ও মহিমা।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবং ॥

যাঁহার কৃপায় মূকও শাস্ত্রীয় কথা কহিতে সমর্থ হয়, খঞ্জ ব্যক্তি পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়, সেই পরমানন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি।

একমাত্র হরের্নামই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম, এই কথা বলা হইয়াছে। নামের স্বরূপ ও মহিমা না বলিলে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম বলা হইবে না; লোকেও বুঝিতে পারিবে না। একারণ নামের স্বরূপ ও মহিমা বলা একান্ত প্রয়োজন। আমার মত লোকের একার্য্যে হস্তক্ষেপ করা ধৃষ্টতা মাত্র। এজগতে এমন কে আছেন যিনি নামের স্বরূপ ও মহিমা সম্যক বর্ণন করিতে পারেন ?

নামের স্বরূপ ও মহিমা অচিন্ত্য ও অব্যক্ত, ইহা বর্ণন করিবার

কাহারও সাধ্য নাই। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল, সদ্‌গুরু কৃপা করিয়া আমাকে ভগবানের অমূল্য নাম প্রদান করিয়াছেন। আমি এই দীর্ঘ-কাল নামের সহবাসে থাকিয়া, তাঁহার কৃপায় তাঁহার মহিমা যতটুকু টের পাইয়াছি ও গুরুমুখে যাহা শুনিয়াছি আজ তাহাই আপনাদিগের নিকট বর্ণন করিতেছি।

নাম সৎ পদার্থ, ইহা শূন্য নয়। শব্দের ন্যায় ইহা অবস্তুও নহে।

নাম নিত্য, ইনি চিরকাল বর্ত্তমান আছেন। নাম বিশুদ্ধ, ইঁহাতে কোন মলিনতা নাই।

নাম ভগবৎ-শক্তি, সুতরাং নাম এবং নামী অভিন্ন।

নাম জীবন্ত। ইহা অচেতন পদার্থ নহে। অচেতন পদার্থ দ্বারা মানুষের কোন উপকার হয় না।

নাম চৈতন্যস্বরূপ। ইনি সর্ব্বদাই জাগ্রত।

নাম জ্ঞানস্বরূপ। ইঁহার মধ্যে অজ্ঞানতা কিছুমাত্র নাই। মানুষ অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত আপন হিতাহিত বুঝিতে পারে না। প্রবৃত্তির পথে পরিচালিত হইয়া বিপদগ্রস্ত হয়, নাম মানুষকে কল্যাণকর পথ দেখাইয়া দেন।

নাম আনন্দস্বরূপ। নাম মনুষকে যে আনন্দ প্রদান করেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

নাম মায়াগন্ধহীন। সুতরাং এখানে অজ্ঞানতা বা বিপদ থাকিতে পারে না।

নামের আস্বাদন অনির্ব্বচনীয়। প্রাকৃতজগতে এরূপ আস্বাদন কোন বস্তুরই নাই। এখন কেহ কেহ বলিবেন, নামের যদি এতই আস্বাদন তবে আমরা সে আস্বাদন ভোগ করিনা কেন? নাম বরং তিক্ত-বিরক্তি-কর লাগে। ইহার উত্তর এই যে, কোন কোন রোগে অরুচি হইলে

মিছরীও তিক্ত লাগে। তাই বলিয়া কি মিছরীকে তিক্ত বলিতে হইবে? আমরা অনাদিকাল হইতে ভবরোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি, আমাদের চিত্ত বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের ঘোর অরুচি জন্মিয়াছে, তাই আমাদিগের নিকট নামের আস্বাদন অনুভূত হয় না। নাম করিতে করিতে অপরাধ কাটিয়া গেলে, চিত্ত নির্ম্মল হইলে, নামের আস্বাদন বুঝিতে পারা যায়।

নাম সর্ব্বশক্তিমান। ইঁহার শক্তি অবর্ণনীয়, ইনি না পারেন এমন কিছু নাই। যাহা কেহ করিতে পারে না, ইনি তাহা করিতে পারেন। নাম হৃদয়গ্রন্থি সকল ছিন্ন করিয়া দেন, মনুষ্যের মধ্যে বৈরাগ্য আনিয়া দেন; সৎ-প্রবৃত্তি সকল জাগাইয়া তোলেন ও পরিবর্দ্ধিত করেন; দুষ্প্রবৃত্তি সকল দূর করেন; মনের একাগ্রতা সাধন করেন; কামক্রোধাদি রিপুগণকে দূরীভূত করেন। মনের চাঞ্চল্য বিদূরিত করিয়া মনকে সুস্থির করেন। যোগশাস্ত্রে মনের একাগ্রতা-সাধন জন্য বহু উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, কিন্তু সে সকল স্থায়ী নহে। নামে যেমন চিত্ত স্থির হয় এমন আর কিছুতেই হয় না।

নাম স্বাধীন। ইনি কাহারও অধীন নহেন, ইঁহাকে কেহ বশীভূত করিতে পারে না। ইনি আপন ইচ্ছায় মনুষ্যের মধ্যে বিচরণ করেন, আপন ইচ্ছায় চলিয়া যান; ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই। মানুষ পুরুষকার-বলে অতি অল্পক্ষণই নাম করিতে পারে, একটু অসতর্ক হইলে নাম সরিয়া পড়েন। নামের কৃপা হইলে নাম আর সাধককে ছাড়িয়া যাইতে চান না।

নাম সদাই শুচি। ইনি কদাচার, কুস্থানে বাস, কুলোকের সঙ্গ, অশুচি অবস্থায় কালযাপন ইত্যাদি সহ্য করিতে পারেন না। যাঁহারা নাম করিতে চান তাঁহাদিগকে এসব পরিত্যাগ করিতে হইবে।

নাম সদাই পবিত্র। সুতরাং ইনি পবিত্র স্থানে থাকিতে চান। চিত্ত অপবিত্র হইলে, মনে কলুষিত ভাব পোষণ করিলে, ইনি তথা হইতে প্রস্থান করেন।

নাম কিছুতেই অপবিত্র হয় না। কেহ কেহ বলেন, বেশ্যাসক্ত ব্যভিচারী মদ্যপায়ী মৎস্যমাংসাশী প্রভৃতি অসচ্চরিত্র লোকের মুখে নাম শুনিতে নাই। এটা সম্পূর্ণ ভুল। নাম কখনও অপবিত্র হয় না। ইহা শ্রুতিপথে গমন করিলে, ইহার কাজ হইবেই হইবে। ইহা ভবরোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে মহৌষধির ন্যায় কাজ করিবে।

নাম নীতিপরায়ণ। একারণ যাঁহারা নাম সাধন করিতে চান, তাঁহাদিগকে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ব্যভিচার পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, আলস্য, গ্রাম্যকথা নিষ্ঠুরতা, পরপীড়ন ইত্যাদি দুর্নীতি সকল ত্যাগ করিতে হইবে।

নাম স্বাস্থ্যপ্রদ। নামে মস্তিষ্ক শীতল হয়, বুদ্ধি প্রখর হয় ; বুঝিবার শক্তি ধারণাশক্তি অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। নাম ব্যাধির যন্ত্রণা, শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ অনেক পরিমাণে নিবারণ করেন ও শরীরমনকে সুস্থ রাখেন।

নাম উত্তেজক। নামে উত্তেজনার শক্তি আছে ; ইনি হৃদয়ে বলসঞ্চয় করিয়া দেন ও স্নায়ু সকল উত্তেজিত ও সবল করেন।

নাম মাদক। নামে মাদকতা শক্তি আছে, নাম করিতে করিতে বেশ একটু নেশা জন্মে, তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তি ভ্রংশ হয় না এবং কোন উৎপাতও জন্মে না। নাম করিতে করিতে কাহার কাহার মস্তিষ্ক হইতে একপ্রকার রস নির্গত হয়। এই রস কখনও তিক্ত, কখনও লবণ, কখন লবণমধুর, কখনও কেবল মধুর। এই রস তন্ত্রে সুধা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই রস জিহ্বায় পতিত হইলে দারুণ নেশা জন্মে। মদ্যাদির নেশা এই নেশার নিকট অতীব অকিঞ্চিৎকর। সুধার ক্ষরণ

হইলে ৫।৭ দিন অনায়াসে অনাহারে থাকিতে পারা যায়। আদৌ ক্ষুধা হয় না, কিন্তু অনাহারজনিত ক্লেশ অনুভব হয় না, শরীর ক্লিষ্ট বা দুর্ব্বল হয় না। প্রাণে একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে। জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয় না।

নাম জ্ঞানদাতা। মানুষকে ভগবান সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়াছেন। মানুষ যে জ্ঞানলাভ করিয়াছে তাহাতে সে ভগবৎতত্ত্ব জানিবার বা বুঝিবার অধিকারী নয়। এইজন্য পণ্ডিতগণ ভগবৎতত্ত্ব নির্ণয় করিতে গিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছেন। কেহই কিছু ঠিক করিতে পারেন নাই, যিনি যাহা মনে করিয়াছেন তিনি তাহাই বলিয়াছেন, কাহারও কথার ঠিক নাই।

সাধকের নিকট নাম ক্রমে ক্রমে ভগবৎতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দেন। তাঁহার অন্তরের অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন। নতুবা মনুষ্যবুদ্ধি দ্বারা ভগবৎতত্ত্ব নিরূপণ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র।

নাম পরম কারুণিক। তিনি পাপী, তাপী, দুষ্কৃতি কাহাকেও ঘৃণা করেন না। যে যত কেন অপরাধী হউক না, দীনভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করেন না। কেবল খল, অহঙ্কারী, কপটাচারী ও নিন্দুকের স্থান তাঁহার নিকট নাই।

নাম দুঃখহারী। নাম যেমন দুঃখ দূর করিতে পারেন, এমন কেহই পারে না। দুঃখের সময়, মানুষ সহানুভূতি দেখাইয়া প্রাণে সান্ত্বনা দেয় বটে, কিন্তু নাম যেমন সান্ত্বনা দেন, এমন সান্ত্বনা কেহ দিতে পারে না।

নাম শুশ্রূষাকারী। রোগ, শোক সকল অবস্থাতেই নাম যেমন সেবা করিতে পারেন, এমন সেবা করিতে কেহই পারে না। সেবার প্রয়োজন হইলে মানুষকে ডাকিয়া আনিয়া বলিয়া কহিয়া সেবা করাইতে হয়, সময়ে সময়ে অর্থও ব্যয় করিতে হয়, তবে সেবা হয়। রোগে শোকে

নামকে ডাকিতে হয় না, নাম আপনা হইতে আসিয়া সেবাকার্য্যে ব্রতী হন।

নাম ভয়হারী। নামের আশ্রয় পাইলে মানুষের প্রাণে আর ভয় থাকে না। সাংসারিক বিপদ আপদের, কি বহিঃশত্রুর আক্রমণের অথবা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যে শমনের ভয় তাহাও থাকে না। সাধক জানে নাম তাহার রক্ষাকর্ত্তা, নাম তাহার পরিত্রাতা।

নাম বিপদভঞ্জক। যে ব্যক্তি নামের শরণাপন্ন হইয়াছে, সর্ব্বপ্রকার বিপদে নামই তাহাকে উদ্ধার করেন। বিপদ এমনভাবে কাটিয়া যায় যে, সাধক তাহা টেরও পায় না।

নাম অভয়দাতা। নাম সর্ব্বদাই মানুষের প্রাণে অভয় দান করিয়া থাকেন। নাম যাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছেন, তিনি সর্ব্বদাই নামের এই অভয়বাণী শুনিতে পান।

নাম উৎসাহদাতা। যে ব্যক্তি নামের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাম তাঁহাকে সর্ব্বদাই উৎসাহিত করিতে থাকেন। একারণ নামসাধক আশাবদ্ধ সমুৎকণ্ঠার সহিত কাল যাপন করিতে থাকেন। তাঁহার প্রাণে নৈরাশ্য আসে না।

নাম তেজীয়ান্। নাম আত্মার মধ্যে বলসঞ্চয় করেন। আত্মাকে সবল ও সুস্থ করেন। একারণ নামসাধক কিছুতেই দমিয়া যান না। সংসারের লোক তাঁহাকে নানাপ্রকারে শাসন করে ও নানা রূপ ভয় দেখায় বটে, কিন্তু নামসাধকের প্রাণ তাহাতে অবসন্ন হয় না।

নাম অন্নদাতা। যে ব্যক্তি নামের শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার শরীর-যাত্রা, নামই কোন না কোন উপায়ে নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তাঁহাকে মোটামুটি গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ক্লেশ পাইতে হয় না।

নাম শাসক। নামসাধককে ইনি বড়ই শাসন করিয়া থাকেন।

সাধকের বেচাল হইলে নাম তাহাকে অত্যন্ত ভ্রূকুটি করেন, অন্তরে শুষ্কতা ও জ্বালা উপস্থিত করিয়া ফিরাইয়া আনেন। কিন্তু সহজে পরিত্যাগ করেন না।

নাম সর্ব্বফলদাতা। নামের নিকট যাহা চাহিবেন নাম তাহাই দিবেন, কিন্তু যাহাতে সাধকের অনিষ্ট হইবে তাহা প্রার্থনা করিলে, নাম তাহা দেন না।

নাম সুবুদ্ধিদাতা। নাম কুপরামর্শ বা কুবুদ্ধি প্রদান করেন না। ভগবৎ-মায়া যদি কখনও উপস্থিত হইয়া মানুষকে কুবুদ্ধি দিয়া বিপথগামী করিতে চেষ্টা পায়, নাম সুবুদ্ধি দিয়া তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেন।

নাম পরমহিতৈষী। নাম শরণাগতকে পরিত্যাগ করেন না। যে ব্যক্তি নামের শরণাগত, সে ব্যক্তি নামসাধনে অসমর্থ হইলেও নাম স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাঁহার কাযটা নিজেই করিয়া থাকেন, অর্থাৎ নিজেই সাধকের অন্তরে প্রবাহিত হইতে থাকেন।

নাম সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তক। নাম হইতেই অনর্থের নিবৃত্তি হয়, আর কিছুতেই হয় না। ভজনের যাহা কিছু প্রতিবন্ধক তাহাই অনর্থ জানিবেন। নাম এই প্রতিবন্ধক দূর করেন।

যাহারা শ্মশান-বৈরাগ্যের বশবর্ত্তী হইয়া, অথবা সংসারের প্রতিকূল হইয়া সংসার পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে চতুর্গুণ সংসার করিতে হয়। মায়া সহজে ছাড়িবার পাত্রী নহেন। তিনি নানা কুহকজাল বিস্তার করিয়া ভজন নষ্ট করিয়া দেন এবং সংসারত্যাগী ব্যক্তিকে অধিকতর সংসারজ্বালা ভোগ করাইয়া থাকেন।

যাহারা সুখ বা আরামের জন্য সংসার ত্যাগ করে, তাহাদের ন্যায় অদূরদর্শী হতভাগা আর নাই। তাহাদের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। তাহাদের এই সুখ বা আরামের সহস্র গুণ প্রতিশোধ হইবে। ভগবানের রাজ্যে কাহারও

ফাঁকি দিবার উপায় নাই। জীবন আর কয় দিন? অনন্তকাল সম্মুখে বর্ত্তমান, তাহার উপায় কি? ফাঁকি দিয়া কি কাহারও নিস্তার আছে? মায় সুদ আদায় হইবে জানিবেন। সুখে দুঃখে সকল অবস্থাতেই নাম করিতে পারিলেই অনর্থের নিবৃত্তি হয়; দুঃখের অবসান হয়।

নাম সংসারক্ষয়কারী। টাকাকড়ি, স্ত্রীপুত্র, ঘরবাড়ী, ইত্যাদি সংসার নহে। ইহাতে মানুষের যে আসক্তি তাহাই সংসার। নাম এই আসক্তি দূর করিয়া সংসার ক্ষয় করিয়া দেন।

নাম কর্ম্মক্ষয়কারী। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য মানুষ দেহ পরিগ্রহ করে। মানুষের যাহা প্রারব্ধ তাহা ভোগ করিতেই হইবে। কিছুতেই তাহার অব্যাহতি নাই। মানুষ হাজার চেষ্টা করিয়াও প্রারব্ধ খণ্ডন করিতে পারে না। একমাত্র এই নাম হইতেই তাহার খণ্ডন হইয়া থাকে। নামে প্রারব্ধ খণ্ডিত না হইলে জীবের উদ্ধার অসম্ভব হইত।

নাম চিত্তশুদ্ধিকারী। বহু জন্মের অপরাধে মানুষের চিত্ত কলুষিত, পাপ-কালিমায় কলঙ্কিত। নাম এই সমস্ত ময়লা ক্রমে ক্রমে বিধৌত করিয়া চিত্তকে নির্ম্মল করে।

নাম বড় প্রেমিক। এ জগতে সকলেই ভালবাসা চায়। ভালবাসা চায় না এমন কেহ নাই। যেখানে ভালবাসা নাই, সেখানে কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক থাকিতে চায় না। প্রেম যে কি বস্তু, নাম তাহা বেশ জানেন। তাঁহার প্রেম নিঃস্বার্থ। তিনি সাধকের নিকট কোন প্রতিদান চান না। কেবল চান প্রাণের ভালবাসা, হৃদয়ের প্রেম, আদরযত্ন। নামকে আদরযত্ন না করিলে, নামকে ভাল না বাসিলে, নাম সাধকের নিকট থাকেন না, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

নাম বড় অভিমানী। নামের অভিমান বড় বেশী। একটু ত্রুটি

বা অনাদর হইলে, তিনি মান করিয়া বসেন, কাছে ঘেঁষিতে চান না। তখন হাতে পায়ে ধরিয়া অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া তাঁর মান ভাঙ্গাইতে হয়, তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে হয়।

নাম বড় ঈর্ষ্যান্বিত। আমি নামের সহবাসে থাকিয়া দেখিয়াছি, ইনি বড়ই ঈর্ষ্যান্বিত। অপরকে ভালবাসা ইনি সহ্য করিতে পারেন না। ইঁহার ইচ্ছা আমি কেবল ইঁহাকেই ভালবাসি, আর কাহাকেও ভাল-বাসিতে পাইব না। সংসারকে ভালবাসিব এবং নামকেও ভালবাসিব, এরূপ ভালবাসা ইনি চান না।

নাম চান, আমি স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান, যশ, খ্যাতি, প্রভাব, প্রতিপত্তি, অভিমান, অহঙ্কার ইত্যাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহারই হইয়া থাকি। এই সকল দিকে তাকাইলে তাঁহার ক্ষোভ ও অভিমানের সীমা থাকে না। তিনি রাগ করিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিতে চান।

আমি বলি এত রাগ করিলে চলিবে কেন? আমি মায়ামুগ্ধ সংসারী জীব, আমার কি এ সব ছাড়িবার শক্তি আছে? আমাকে ত্যাগ করিলে কি হইবে? তুমি সর্ব্বশক্তিমান, আমার এ সব দুর্দ্দশা ছাড়াইয়া লও। তুমি আপন শক্তি প্রকাশ করিলে, সংসার আমাকে কোনক্রমেই দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। আমার নিজের যত ক্ষমতা তাহা তুমি জান। আমার ক্ষমতা থাকিলে তোমার আশ্রয় লইব কেন? তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, তুমি আমাকে সংসার-কারাগার হইতে মুক্ত কর।

নাম সংশয়-বিনাশকারী। সংশয় আত্মার একটি অবস্থা। কাম-ক্রোধাদি ভিতরে থাকিলে তাহা যেমন কিছুতেই অতিক্রম করা যায় না, সেইরূপ সংশয় থাকিতে কিছুতেই তাহা বিনষ্ট হয় না। একমাত্র নাম দ্বারা সংশয় বিনষ্ট হইয়া থাকে। সংশয় বিনষ্ট হইলে বিশ্বাস জন্মে।

নাম রক্ষাকারী। নাম চলিতে থাকিলে ভূত, প্রেত, পিচাশ, ইত্যাদি কোন অপদেবতা মানুষকে আশ্রয় করিতে পারে না। মানুষকে অপদেবতা আশ্রয় করিলে মানুষের ঘোর অনিষ্ট হইয়া থাকে। তাহার প্রাণ শুষ্ক হইয়া যায়, সাধনভজন নষ্ট হয়, শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সময় সময় ইহা মানুষকে উন্মাদের ন্যায় করিয়া তুলে। নামের আশ্রয়ে থাকিলে এসব বিপদ ঘটে না।

নামের কাছে বুজরুকি খাটে না। অনেক লোক মানুষকে বুজরুকি দেখাইয়া বশীভূত করে, এবং তাহাদিগকে শিষ্য করিয়া তাহাদের বিত্ত হরণ করে ও ভৃত্যের ন্যায় কাজকর্ম্ম করায়। যে ব্যক্তি নামের আশ্রয়ে থাকে, তাহার নিকট কাহারও কোন প্রকার বুজরুকি খাটে না।

নাম স্বার্থের নাশকারী। সমস্ত প্রাণী জগতে স্বার্থ লইয়া ব্যতিব্যস্ত। মানুষের স্বার্থ অত্যন্ত প্রবল। স্বার্থের জন্য মানুষ না করিতে পারে এমন কাজই নাই।

পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে এই স্বার্থ দিন দিন প্রবল হইতেছে। এখন স্বার্থ ছাড়া আর কথাটি নাই।

এই স্বার্থের জন্য মানুষ ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিতেছে; পৃথিবীকে দুঃখময় করিয়া তুলিয়াছে। এত দুঃখ হিন্দু জানিত না, এত স্বার্থ হিন্দুর ছিল না। হিন্দুজাতি চিরকাল ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিয়া সুখে ও শান্তিতে বাস করিতেছিলেন।

জমিদারগণ প্রজাগণকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন, তাহাদের অভাব প্রাণপণে মোচন করিতেন, প্রজার ক্লেশের জন্য রাজা দায়ী ছিলেন, প্রজারঞ্জনই রাজধর্ম্ম ছিল। প্রজাগণও রাজাকে ভগবানের অংশ বলিয়া মনে করিত; তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিত; রাজদর্শন মহাপুণ্য বলিয়া মনে করিত।

ভদ্রপরিবারের চাকর চাকরাণীগণ পুত্রকন্যার ন্যায় প্রতিপালিত হইত। তাহারাও আপনাদিগকে পরিবারস্থ লোক মনে করিয়া সংসারের কাজকর্ম্ম যত্নের সহিত নির্ব্বাহ করিত। প্রভু-ভৃত্যের একটা বিশেষ প্রভেদ ছিল না।

পরিবারস্থ একজন উপার্জ্জনশীল হইলে দশ জন প্রতিপালিত হইত। লোকে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত "আমার বংশে যেন দানশীল সন্তান জন্মে"। লোকে "সহস্রপোষী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিত।

এখন আর সে দিন নাই। বিদেশীয় শিক্ষায় হিন্দু-প্রকৃতির বিকৃতি হইয়াছে। প্রজাপালনের স্থানে প্রজাপীড়ন হইয়াছে। জমিদারী করা এখন একটা ব্যবসায়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। পত্তনিদার পত্তনি লইয়া ক্রমাগত প্রজার সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। এখন আর পূর্ব্বের রাজা প্রজা সম্বন্ধ নাই। সাপে নেউলে যে সম্বন্ধ, এখন রাজাপ্রজায় সেই সম্বন্ধ ঘটিয়াছে।

আত্মীয় স্বজনের সাহায্য করা দূরে থাকুক, কোন কোন শিক্ষাভিমানী যুবক দুস্থ পিতামাতাকেও সাহায্য করিতে নারাজ।

এখন জীবনসংগ্রাম যেমন দিন দিন বাড়িতেছে, স্বার্থও তেমনি বৃদ্ধি পাইতেছে, নিবারণের কোন উপায় নাই। একমাত্র ভগবানের নাম এই দুর্নিবার স্বার্থ নাশে সমর্থ।

নাম প্রেমদাতা। ভালবাসা চিত্তের একটা বৃত্তি। মনুষ্যমাত্রেরই অন্তরে এই ভালবাসার বীজ নিহিত আছে। হৃদয়ের সংকীর্ণতা-প্রযুক্ত এই ভালবাসা বিকাশপ্রাপ্ত হইতে পারে না, স্ত্রী-পুত্রাদির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে।

নাম হৃদয়ের সংকীর্ণতা দূর করিয়া এই ভালবাসা বিকশিত করিতে থাকে। ক্রমে ইহা স্ত্রী-পুত্রাদি হইতে সমস্ত বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে। তখন

আত্মপর শত্রুমিত্র, মানুষ বা ইতর প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য থাকে না। আমি এমন বিশ্বপ্রেমিক লোক দেখিয়াছি, যাঁহার সাক্ষাতে গাছের একটি পাতা ছিঁড়িলেও তিনি কষ্টানুভব করিতেন। নাম ব্যতীত অন্য কিছু-তেই এই বিশ্বপ্রেম লাভ হইতে পারে না।

নাম স্বাধীনতা-দাতা। রাজনৈতিক স্বাধীনতাকেই লোকে এখন স্বাধীনতা বলিয়া থাকে। এই স্বাধীনতালাভের জন্য বহুকাল যাবৎ পৃথিবী নরশোণিতে প্লাবিত হইতেছে, লোকের দুঃখযন্ত্রণার সীমা নাই। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব এবং সভ্যতাভিমানী ইয়োরোপের বর্ত্তমান লোমহর্ষণ ব্যাপার একবার মনে করিয়া দেখুন। রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের জন্য কি সর্ব্বনাশই না হইতেছে।

ধর্ম্মজগতে এ স্বাধীনতাকে স্বাধীনতা বলে না। ইহা স্বাধীনতা নহে, প্রকৃতপক্ষে বিষম অধীনতা। বাসনা, কামনা ইত্যাদি দুর্নিবার রিপুগণের দাসত্ব মাত্র। এই দুরন্ত রিপুগণ মানুষকে যে দিকে চালাইতেছে, মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই দিকেই ধাবিত হইতেছে। ইহা সমস্ত পৃথিবীটাকে দুঃখের আগার করিয়া তুলিতেছে।

কামাদি দুর্দ্দমনীয় রিপুগণের দাসত্ব হইতে আত্মবিমোচন করা ও উন্মার্গগামী মনকে বশীভুত করাই প্রকৃত স্বাধীনতা।

এই স্বাধীনতলাভ হইলে মানুষ নবজীবন লাভ করে। তখন আর তাহাকে ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভুত হইতে হয় না; জীবন মরুভূমিতে মন্দাকিনী প্রবাহিত হয়। প্রাণের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল খেলিতে থাকে।

একমাত্র নাম হইতে এই স্বাধীনতা লাভ হইয়া থাকে। দুরন্ত রিপু-গণকে নিপাত করিবার ও বিপথগামী মনকে বশীভুত করিবার অন্য উপায় নাই।

নাম ভবক্ষয়কারী। জীব অনাদি কাল হইতে নানা যোণীতে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে এবং অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে। যাতায়াতের বিরাম নাই এবং দুঃখেরও শেষ নাই। যাতায়াত বন্ধ করিবার জন্য ও দুঃখের শান্তির নিমিত্ত বহু শাস্ত্র রচিত হইয়াছে এবং বহু উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু আত্যধিক দুঃখের নিবৃত্তি কিছুতেই হয় না। জন্ম-মরণরূপ ব্যাধির শান্তির একমাত্র উপায় ভগবানের নাম।

নাম বৈরাগ্যের জনয়িতা। ভগবান অচিন্ত্য অব্যক্ত। ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে ধরিতে পারে না। মন তাঁহাকে মনন করিতে অসমর্থ। একারণ ইন্দ্রিয় সকল ও মন বিষয়ে বিচরণ করিয়া বেড়ায়।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ বিষয় লইয়া মত্ত হইয়া থাকে। এই পঞ্চ বিষয় ছাড়িয়া তাহাদের একদণ্ড থাকিবার উপায় নাই।

মানুষ নিদ্রা গেলে এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের রাজা মন অন্তরেন্দ্রিয় লইয়া এই পঞ্চ বিষয় ভোগ করিতে থাকে। বিষয় ভোগেই তাহার পরিতৃপ্তি, একারণ সে বিষয় ছাড়িয়া থাকিতে চায় না। মন যে এত চঞ্চল ইহার একমাত্র কারণ, মন সুখলালসার বশবর্ত্তী হইয়া এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বিচরণ করিতে থাকে; তাহাকে নিবারণ করা দুঃসাধ্য।

ভগবানের নামে যখন বিষয়সুখ মলমূত্রের ন্যায় ঘৃণিত হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের প্রলোভন আর মনের উপর কাজ করে না; তখন মন স্থির হয় এবং বৈরাগ্যও আসিয়া উপস্থিত হয়।

নাম ক্ষমাগুণের জনয়িতা। ধর্ম্মজগতে ক্ষমাগুণ অতি আদরনীয় বস্তু। যাহার অন্তরে ক্ষমা নাই, সে কখনও ধর্ম্মলাভ করিতে পারে না।

ক্ষমতাসত্ত্বেও শত্রুতার প্রতিশোধ না লওয়াকে ক্ষমা বলে। প্রতি-

হিংসাবৃত্তি মানুষের মধ্যে ক্ষমা আসিতে দেয় না। নাম করিতে করিতে প্রতিহিংসাবৃত্তি দূরীভূত হয়, তখন মানুষ ক্ষমাশীল না হইয়া থাকিতে পারে না।

নাম কৃপণতার বিনাশকারী। কৃপণের ন্যায় এজগতে হতভাগ্য লোক কেহ নাই। বহু জন্মের বহু অপরাধে মানুষ কৃপণ হয়। কৃপণের দ্বারা এজগতের কোন উপকার হয় না। ঘোর অর্থাসক্তিই দয়াধর্ম্ম প্রভৃতি মানুষের উন্নত বৃত্তিগুলিকে নষ্ট করিয়া দেয়। তাহার দ্বারা পরের উপকার দূরে থাকুক, কৃপণের বিপুল অর্থ তাহার নিজের উপকারেও আসে না। ব্যারাম হইলে সে অর্থব্যয় করিয়া চিকিৎসা করান অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ মনে করে। ধর্ম্মজগতের এই ভীষণ বৈরী একমাত্র নাম দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

নাম কর্ত্তব্যপরায়ণতা-আনয়নকারী। নামসাধন করিতে করিতে মানুষের কর্ত্তব্যজ্ঞানের উদয় হয়। তখন মানুষের আর ফাঁকি দিয়া জীবন কাটাইতে প্রবৃত্তি থাকে না। ভগবান তাঁহার উপর যে কাজের ভার দিয়াছেন সে কাজ তিনি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করেন। তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্মের ত্রুটি হয় না।

নাম ধৈর্য্যশীল। যে ব্যক্তি নামসাধন করেন, তিনি বিপদের আশঙ্কায় অধৈর্য্য হইয়া পড়েন না; এবং বিপদ উপস্থিত হইলে ধীরতার সহিত তাহা আলিঙ্গন করেন। তাঁহার শোক বা মোহ উপস্থিত হয় না।

নাম সংস্কারবিনষ্টকারী। সংস্কার বড় বিষম শত্রু। সংস্কার সত্যকে আচ্ছন্ন করে। মানুষ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়। বৌদ্ধগণের মধ্যে সংস্কারবর্জ্জন একটি সাধনা আছে। দুই বৎসরকাল ইহার সাধনা করার পর বৌদ্ধগুরুগণ সাধন দিয়া থাকেন। সংস্কার সহজে বিনষ্ট হয় না। একটা সংস্কার নষ্ট হইলে, মানুষ আর একটা সংস্কারের

জড়াইয়া পড়ে। ইহার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া বড়ই কঠিন। নাম দ্বারা এই সংস্কার একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

নাম সাম্প্রদায়িকতার বিমোচনকারী। সাম্প্রদায়িকতা ধর্ম্মলাভের বিষম অন্তরায়। ইহাকে ভাষা কথায় গোঁড়ামি কহে। গোঁড়ামি অন্তরে প্রবেশ করিলে অন্য সম্প্রদায়ের কিছুই ভাল দেখিতে পায় না। দেখাইলেও দেখিতে চায় না। গোঁড়ারা অন্য সম্প্রদায়ের লোকের উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে পারে না। বরং বিদ্বেষই করিয়া থাকে।

সাম্প্রদায়িকতা কেবল যে ধর্ম্ম হানিকর তাহা নহে। ইহা পৃথিবীতে বহুকাল হইতে দুঃখ যন্ত্রণা আনয়ন করিয়াছে। আমাদের দেশের শাক্ত ও বৈষ্ণবের মনোমালিন্য চিরপ্রসিদ্ধ। বৈষ্ণবগণ কলুষিতচরিত্র সাম্প্রদায়ী লোকের হাতে খাইবেন, কিন্তু চরিত্রবান ধার্ম্মিক শাক্তের হাতের জলস্পর্শ করিবেন না।

ভারতবর্ষে নানা ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, এখানে সাম্প্রদায়িক বিষ এতই প্রবল যে, প্রত্যেক কুম্ভস্নানোপলক্ষে পূর্ব্বকালে অন্ততঃ ২৫০০০ হাজার লোক হতাহত না হইলে স্নান শেষ হইত না। এইজন্যই নাগা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। এখন ইংরাজশাসনে এই হত্যাকাণ্ড নিবারিত হইয়াছে।

এক সময় হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্ঘর্ষণে ভারতবর্ষ বহুকাল যাবৎ নরশোণিতে প্লাবিত হইয়াছিল। দারুণ ক্রুশেডের কথা আপনারা ইতিহাসে পাঠ করিয়াছেন এবং ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যাণ্ট সম্প্রদায়ের লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড জ্ঞাত আছেন। এখন য়ুরোপ প্রায় ধর্ম্মবিবর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছে, সেইজন্য তথায় সাম্প্রদায়িক বিষ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। একমাত্র নাম হইতে সাম্প্রদায়িক বিষ নষ্ট হইয়া থাকে।

নাম ত্রিগুণনাশকারী। দেহ ত্রিগুণাত্মক; আত্মা দেহেতে আবদ্ধ হওয়ায় তাহাকেও ত্রিগুণাত্মক হইতে হইয়াছে। গুণত্রয়ের তারতম্য

অনুসারে মানুষকে শুভাশুভ কার্য্য করিতে হয়। নামের শক্তিতে এই ত্রিগুণ নষ্ট হইয়া যায়। ত্রিগুণ নষ্ট করিবার আর কোন উপায় নাই।

নাম দেহের পরমাণুর পরিবর্ত্তনকারী। নাম করিতে করিতে নামের শক্তিতে দেহের পরমাণু সকল পরিবর্ত্তিত হয়। পরমাণু-পরিবর্ত্তন সময়ে দেহে দারুণ জ্বর ও নিউমোনিয়া দেখা দেয়। রোগী অনেক যাতনা ভোগ করিতে থাকে। কোন ঔষধে এ রোগ আরাম হয় না। ক্রমে পরমাণু সকল পরিবর্ত্তিত হইলে রোগ আপনা আপনি সারিয়া যায়।

নামের শক্তিতে দেহের পরমাণুর পরিবর্ত্তন হয় বলিয়াই সাধুগণ ভাগবতী তনু লাভ করিয়া থাকেন। ভাগবতী তনু লাভ হইলে সেই দেহ লইয়া মানুষ সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক, নক্ষত্রলোক ইত্যাদি লোক লোকান্তরে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে সমর্থ হয়। দেহের গতি মনের ন্যায় হয়। অগ্নি, জল, পাহাড়, পর্ব্বত ইত্যাদি কোন পদার্থ তাহার গতি রোধ করিতে পারে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাগবতী তনু লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্য ভক্তগণ তাঁহাকে গৃহমধ্যে আটক করিয়া রাখিলেও তিনি বাহির হইয়া কখনও সমুদ্রে কখনও সিংহদ্বারে গিয়া পড়িতেন।

"তিন দ্বারে কপাট প্রভু যাবেন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে কভু সিন্ধুনীরে॥"

চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য লীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নাম প্রকৃতির পরিবর্ত্তনকারী। বৈদেশিক শিক্ষা, বৈদেশিক সভ্যতা ও বৈদেশিক আচার ব্যবহারে আমাদের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। আমরা হিন্দুপ্রকৃতি হারাইয়া ফেলিতেছি।

স্বাধীনতা, স্বাধীন চিন্তা, অবিশ্বাস, সংশয় কপটতা, স্বার্থপরতা, পাশ্চাত্য সভ্য জাতিগণের প্রকৃতি। আনুগত্য, গুরুজনে শ্রদ্ধাভক্তি,

গুরুবাক্যে বিশ্বাস, সত্যনিষ্ঠা পরার্থপরতা, নিষ্কপটতা, দয়া ক্ষমা ইত্যাদি হিন্দুর প্রকৃতি।

বৈদেশিক শাসন ও সভ্যতায় আমাদের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন শিশু ছেলেও মা বাপের কথা বিশ্বাস করে না। বালক পিতার নিকট ২।১টা পয়সা চাহিল, পিতা বলিল বাক্সে এখন পয়সা নাই, পরে দিব। বালক পিতার কথা বিশ্বাস করে না, বাক্সের ডালাটা তুলিয়া দেখে; যদি বাক্সের কুঠুরীর মধ্যে পয়সা দেখিতে না পায়, তাহা হইলে আবার কাগজগুলা হাঁটকাইয়া দেখে। কি জানি পিতা যদি ছেলেকে ফাঁকি দিবার জন্য কাগজের নীচে পয়সা লুকাইয়া রাখিয়া থাকে, এটা তদন্ত করা কর্ত্তব্য। বালক খানাতল্লাসী না করিয়া ছাড়ে না। তাহার পিতৃবাক্যে বিশ্বাস নাই। সে জানে পিতা ছেলেকে ফাঁকি দিবার জন্য মিথ্যা কথা বলিতে পারে, পায়সাও লুকাইয়া রাখিতে পারে। খানাতল্লাসীতেও যখন বাক্স মধ্যে পয়সা দেখিতে পায় না, তখন পিতার কথা বিশ্বাস করে।

এ যে কেবল কালের প্রভাব ও সন্তানের দোষ তাহা নহে। বালক দেখিতে পায় লোকে সত্য কথা বলে না। মিথ্যা কথা বলিয়া প্রতারিত করে। তাহার পিতা যে তাহাকে মিথ্যা কথা বলিয়া প্রতারিত করিতেছে না, ইহার প্রমাণ কি? হয়ত সে পিতাকে কোন কোন সময় মিথ্যা কথাও বলিতে দেখিয়াছে। এইজন্য তাহার পিতৃবাক্যে বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে।

এ বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত, অতি সাবধানে সন্তানপালন করা কর্ত্তব্য। হিন্দুপ্রকৃতি ফিরিয়া না আসিলে আমাদের কল্যাণ নাই। একমাত্র নামই আমাদের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটাইতে ও আমাদের হিন্দুপ্রকৃতি আমাদিগকে ফিরাইয়া আনিয়া দিতে সমর্থ।

নাম আত্মদৃষ্টির পরিপোষক। মানুষ প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া

চলিয়াছে। যদি আত্মদৃষ্টি থাকে, তবে হিতাহিত জ্ঞান হয়; আত্মরক্ষার একটা উপায় হয়।

আত্মদৃষ্টির অভাব, ধর্ম্মলাভের একটা বিষম অন্তরায়। আত্মদৃষ্টি অভাবে, দুষ্প্রবৃত্তির অধীন হইয়া মানুষ নানা পাপাচার ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে। শাক্তসমাজের পঞ্চমকার ও বৈষ্ণবসমাজের প্রকৃতি গ্রহণ ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

আমি অনেক সৎ-লোকের কথা জানি যাঁহারা নিষ্কপটে যথেষ্ট ধর্ম্ম-সাধন করিতেছেন কিন্তু কেবল আত্মদৃষ্টির অভাবপ্রযুক্ত ধর্ম্মের অঙ্গীভূত পাপাচরণ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না।

নাম আত্মদৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর করিয়া সাধককে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করেন। তাহাকে বিপথগামী হইতে দেন না।

নাম সদাচারের প্রবর্ত্তক। সাধুগণের আচরণকে সদাচার বলে। সদাচার পালন না করিলে ধর্ম্মজীবন গঠিত হয় না, মানুষের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা আসে, তাহাতে সমস্ত ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়। নাম মানুষের মধ্যে সদাচার আনয়ন করেন ও তাহা রক্ষা করেন।

নাম সর্ব্বসিদ্ধিদাতা। যোগপারগ ঋষিগণ অষ্টাদশ প্রকার যোগ-সিদ্ধির * কথা বর্ণন করিয়াছেন। বহুকাল যাবৎ কঠোর তপস্যা ও দুঃসহ কষ্টসাধ্য যোগাভ্যাস ব্যতীত এই সকল সিদ্ধি লাভ হয় না। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত একমাত্র নাম দ্বারা এই সমস্ত সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

---

* সিদ্ধয়োঽষ্টাদশ প্রোক্তা ধারণাযোগপারগৈঃ।
তাসামষ্টৌ মৎপ্রধানা দশৈব গুণহেতবঃ॥
অণিমা মহিমা মূর্ত্তের্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ।
প্রাকাশ্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণমীশিতা॥

সিদ্ধি সকল ভক্তিপথের অন্তরায়। সিদ্ধিলাভ করিয়া যোগিগণ তাহাতেই মত্ত থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের ভক্তিলাভ হয় না।

ভগবদ্ভক্তেরা সিদ্ধি চাহেন না, সিদ্ধি লাভ হইলেও তাঁহারা সিদ্ধির প্রতি উদাসীন থাকেন। তাঁহারা কখনও সিদ্ধি প্রদর্শন করেন না। তথাপি সিদ্ধি সকল তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করেন না। এইজন্য বৈষ্ণবগণ সিদ্ধি সকলকে ভক্তিদেবীর দাসী বলিয়া থাকেন।

নাম সমস্ত তত্ত্বের প্রকাশক। শাস্ত্রে তিনটি তত্ত্বের উল্লেখ আছে।

বদন্তি তৎত্ত্ববিদতত্ত্বং যজ্‌ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ অদ্বয়জ্ঞানকে, তত্ত্ব বলিয়া বর্ণন করেন, সেই তত্ত্বকে, উপনিষদবিদ্‌গণ ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভের উপাসকগণ পরমাত্মা ও ভক্তগণ ভগবান কহেন।

গুণেম্বসঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদবস্যতি।
এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টৌ চৌৎপত্তিকীর্মতাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১ম।

ভগবান উদ্ধবকে বলিলেন,—যোগপারগ ঋষিগণ সিদ্ধি অষ্টাদশ প্রকার এবং ধারণাও অষ্টাদশ প্রকার কহিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে আটটি আমার আশ্রিত অবশিষ্ট দশটি গুণকার্য্য।

দেহের সিদ্ধি আট প্রকার—১। অণিমা; ২। মহিমা ৩। লঘিমা; ৪। ইন্দ্রিয়ের সহিত তত্তদধিষ্ঠাতৃ-দেবতারূপে সম্বন্ধসিদ্ধি এক ব্যাপ্তি; ৫। শ্রুত দৃষ্ট বিষয়ে ভোগদর্শন সমর্থসিদ্ধি এক প্রাকাম্য; ৬। মায়াশক্তির প্রেরয়িতা-সিদ্ধি এক ঈশিতা; ৭। বিষয়ভোগেতে অসঙ্গ এক সিদ্ধি বশিতা; ৮। কামনার বিষয়ীভূত সুখ প্রাপয়িতা সিদ্ধি এককাম-

এবার কিন্তু একটি নূতন কথা শুনিলাম। সদ্‌গুরু বলিলেন ভগবৎ-তত্ত্ব অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের উপরও তত্ত্ব আছে, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ব। শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্বের উপর আর কোন তত্ত্ব নাই।

গুরুমুখে যখন এই কথা শুনিয়াছিলাম, তখন ধর্ম্ম জিনিষটা কি, তাহা আমি আদৌ জানিতাম না। ধর্ম্মের তত্ত্ব কিছুমাত্র বুঝিতাম না। একারণ শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বটি কি, একথা আমি খুলিয়া জিজ্ঞাসা করি নাই। তিনি বলিলেন আর আমি শুনিলাম।

প্রায় ত্রিশবৎসরকাল সদ্‌গুরুর নিকট ভগবানের নাম পাইয়াছি, এই

১। অণিমা—অর্থাৎ অতি সূক্ষ্মাবস্থা। স্বীয় শরীরকে স্বেচ্ছানুসারে সূক্ষ্ম করিবার ক্ষমতা। এই শক্তিপ্রভাবে যোগিগণ নিজশরীর ইচ্ছানুরূপ সূক্ষ্ম করিয়া সকলের অলক্ষ্যভাবে বিচরণ করেন।

২। মহিমা—স্বীয় শরীরকে ইচ্ছানুরূপ স্থূল করিবার ক্ষমতা।

৩। লঘিমা—স্বীয় শরীরকে লঘু করিবার ক্ষমতা।

৪। ব্যাপ্তি— দেহ ইচ্ছানুসারে বিস্তৃত করিবার ক্ষমতা।

৫। প্রাকাম্য—ভোগেচ্ছা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা যোগী যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই লাভ করেন।

৬। ঈশিতা—সকলের উপর প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা।

৭। বশিতা—সকলকে বশ করিবার ক্ষমতা।

৮। কাম-বশায়িতা—আপনার সর্ব্বকামনা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা।

গুণহেতু সিদ্ধি যথা—

অনূর্ম্মিমত্বং দেহেঽস্মিন্ দূরশ্রবণদর্শনম্ ॥
মানাজবঃ কামরূপং পরকায়প্রবেশনম্ ॥
স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্দেবানাং সহ ক্রীড়ানুদর্শনম্।
যথাসঙ্কল্পসংসিদ্ধিরাজ্ঞাপ্রতিহতা গতিঃ ॥

নামের কৃপায় আমি শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি তাহা আমি আপনাদিগকে প্রথমখণ্ডে একরূপ জানাইয়াছি। এখন এইমাত্র বলিতেছি; এক নাম হইতে সমস্ত তত্ত্বই লাভ হইয়া থাকে। কোন তত্ত্বই বাকি থাকে না।

নাম পঞ্চকোষ-ভেদকারী। জীব পঞ্চকোষে আবদ্ধ। অন্নময় কোষ, প্রাণময়কোষ, মনোময়কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ।

অন্নময়কোষে আহারে পরিতৃপ্তি; প্রাণময়কোষে ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য; মনোময়কোষে বাসনা, জল্পনা, কল্পনা; বিজ্ঞানময়কোষে আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, এই সব চিন্তার উদয় হয়; আনন্দময়কোষে পার্থিব আনন্দভোগ হইয়া থাকে।

এই পর্য্যন্ত জীবের বদ্ধাবস্থা। আত্মা যতক্ষণ পঞ্চকোষে আবদ্ধ আছে,

---

ত্রিকালজ্ঞত্বমদ্বন্দ্বং পরচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা।
অগ্ন্যর্কাম্বুবিষাদীনাং প্রতিষ্টম্ভোঽপরাজয়ঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৫।৬

ভগবান কহিলেন, ক্ষুৎপিপাসাদি ছয়টি ঊর্ম্মি অর্থাৎ দেহের তরঙ্গ বিশেষ। দেহের অনূর্ম্মিত্ব অর্থাৎ ক্ষুৎপিপাসাদিরাহিত্য, দূরস্থ বিষয়ের শ্রবণ ও দর্শন, মনের ন্যায় দেহগতি, যথাকাম রূপপ্রাপ্তি পরকায়ে প্রবেশ।

স্বেচ্ছামৃত্যু, দেবতাদের সহিত ক্রীড়াকরণ সংকল্পনানুরূপ প্রাপ্তি, অপ্রতিহত গতি ও অপ্রতিহত আজ্ঞা।

আর ক্ষুদ্র সিদ্ধি পাঁচ প্রকার—

ত্রিকালজ্ঞত্ব, শীতোষ্ণতাদ্যনভিভব, পরচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা, অগ্নি, সূর্য্য জল ও বিষাদির স্তম্ভন ও অপরাজয়।

ততক্ষণ উহা জীবাত্মা নামে খ্যাত। এই অবস্থায় কখনও সুখ কখনও দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে।

পঞ্চকোষ ভেদ হইলে জীবাত্মা আত্মা নামে অভিহিত হয়। পঞ্চকোষ ভেদ হইবার কোন উপায় নাই। একমাত্র ভগবানের নামেই পঞ্চকোষ ভেদ হইয়া যায়।

নাম বাসনার বিনাশকারী। পঞ্চকোষ ভেদ হইলেও আত্মার বাসনা থাকে। সেই বাসনা পূর্ণ করিতে আত্মা দেহ ধারণ করেন। কেহ স্থূলদেহ ধারণ করিয়া বাসনা ভোগ করে, কেহবা আতিবাহিক দেহে বাসনা ভোগ করে।

বাসনার লয় হইলে স্থূলদেহের লয় হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম ও কারণদেহ থাকে। সূক্ষ্মদেহ যে যে বাসনা দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাদের লয় হইলেও কারণদেহ বর্ত্তমান থাকে। সমস্ত বাসনার একেবারে নিবৃত্তি না হইলে, কারণদেহের বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষ নিশ্চিন্ত অবস্থায় পৌছে না।

ছোট বাসনা হইতে পুনরায় বাসনার আতিশয্যে জীব স্থূলদেহ ধারণ অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করে।

এই যে দুর্ব্বার বাসনা, ইহার নাশ হইবার কোন উপায় নাই, একমাত্র ভগবানের নামে ইহা নির্ম্মূল হইয়া যায়।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ নামের ফল নহে, ভগবান এই সব দিয়া ভক্তকে ভুলাইতে চান। এই সব ভক্তির অন্তরায়, একারণ ভক্তগণ ইহা গ্রহণ করেন না। ইহা ভক্তের নিকট অতি তুচ্ছ জিনিষ।

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৯।১১)

কপিলদেব কহিলেন, মা! মদীয় জন আমার সেবা ব্যতিরেকে

সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য, এই পঞ্চবিধ মুক্তিপ্রদান করিলে গ্রহণ করেন না।

এই সকল নামাভ্যাস হইতেই লাভ হইয়া থাকে। নামের ফল এসব অকিঞ্চিৎকর জিনিষ নহে। নামের ফল অনেক বেশী। নাম কৃষ্ণ প্রেমদাতা।

নামাভ্যাসে মুক্তির কথা শাস্ত্রে পুনঃপুনঃ লিখিত হইয়াছে—

ম্রিয়মাণো হরির্নাম 'গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ৬।২।৪২।

অজামিল মহাপাতকী হইয়াও অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক যখন পুত্রোপচারিত নারায়ণ নাম উচ্চারণ করতঃ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছিল, তখন যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপ্রযুক্ত হরিনাম কীর্ত্তন করিবে, সে অনায়াসে বৈকুণ্ঠ যাইবে, ইহা আর কি বলিব?

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যং।

হরিভক্তি বিলাশের ১১ বিলাশ।

ভগবানের যে কোন একটী নাম যদি প্রসঙ্গক্রমে বাগিন্দ্রিয়ে উচ্চারিত হয়, অথবা মনঃস্পর্শ করে, কিম্বা কর্ণগোচর হয়, তাহা শুদ্ধবর্ণ, বা অশুদ্ধবর্ণ অথবা ব্যবহিত (অন্য সঙ্কেতবিশিষ্ট) কিম্বা কোন অংশ রহিত হইলেও নিশ্চয় সকল পাপ হইতে এবং অপরাধ হইতে ও সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

নাম শাস্ত্রবিশ্বাস প্রদানকারী। বর্ত্তমান সময়ে শাস্ত্রের প্রতি লোকের বিশ্বাস কমিয়া গিয়াছে। এইজন্য প্রায়ই লোকে শাস্ত্রের কথা মানিতে চায় না; কেহবা মুখে মানে বটে, কিন্তু কার্য্যকালে শাস্ত্রবিগর্হিত কাজ

করিয়া বসে। প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রে যতক্ষণ সুদৃঢ় বিশ্বাস না জন্মায় ততক্ষণ মানুষ শাস্ত্র-আজ্ঞা পালন করিতে সমর্থ হয় না।

শাস্ত্রে বিশ্বাস জন্মিলে, শাস্ত্র-আজ্ঞাপালন কষ্টকর হয় না। শাস্ত্র-বিগর্হিত কাজ করিতে প্রাণই চায় না। শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে গেলে প্রাণে বড় আঘাত লাগে। তখন শাস্ত্র-আজ্ঞা পালন না করিয়া মানুষ থাকিতে পারে না।

এই যে শাস্ত্রে বিশ্বাস ইহা নাম আনয়ন করিয়া দেয়।

নাম শুদ্ধাভক্তিপ্রদাতা। একমাত্র নাম হইতেই শুদ্ধাভক্তির উদয় হইয়া থাকে। শুদ্ধাভক্তির কথা আমি প্রথমখণ্ডে আপনাদিগকে জানাইয়াছি। ইহা সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত অনির্ব্বচনীয় বস্তু। প্রকাশ করিয়া বলিবার নহে।

এই শুদ্ধাভক্তি ঘনীভূত হইলেই অপ্রাকৃত শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেম প্রকাশ পায়। ইহা প্রকাশের জিনিষ নহে, সম্ভোগের জিনিষ। এ সব কথা প্রথমখণ্ডে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

এই পৃথিবীতে যত কিছু সাধনপ্রণালী বর্ত্তমান আছে ও তাহাতে মানুষ যাহা কিছু লাভ করিতে পারে, একমাত্র নাম হইতেই তৎসমুদয় লাভ হইয়া থাকে।

যাঁহাকে লাভ করিলে মানুষের আর কিছুই অলভ্য থাকে না, এই নাম হইতে সেই দুর্ল্লভ হইতে সুদুর্ল্লভ পুরাণ পুরুষ অর্থাৎ নামী লাভ হইয়া থাকে।

সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া কেহ যেমন সূর্য্যলোকে গমন করিতে পারে না, বৃষ্টির বারিধারা অবলম্বন করিয়া কেহ যেমন আকাশে উঠিতে পারে না, তেমনি কেবল পুরুষকার বলে কেহ ভগবানকে লাভ করিতে পারে

আমি একটা কীটানুকীট মাত্র। আমি নামের মহিমা কি বর্ণনা করিব? অনন্তদেব অনন্তমুখে অনন্তকাল পর্য্যন্ত নামের মহিমা বর্ণন করিলেও শেষ করিতে পারেন না। আমার নামমহিমা বর্ণনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র।

যাঁহারা নামের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন নামের আশ্রয় লয়েন। নাম কৃপা করিয়া আত্মপ্রকাশ না করিলে, নামের মহিমা হৃদয়ঙ্গম হয় না।

শুনা কথার মূল্য বড়ই কম। শুনা কথা হৃদয়স্পর্শী হয় না। লোকেও সকল কথা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে না। এইজন্য বলিতেছি আপনারা নামের আশ্রয় লউন, নাম নিজেই আত্মপ্রকাশ করিবেন। তখন সকল ধান্দা মিটিয়া যাইবে।

আমি নামের নিকট বহু অপরাধে অপরাধী। তথাপি তিনি যে আমাকে আপন আশ্রয়াধীনে লইয়াছেন ইহাতে তাঁহার অপার করুণাই প্রকাশ পাইয়াছে।

আমি ঘোর পাতকী, আমার হৃদয় অত্যন্ত কলুষিত, কেবল আত্মশুদ্ধির জন্য অদ্য আমি নামসাগরের অতলজলের কণামাত্র স্পর্শ করিলাম।

আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন আমি যেন নামের মহিমা কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই এবং নামের উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে সমর্থ হই। আপনাদের চরণে আমার কোটী কোটী নমস্কার।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কর্ম্মক্ষম্

কর্ম্ম করা মানুষের স্বভাব। মানুষ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। যাহারা জড়, বিকলাঙ্গ, কর্ম্ম করিবার শক্তিহীন, তাহারাও মনে

মনে নানা কর্ম্ম করিয়া থাকে। মানুষ নিদ্রিত অবস্থাতেও কর্ম্ম করে। সুষুপ্তির সময় টের পাওয়া যায় না বটে কিন্তু স্বপ্নাবস্থাতে বেশ টের পাওয়া যায়। কর্ম্ম করিব না, বলিয়া চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব ; কারণ প্রকৃতি তাহাকে কর্ম্ম করিতে বাধ্য করিবে। এখানে তাহার স্বাধীনতা নাই।

যাহার যে রূপ অধিকার তাহার সেইরূপ কর্ম্মকরা কর্ত্তব্য। বালকের কর্ত্তব্য বিদ্যাধ্যয়ন, শিক্ষকের কর্ত্তব্য অধ্যাপনা, রাজার কর্ত্তব্য প্রজাপালন, যোদ্ধার কর্ত্তব্য যুদ্ধ করা, নারীর কর্ত্তব্য গৃহকর্ম্ম পতিসেবা ইত্যাদি ইত্যাদি।

যে কার্য্যে যাহার অধিকার নাই, সে কার্য্য করা তাহার কর্ত্তব্য নহে। কার্য্য ভালই হউক আর মন্দই হউক, অধিকার অনুসারে কায করাই কর্ত্তব্য। অনধিকারীর কায কখনও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় না ; সে ভ্রষ্টাচারী হইয়া পড়ে। আর্য্য ঋষিগণ এ সকল তত্ত্ব ভাল রূপ বুঝিতেন, একারণ তাঁহারা অধিকার-অনুসারে কায করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

পাশ্চাত্য জাতিগণের অধিকারজ্ঞান নাই, তাঁহারা স্বাধীনতার পক্ষপাতী, স্বেচ্ছানুসারে চলিতে চান। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই মানুষ বটেন, কিন্তু বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। ভগবান পুরুষহৃদয়ে পুরুষোচিত ও স্ত্রীহৃদয়ে স্ত্রী-উচিত বৃত্তি দিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উভয়ের শরীরের গঠনও বিভিন্ন।

পাশ্চাত্য জাতীয় নারীগণ এসব বুঝেন না। তাঁহারা এখন আপনাদের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুরুষজাতির কর্ম্মসকল গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহারা পতিসেবা সন্তানপালন, গৃহকর্ম্ম করিতে রাজি নন, এখন তাঁহারা স্নেহ, মমতা, দয়া, দাক্ষিণ্য পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য কামান বন্দুক হাতে লইতে উদ্যত হইয়াছেন ; রাজনৈতিক আন্দো-

অশান্তি উপস্থিত করিতেছেন। এ সমস্ত প্রকৃতির বিকৃতি; ইহা কদাচ কল্যাণকর নহে। ইহার ফল বিষময় জানিবেন।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে উভয়পক্ষীয় রাজগণ সসৈন্যে রণক্ষেত্রে সমাগত হইলে অর্জ্জুন মহাশয় দেখিলেন উভয়পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে পিতৃব্যগণ, আচার্য্যগণ, মাতুলগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, শ্বশুরগণ, মিত্রগণ এবং আর আর আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবগণ যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই এই যুদ্ধে নিধনপ্রাপ্ত হইবেন।

ইহ সংসারে যাহাদিগকে লইয়া সুখ, সেই সকল আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের বিনাশ-চিন্তায় অর্জ্জুন মহাশয়ের মোহ উপস্থিত হইল। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

হে কৃষ্ণ! হে মধুসূদন! আত্মীয়স্বজনের বিনাশচিন্তায় আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। আমার সর্ব্বশরীর বিকম্পিত হই-তেছে, বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে। আত্মীয়স্বজনকে বিনাশ করিয়া রাজ্যসুখ ভোগ করিতে ইচ্ছা করি না। তুমি রথ ফিরাও, আমি কদাচ যুদ্ধ করিব না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রকৃতি বেশ বুঝিতেন। অর্জ্জুন রাজকুলে ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি তাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। দয়া, ক্ষমা, বৈরাগ্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত প্রকৃতি তাঁহার নহে। এই যে যুদ্ধে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা স্থায়ী জিনিষ নহে, ইহা একটা শ্মশানবৈরাগ্য মাত্র।

এখন যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়াছে। যুদ্ধ বন্ধ হইলে সমবেত রাজগণ দেশে ফিরিয়া যাইবেন। তখন অর্জ্জুন বনচারী হইয়াও স্থির থাকিতে পারিবে না। ক্ষত্রিয়তেজ ও ক্ষত্রিয়প্রকৃতি তাহাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, দ্রৌপদীর এক ফোঁটা চক্ষের জল বা ভ্রাতৃগণের বিরস বদন দেখিলেই

দুদিন পরে অর্জ্জুন গাণ্ডীবহস্তে যুদ্ধার্থে ছুটিয়া আসিবেন। তখন এই সুযোগ থাকিবে না, তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত, অনুতাপানলে দগ্ধীভূত ও বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে। ভগবান এই বুঝিয়া মোহপ্রাপ্ত অর্জ্জুনকে বলিলেন।

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহ"

নিজের ধর্ম্মে মৃত্যু হয় সেও ভাল, পরের ধর্ম্ম ভয়াবহ জানিবে।

অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, তাঁহাকে ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতেই উৎসাহিত করিলেন।

যে ব্যক্তি অধিকার বুঝিয়া সোজা পথে চলে, এজন্মে নাই হউক, পর-জন্মে নিশ্চয়ই সে একটা সুপথ পাইবে। যে ব্যক্তি বাঁকা পথে চলে, যে ব্যক্তি কপটাচারী তাহাকে বহু দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইবে। বহু-জন্মেও সে সুপথ পাইবে না।

এখন দেখিতে পাই, অনেক ধূর্ত্তলোক সাধুর বেশ ধারণ করিয়া সাধু সাজিয়া, অল্পবুদ্ধি লোকগণকে মুগ্ধ করিয়া আপনাদের স্বার্থ সাধন করিয়া বেড়াইতেছে। এই সকল লোক প্রতারক। কপটাচারী ব্যক্তিগণের কোন কালেও উদ্ধার নাই। ভগবানের রাজ্যে কাহারও ফাঁকি, দমবাজি খাটে না। এই সকল লোকের নিকট তাহা কড়ায় গণ্ডায় নিশ্চয় আদায় হইবে জানিবেন।

যদিও প্রকৃতি-অনুসারে সরলভাবে সকলেরই সোজাপথে চলা কর্ত্তব্য, তথাপি যে কর্ম্মে মানুষের কল্যাণ হয় ও মনুষত্ব জন্মে, সেই কায করিতে যত্ন-বান হওয়া উচিত। পুরুষকার একটা সাধন, ইহা ফেলিবার জিনিষ নয়। ভগবান আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়াছেন, হিতাহিত জ্ঞান দিয়াছেন, আমাদের একটা স্বাধীনতা আছে, এমত অবস্থায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝে চলাই উচিত। প্রবৃত্তির স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া ভাসিয়া চলা উচিৎ নয়।

সাধারণত মানুষ আপন হিতাহিত বুঝে না এমত নহে, কেবল অপরাধ ও দুষ্প্রবৃত্তি তাহাকে সৎপথে চলিতে দেয় না। এমত অবস্থায় প্রবৃত্তির সহিত সাধ্যমত সংগ্রাম করা কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তি কৃপণ, যাহার মধ্যে অর্থাসক্তি অত্যন্ত প্রবল, তাহার দানকার্য্যে ব্রতী হওয়া উচিত। সামান্য দান করিতে তাহার অত্যন্ত ক্লেশ হইবে, হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যাইবে সত্য, তথাপি ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোক কান বুঁজিয়া যদি কিছু কিছু দান করিতে পারে, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে তাহার অর্থাসক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে, হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা দূর হইবে। নতুবা ক্রমশই অর্থাসক্তি বাড়িয়া যাইবে, হৃদয় অধিকতর সঙ্কীর্ণ হইতে থাকিবে।

যে ব্যক্তি অভিমানী তাহার পক্ষে জীবের ও মনুষ্যের সেবা করা কর্ত্তব্য। সেবা করিতে পারিলে ক্রমে ক্রমে তাহার অভিমান দূর হইবে। নতুবা অভিমান ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

যে ব্যক্তি উৎপথগামী তাহার শাস্ত্রপাঠ ও সৎসঙ্গ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ করিতে পারিলে সে সংযত হইতে পারিবে।

যে ব্যক্তি ক্রোধী, ক্রোধের উদ্দীপনা হইবামাত্র তাহার স্থান ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ, যাহার পক্ষে যাহা কল্যাণকর, তাহার সেই কাজ করা কর্ত্তব্য।

ভগবান মনুষ্য হৃদয়ে সাধুবৃত্তি সকলের বীজ বপন করিয়া রাখিয়াছেন। উপযুক্ত রূপ সেক জল পাইলেই উহারা অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হইবে। সেক জল না পাইলে উহারা শুকাইয়া যাইতে থাকিবে।

কর্ম্ম ভালই হউক আর মন্দই হউক, কর্ম্ম করিলেই মানুষকে কর্ম্মসূত্রে জড়িত হইতে হইবে। শাস্ত্রানুমোদিত শুভ কর্ম্ম করিলে তাহার ফল স্বরূপ স্বর্গাদি ভোগ করিতে হইবে। ভোগাবসানে আবার জন্ম

গ্রহণ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কুকর্ম্ম করিলে নরক যন্ত্রণা ভোগের পর মানুষ ইতর প্রাণীতে জন্মগ্রহণ করিয়া দুষ্কৃতির দুর্ভোগ ভোগ করিতে থাকিবে।

কর্ম্মফল ভোগের জন্য মানুষের যে পুনঃপুনঃ গতাগতি ইহারই নাম কর্ম্মসূত্র। আজ মানুষ একটা কাজ করিল, ইহার ফলস্বরূপ হয়ত তাহাকে দশটা কাজ করিতে হইবে, আবার এই যে দশটা কাজ করিবে ইহার ফলস্বরূপ হয়ত তাহাকে পঁচিশটা কাজ করিতে হইবে। এইরূপ মানুষ যতই কাজ করিবে, ততই কর্ম্মসূত্র বাড়িয়া যাইবে, এবং তাহাকে দৃঢ় হইতে সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে। কর্ম্মেরও শেষ নাই, সুখ দুঃখ ইত্যাদি কর্ম্মফল ভোগের জন্য পুনঃপুনঃ যাতায়াতেরও বিরাম নাই। মানুষ ভববন্ধনে আবদ্ধ।

কর্ম্ম ত্রিবিধ। ক্রিয়মান, সঞ্চিত ও প্রারব্ধ। যে কর্ম্ম করিয়া যাইতেছি, ইহা ক্রিয়মান কর্ম্ম। কর্ম্মের ফলস্বরূপ ভবিষ্যৎ যাহা আমাকে করিতে হইবে তাহা সঞ্চিত, আর সঞ্চিত কর্ম্মের যে অংশটুকু ফলোন্মুখী হইয়াছে ও যাহা ভোগ করিবার জন্য দেহ ধারণ হইয়াছে তাহাকে প্রারব্ধ কর্ম্ম কহে।

মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়া স্ব ইচ্ছায় নূতন কর্ম্ম করে, আর যাহা প্রারব্ধ কর্ম্ম, তাহা তাহাকে করিতেই হয়। ভোগ ব্যাতিরেকে এই কর্ম্ম এড়াইবার উপায় নাই।

কর্ম্মের মধ্যে কোনটি নূতন আর কোনটি প্রারব্ধ এইটি ঠিক করিতে হইলে, যে কর্ম্ম আমি স্বেচ্ছায় করি; যাহা করিলেও করিতে পারি, আর না করিলেও না করিতে পারি, তাহাই আমার নূতন কর্ম্ম। যাহা করিতে আদৌ ইচ্ছা নাই অথচ না করিয়া থাকিতে পারি না, তাহাই আমার প্রারব্ধ কর্ম্ম।

একজন ব্যভিচারী বেশ জানে যে, ব্যভিচার করা অত্যন্ত দুষনীয়। ব্যভিচার করিলে শরীর নষ্ট হয়, আয়ু ক্ষয় হয়, অর্থনাশ হয়, জনসমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়, পারিবারিক অশান্তি উপস্থিত হয়। এসব জানিয়াও সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। কিছুতেই ব্যভিচার করিব না মনে করিয়াও সে ব্যভিচার হইতে ক্ষান্ত হইতে পারে না। তাহার শরীর এমনি উপাদানে গঠিত যে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সে হাজার চেষ্টা করিয়াও আত্মসম্বরণ করিতে অসমর্থ। এই স্থানে বুঝিতে হইবে এই যে ব্যভিচার কার্য্য, ইহা তাহার প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ।

কর্ম্ম করিলেই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে, তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণরূপ ব্যাধিগ্রস্থ হইতে হইবে এই আশঙ্কায় কাহারও কর্ম্ম পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়।

কর্ম্মক্ষয়ের পূর্ব্বে যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ করে তাহাদের সঞ্চিত কর্ম্ম থাকিয়া যায়। ভোগাভাবে কর্ম্মক্ষয় না হওয়ায় পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ-রূপ বিপদগ্রস্থ হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

যাহারা আলস্যপরবশ হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করে তাহাদের মত হত-ভাগ্য জীব আর নাই, তাহাদের জীবন ভারবহ। অতিক্লেশে তাহারা দিন যামিনী ক্ষেপন করে। ধনীর সন্তানগণ মধ্যে কেহ কেহ বৃথা সময় কাটাইবার জন্য স্বার্থপর তোষামদকারিগণের চাটুবাক্যে চিত্তবিনোদনের প্রয়াসী হয়, কখনও বা নেশা করিয়া আপনাকে বিস্মৃতিসাগরে ডুবাইয়া রাখে। তাহাদের স্বাস্থ্য অচীরে ভগ্ন হইয়া পড়ে, এ কারণ তাহারা অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়।

কাজ না করিলে সমাজ রক্ষা হয় না, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, নানা বিপদ উপস্থিত হয়, এ কারণ সকলেরই কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।

মহাত্মাগণের যদিও কোন কাযের প্রয়োজন নাই:তথাপি সমাজ ও

সংসার রক্ষার জন্য তাঁহারা কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাঁহারা কায না করিলে তাঁহাদের দেখাদেখি অপরে কায করিবে না, জনসমাজকে কু-দৃষ্টান্ত দেখান হইবে এই আশঙ্কায় তাঁহারা প্রচুর কর্ম্ম করিয়া থাকেন। কর্ম্মশেষ হইয়া গেলেও তাঁহারা কর্ম্ম করিতে বিরত হন না।

কর্ম্ম থাকিতে কাহারও কর্ম্ম-সন্ন্যাস গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়। উহা সর্ব্ববিধ অনর্থের মূল।

কর্ম্ম করিয়া যাহাতে কর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইতে না হয় এই জন্য শাস্ত্রে নিষ্কাম কর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়াছে।

একমাত্র ভগবান কর্ত্তা, মানুষ উপলক্ষমাত্র, ভগবান যন্ত্রী মানুষ যন্ত্র মাত্র। তিনি যখন যে ভাবে পরিচালিত করিতেছেন মানুষ সেই ভাবেই পরিচালিত হইতেছে। মানুষের নিজের কোন বাসনা নাই, কামনা নাই, জয় নাই, পরাজয় নাই, নিন্দা নাই, প্রতিষ্ঠা নাই, লাভ নাই, ক্ষতি নাই, এইরূপ মনে করিয়া কাজ করাকে নিষ্কাম কর্ম্ম করা বলে। নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে মানুষকে কর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইতে হয় না।

নিষ্কাম কর্ম্ম শুনিতেই ভাল, কিন্তু ইহার অনুষ্ঠান কি সম্ভবপর? মানুষ স্বার্থের দাস, বাসনা কামনা ও প্রবৃত্তি সকল তাহাকে যে ভাবে পরিচালিত করিতেছে, মানুষ সেই ভাবেই পরিচালিত হইতেছে। তাহার স্বাধীনতা কোথায়? সে কি প্রকারে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইবে?

কৃষ্ণার্জ্জুন নরনারায়ণ ভূভার হরণ জন্য তাঁহারা ধরাধামে অবতীর্ণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন মহাশয়কে কামনারহিত হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য শ্রীমুখে উপদেশ দিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন মহাশয় তাহাতে সমর্থ হইলেন কি?

যুদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, পুত্র অভিমন্যু ব্যূহ ভেদ করিয়া বূহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মহাযুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন, জয়দ্রথ ব্যূহদ্বার রক্ষায় নিযুক্ত থাকিয়া পাণ্ডবপক্ষীয় কোন বীরকেই ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় নাই, অভিমন্যুকে একাকী পাইয়া সপ্তরথী মিলিয়া তাহাকে অন্যায় যুদ্ধে নিহত করিয়াছে, তখনই তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "আগামী কল্য হয় আমি জয়দ্রথকে নিপাত করিব, নতুবা আত্মহত্যা করিব।"

কর্ণপর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ণ-বাণে ক্ষত বিক্ষত, পরাজিত ও অপমানিত হইয়া শিবিরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। দিবসের যুদ্ধ শেষ হইলে যখন অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে আসিলেন তখন মর্ম্মাহত রাজা ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুরাত্মা কর্ণকে নিপাৎ করিয়া আসিয়াছ ত ?" অর্জ্জুন এ সব ব্যাপার কিছু জানিতেন না, তিনি উত্তর করিলেন, "না"।

তখন ক্ষুব্ধ মহারাজ অর্জ্জুনকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি বৃথা গাণ্ডীব ধারণ করিয়াছ। তোমার বীরত্বে ধিক !"

অর্জ্জুন পরম ভ্রাতৃভক্ত। তিনি কখনও যুধিষ্ঠিরের অবাধ্য হন নাই, ভ্রাতার নিকট কখনও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন নাই। আজ কিন্তু ক্ষত্রিয় বীর অর্জ্জুনের বীরত্বের নিন্দা সহ্য হইল না, তিনি হতজ্ঞান হইয়া ক্রোধান্ধ হইয়া নিষ্কাষিত অসি হস্তে রাজা যুধিষ্ঠিরকে কাটিতে উদ্যত হইলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিবারণ করিলেন।

তাই বলিতেছি নিষ্কাম কর্ম্ম করা কি সোজা কথা! যে সকল মহাত্মার কর্ম্ম শেষ হইয়াছে, যাঁহারা মায়াশক্তি দ্বারা পরিচালিত নহেন কেবল তাঁহারাই নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে সমর্থ। মহাত্মারা কর্ম্ম করেন বটে কিন্তু নিষ্কাম ভাবেই কর্ম্ম করিয়া থাকেন। অন্যের পক্ষে ইহা অসম্ভব। তাই বলিতেছি, কথা গুলি শুনিতেই ভাল, কাযের কিছু নহে।

'কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হইতে না হয় তজ্জন্য শাস্ত্রে আর একটি উপায় অবলম্বনের কথা আছে। সেইটি ভগবানে কর্ম্মার্পণ। ভগবান শ্রীমুখে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

হে কুন্তী-নন্দন! তুমি যাহা কর, যাহা আহার কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর এবং যে তপস্যা কর, তৎ সমস্তই আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) অর্পণ কর।

একথাটিও বেশ কথা, কর্ম্মফল ভোগ এড়াইবার উপায় বটে। একারণ প্রত্যেক কর্ম্মানুষ্ঠানের পর শাস্ত্রকারগণ কর্ম্মকর্ত্তাকে একটি মন্ত্র উচ্চারণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কর্ম্মকর্ত্তাকে বলিতে হয়—

"এতৎ কর্ম্মফলং যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু"

এই কর্ম্মের যাবতীয় ফল সর্ব্বযজ্ঞের ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হউক। তোতা পাখীর ন্যায় মুখে একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিলে কি কর্ম্মপাশ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়? কর্ম্মকর্ত্তা কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে একটা না একটা কামনা দ্বারায় পরিচালিত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কর্ম্মফল ভোগ বাসনা তাহার অন্তরে বলবতী হইয়া রহিয়াছে। এমত অবস্থায় মুখে একটু মন্ত্র উচ্চারণ করিলে কি হইবে?

মন্ত্র উচ্চারণ কেবল পুরোহিতের আজ্ঞা পালন, শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা, আর মনকে আঁখি ঠারা। ফলত ইহাতে কর্ম্মবন্ধন হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।

যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য ভগবান, অর্জ্জুন মহাশয়কে বহু উপদেশ দিলেন। সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, সন্ন্যাসযোগ ইত্যাদি যাবতীয় যোগ-তত্ত্বের কথা বলিলেন, সর্ব্বশেষে কিন্তু বলিলেন অর্জ্জুন।

এসব কিছুই নহে তুমি সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

আমি তোমাকে যে সকল ধর্ম্মের কথা বলিলাম, তৎসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া তুমি আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত করিব।

ভগবান শ্রীমুখে একথা অর্জ্জুনকে বলিলেন বটে, কিন্তু অর্জ্জুন মহাশয় কি ইহা প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইলেন?

যে সময় ভগবান অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন, সেই সময় যদি গাণ্ডীব খানা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া অর্জ্জুন মহাশয় একান্তভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উপদেশ পালন করা হইত। কিন্তু ভগবানের উপদেশে অর্জ্জুনের মধ্যে বিচারবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন একান্তভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হইবার অধিকার তাঁহার নাই। ক্ষত্রিয়প্রকৃতি তাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান, একারণ তিনি যুদ্ধেই প্রবৃত্ত হইলেন।

অর্জ্জুনের ন্যায় ব্যক্তি যাহা প্রতিপালন করিতে অসমর্থ প্রাকৃত মানুষ তাহা কি প্রকারে পালন করিবে?

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামধর্ম্মে এ সব বিপদ নাই। সদ্গুরুর নিকট নাম পাইবামাত্র, জীবের কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। ক্রিয়মান্ কর্ম্মের জন্য তাহাকে কর্ম্মসূত্রে জড়িত হইতে হয় না। সঞ্চিত কর্ম্মও নষ্ট হইয়া যায়, কেবলমাত্র সাধককে প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ করিতে হয়।

"প্রারব্ধ কর্ম্মানাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ।" ভোগ ব্যতিরেকে প্রারব্ধ

কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। কিন্তু নামের এমনি মহিমা যে নাম করিতে পারিলে এক মাত্র নাম দ্বারায় এই প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায়।

প্রারব্ধ কর্ম্ম বড় শক্ত জিনিস, ইহা সাধককে নাম করিতে দেয় না, বড়ই বাধা উপস্থিত করে, হৃদয়ে শুষ্কতা আনিয়া দেয়। এজন্য নাম লইয়া কর্ম্মকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়। নাম ও কর্ম্ম উভয়ই প্রাণপণে করা চাই। এইরূপ করিলে কর্ম্ম নামের সহায় হন। সাধকের প্রাণ সরস থাকে, নাম করা সহজ হয়। শীঘ্র প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ হইয়া কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায়।

সদ্‌গুরু দীক্ষা দিবার সময় বলিয়াছেন "তোমাদের পথ জলন্ত হুতাশনের মধ্য দিয়া, তোমাদিগকে পুড়িয়া ছারখার হইতে হইবে। সাবধান, ডাহিনে বামে না তাকাইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক গন্তব্য পথে চলিয়া যাইবে, সময়ে নিশ্চয়ই শান্তিলাভ করিবে।"

কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য। আমি ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। আমার উপর দিয়া বহু পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। 'মহা পাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুর লীলা' নামক পুস্তকে এবং 'সদ্‌গুরু ও সাধনতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে তাহার কিছু কিছু বর্ণনা করিয়াছি। সকল কথা প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে।

এই বিপদ কালে একমাত্র নামই অযাচিতভাবে আমার নিকট থাকিয়া আমার সহায় হইয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। তিনি সহায় না হইলে আমার যে প্রাণ রক্ষা হইত, ইহা আমার বোধ হয় না।

আমি শাস্ত্র ও সাধুমুখে শুনিয়াছি। নাম সহায় থাকিলে কেহই তাহার অনিষ্ট করিতে পারে না। অন্যের কথা দূরে থাকুক ভগবান স্বয়ং বিপক্ষতা করিলে তাঁহাকেও পরাস্ত হইতে হইবে।

এখন কথা হইতেছে মানুষের যে প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ হইল, ইহা কি প্রকারে বুঝা যাইবে।

প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় হইলেই অনর্থের নিবৃত্তি হইবে, আর কর্ম্মে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইবে। অনর্থের * নিবৃত্তি, ও কর্ম্মে নির্ব্বেদ প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয়ের প্রমাণ জানিবে।

প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় হইলেও সাধুগণ একেবারে কর্ম্ম ত্যাগ করেন না। কর্ম্ম ত্যাগ করিলে জনসমাজকে কুদৃষ্টান্ত দেখান হয়, কেবল এই জন্য তাঁহারা কর্ম্ম করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥

মহাত্মাগণ যেরূপ আচরণ এবং যেরূপ প্রমাণ প্রদর্শন করেন, প্রাকৃত লোকে তাহারাই অনুগামী হইয়া থাকে।

কেবল লোকরক্ষার জন্য মহাত্মাগণ কর্ম্ম করিয়া থাকেন—আহার নিদ্রা শৌচ প্রস্রাব যেমন দেহ স্বভাবে হয়, তাঁহাদের কর্ম্মও তদ্রূপ হইয়া থাকে। ফলত কর্ম্মে তাঁহাদের কোনরূপ অভিনিবেশ থাকে না।

কর্ম্মক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানে রতি জন্মে। নাম করিতে করিতে ইহা ক্রমশ প্রেমে পরিণত হইয়া মানুষকে কর্ম্মের বাহির করিয়া দেয়। তখন মানুষের দ্বারায় আর কোন সংসারের কর্ম্ম হইবার উপায় থাকে না। ভক্ত ভগবৎপ্রেম-সাগরের অতল জলে ডুবিয়া যায়।

আমি এজীবনে বহু দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। আমার উপর দিয়া বিষম পরীক্ষা গিয়াছে। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন আর যেন আমাকে কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইতে না হয়। আপনাদের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম।

---

* ভজনের যাহাকিছু বিঘ্নকর তাহাই অনর্থ জানিবেন

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

গ্রন্থকারের নিবেদন।

আমি ভক্ত বৈষ্ণব বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। বৈষ্ণব ধর্ম্ম আমার কুলধর্ম্ম। পাশ্চাত্য শিক্ষায় স্বাধীন চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া আমি যৌবনে বৈষ্ণম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নবীন ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মদিগের সহবাসে থাকিয়া আমি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের ঘোর বিদ্বেষ্টা হইয়া উঠিয়াছিলাম। সাধু, শাস্ত্র, গুরু, এবং দেবতাসকল আমার নিকট ঘৃণিত হইয়াছিল, অধিক কি বলিব আমি একজন দ্বিতীয় কালাপাহাড় হইয়া উঠিয়াছিলাম।

কৃপার পাত্রাপাত্র বিচার নাই। আমার দুর্গতি দেখিয়া সদ্‌গুরু কৃপা-পরবশ হইয়া নিজ পদপ্রান্তে লইয়া যাইবার জন্য অলৌকিক কৌশলজাল বিস্তার করিলেন। * আমি তাঁহার জালে পড়িলাম। তিনি আমাকে তাঁহার নিজ পদপ্রান্তে টানিয়া লইয়া গেলেন, এবং আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে ভগবানের অমৃতময় নাম প্রদান করিলেন। আমার মৃতদেহে মৃত সঞ্জীবনী ছড়াইয়া দিলেন। আমি জীবন পাইলাম, গুরুকৃপা ও নামের শক্তিতে ক্রমে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মহিমা আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। আমি নিজেই মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম পৃথিবীর সার ধর্ম্ম। ইহার উপর আর ধর্ম্ম নাই। এই বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত ত্রিতাপদগ্ধ জীবের জুড়াইবার আর স্থান নাই। সংসার

---

* "মহাপাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুর লীলা" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

মরুভূমে এই ধর্ম্মই এক মাত্র মন্দাকিনী। ইহার সুশীতল সলিলে অবগাহন করিয়া ত্রিতাপদগ্ধ মায়ামুগ্ধ জীব পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকে।

বৈষ্ণবধর্ম্মের মলিনতা দেখিয়া অনেক ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। এই ধর্ম্মের মলিনতা দূর করিবার জন্য তাঁহারা বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রকাশ ও প্রচার করিতেছেন। সংস্কৃত অধ্যয়নের বন্দোবস্ত করিতেছেন, মাসিক ও সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করিতেছেন। সভা সমিতি করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দরিদ্র বৈষ্ণবদিগের সাধন ভজনের আনুকূল্য জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। নানা স্থানে হরি-সভা সংস্থাপন করিতেছেন। উৎসবাদি নির্ব্বাহ করিতেছেন। পুস্তক লিখিয়া ও বক্তৃতা করিয়া অনেকে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করিতেছেন।

বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নতি হয়, কলিহত লোক জীবন পায়, ত্রিতাপজ্বালা নির্ব্বাপিত হয়, ইহা আমার প্রাণের একান্ত বাসনা। অনেক ধর্ম্মপ্রাণ বৈষ্ণবের সহিত আমার আলাপ আছে। তাঁহারা আজন্মকাল প্রাণপণে, বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজন করিয়া আসিতেছেন। ধর্ম্ম সাধন জন্য বহুকাল হইতে তাঁহারা বহু আয়াস সহ্য করিতেছেন, অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন, দুঃখের বিষয় প্রাণের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে না; বরং যৌবনের উৎসাহ, উদ্যম, নিষ্ঠা, বয়োবৃদ্ধি সহকারে কমিয়া যাইতেছে। তাঁহাদের মুখে নৈরাশ্যের ছায়া প্রকাশ পাইতেছে।

ভক্ত বৈষ্ণবগণের এই দুরবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছে। তাঁহারা রোগের নিদান জানিতে পারিতেছেন না, সুতরাং ঔষধের ও ব্যবস্থা হইতেছে না। আমি ভবরোগবৈদ্য সদ্‌গুরুর কৃপায় বর্ত্তমান বৈষ্ণব সমাজের রোগ টের পাইয়াছি। এইজন্য রোগের নিদান ও ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছি। যদি কেহ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই ঔষধ সেবন

করেন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি তিনি ভবরোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন।

সভাসমিতি বক্তৃতা করিয়া, খবরের কাগজ ইত্যাদিতে প্রবন্ধ লিখিয়া কিছু হইবে না। ইহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের কোন উন্নতি হইবে না, তবে দল বাড়িতে পারে। সাধারণ বৈষ্ণবেরা জানেন না, যে তাঁহাদের রোগ কোথায়। রোগ টের পাইলে ত চিকিৎসার বন্দোবস্ত? রোগের কথা বলিয়া দিলেও তাঁহারা যে আমার কথা বিশ্বাস করিয়া প্রতিবিধানের চেষ্টা করিবেন ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে আজ বর্ত্তমান বৈষ্ণবধর্ম্মের রোগের কথা লিখিয়া জানাইতেছি; আমার একান্ত অনুরোধ ভক্তবৈষ্ণবগণ যেন সাম্প্রদায়িক ও একদেশদর্শিতা পরিত্যাগ করিয়া, পক্ষপাতশূন্য হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে আমার কথায় কর্ণপাত করেন।

আমি একজন নগন্য উকিল। বিষয় কর্ম্মে ব্যাপৃত সংসারী লোক বলিয়া আমার কথাগুলি ঘৃণাসহকারে পরিত্যাগ করিবেন না।

আমি নগন্য হইলেও আমার পশ্চাতে সদ্‌গুরু ও মহাত্মাগণ আছেন। আমি শোনা কথা বা বই পড়া কথা বা নিজের খেয়ালের বা মতের কথা কিছুমাত্র লিখিতেছি না। এরূপ কথার মূল্য নাই।

লোকে এখন মতবাদ লইয়া ব্যস্ত। সকলে আপন আপন মত প্রচার করিতে চায়। মায়াবদ্ধ ভ্রান্ত জীব বুঝে না, যে তাহার মতের মধ্যে কতটুকু সত্য নিহিত আছে। সংস্কার ও সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি যে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহার জ্ঞানকে যে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহা সে আদৌ টের পায় না।

বৈষ্ণবসমাজ আমার এ পুস্তক স্পর্শ করিবেন না, ইহা আমি বেশ জানি। পুস্তক পাঠ করা দূরে থাকুক তাঁহারা আমার যথেষ্ট নিন্দা করিবেন, আমার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করিবেন, ইহাতে আমার সন্দেহ

নাই। পুস্তক ছাপা হইবার পূর্ব্ব হইতেই আমি ইহার আভাস পাইতেছি। বৈষ্ণব সমাজের নিকট আমার কোন আশা ভরসা নাই। দারুণ কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিলাম। ইহাতে ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা ও ধর্ম্মপিপাসু বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজ যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। শিক্ষিত সমাজের সংস্কার, দলীয় বুদ্ধি বা ধর্ম্মাভিমান নাই ; এই পুস্তক পাঠে নিশ্চয় তাঁহারা উপকার লাভ করিবেন।

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের মধ্যে অধিকাংশই 'কুচ্‌নেহি মাস্তার' দল। এক মাত্র গুরুদত্ত নামের শক্তিই তাঁহাদিগকে হিন্দু করিয়াছেন ও বৈষ্ণব করিয়া তুলিতেছেন।

গোস্বামী মহাশয় প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাদিগকে কিছু বলা উচিত মনে করেন নাই। কেবল নিজের আচরণ দ্বারায় পরোক্ষভাবে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্যাণ্ডারিয়াস্থ আশ্রমের সাধন-কুটীরের দেওয়ালের গাত্রে চক খড়ির দ্বারায় নিজ হস্তে একটি নিশান অঙ্কিত করিয়া যে কয়টি কথা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা এক একটি অমূল্য রত্ন। শ্রদ্ধাসূত্রে গাঁথিয়া এই রত্ন মালা প্রত্যেক ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তির বিশেষত তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যগণের কণ্ঠে ধারণ করা কর্ত্তব্য। এই কথা কয়টি কেহ যেন বিস্মৃত না হন। সকলের অবগতির জন্য ঐ কথা কয়েকটি নিম্নে লিখিয়া দিলাম। কুটীরের উত্তর দেওয়ালের নিজহস্তে লিখিত—

ওঁ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যায় নমঃ

কুটীরের অভ্যন্তরে উত্তর দেওয়ালের গাত্রে—

এইছা দিন নাহি রহেগা।

১। আত্মপ্রশংসা করিও না।

২। পরনিন্দা করিও না।

৩। অহিংসা পরমোধর্ম্ম।

৪। সর্ব্বজীবে দয়া কর।

৫। শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর।

৬। শাস্ত্র ও মহাজনের আচারের সঙ্গে যাহা মিলিবে না তাহা বিষবৎ ত্যাগ কর।

৭। নাহংকারাৎ পরোরিপুঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভগবৎ-শক্তির অভাব।

মানুষের রোগ জন্মিলে দেহ যেমন ক্রমশঃ জরাজীর্ণ হইয়া পড়ে, তেমনই ধর্ম্মের রোগ জন্মিলে ধর্ম্মও মলিন হইয়া পড়ে। কেবলমাত্র পথ্যে রোগ সারে না, রোগী প্রায়ই কুপথ্য করিয়া রোগের বৃদ্ধি করে। কুপথ্যই তাহার ভাল লাগে।

সাধনরাজ্যেও কেবল সাধন দ্বারায় উচ্চধর্ম্ম লাভ করা অসম্ভব হয়। সাধনবলে ধর্ম্মলাভ করিতে যাওয়া, আর সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া সূর্য্য-মণ্ডলে গমন করিতে যাওয়া একই কথা। পুরুষকার প্রয়োজন, কিন্তু দৈব অনুকূল না হইলে কেবল পুরুষকারে বিশেষ ফল হয় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সাধন আছে, ভজন আছে, সদাচার, সদাহার, ত্যাগস্বীকার, বৈরাগ্য সমস্তই আছে, নাই কেবল ধর্ম্মের জীবন।

ভগবৎশক্তিই ধর্ম্মের জীবন। যে ধর্ম্মে ভগবৎশক্তি নাই, সে ধর্ম্ম মৃত। মৃত ধর্ম্ম যাজন করিয়া কেহ উচ্চ অবস্থা লাভ করিতে পারে না, ত্রিতাপজ্বালা এড়াইতে পারে না। দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে

না। বহু বৈষ্ণব বহু সাধন করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের কোন পরিবর্ত্তন হইতেছে না, হৃদয়গ্রন্থি সকল বিনষ্ট হইতেছে না। এই জন্ত তাঁহারা মনে করেন, অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম, অনুষ্ঠানের ক্রটি দেখিলেই তাঁহারা মানুষকে ধর্ম্মহীন বলিয়া মনে করেন।

যাহার অনুষ্ঠানের তীব্রতা যত অধিক সে বৈষ্ণবগণের চক্ষে ততই ধার্ম্মিক। ধর্ম্ম জিনিষটা যে কি, তাহা ইঁহাদের জ্ঞান নাই।

ধর্ম্ম প্রাণের বস্তু, স্বতন্ত্র জিনিষ, ইহা জীবনে উপভোগ করিবার বিষয়। ইহা ত্রিতাপদগ্ধ জীবের পক্ষে মৃত সঞ্জীবনী, সংসার মরুভূমিতে মন্দাকিনী। একবার ইহাতে অবগাহন করিতে পারিলে সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইয়া যায়, শরীর মন শীতল হয়। বৈষ্ণবেরা বলিয়া থাকেন—

"সাধনে সাধিব যাহা।
সিদ্ধ দেহে পাব তাহা॥"

কথাটি বেশ শুনিতে ভাল কিন্তু সিদ্ধ দেহ লাভ হইবে কি প্রকারে? তাঁহারা মনে করেন, সাধন ভজন করিলেই দেহান্তে সিদ্ধ দেহ লাভ হইবে। রক্ত মাংসময় দেহটাই যতকিছু প্রতিবন্ধক।

যাহা এদেহ-বর্ত্তমানে লাভ হইল না, তাহা দেহান্তে লাভ হইবে এ কথাটা সম্পূর্ণ ভুল। এ আশা করিতে নাই।

যাহা দেহবর্ত্তমানে লাভ হইল না, তাহা যে দেহের অবসানে লাভ হইবে এটা মনে স্থান দিবেন না।

মৃত্যুতে দেহের পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু আত্মার পরিবর্ত্তন হয় না। দেহবর্ত্তমানে কামক্রোধাদি রিপুগণের ও সর্ব্ববিধ আসক্তি ও দুষ্প্রবৃত্তির বীজ নির্ম্মূল না হইলে সেই সমস্ত রিপুগণ, আসক্তি ও দুষ্প্রবৃত্তির বীজ লইয়া আত্মাকে পুনরায় দেহ ধারণ করিতে হয়। এই সমস্ত বীজ সময়ে

অঙ্কুরিত হইয়া সময়ে প্রবল হইতে প্রবলতর বৃক্ষে পরিণত হয় ও মানুষকে তাহার বিষময় ফল ভোগ করাইতে থাকে।

দেহ বর্ত্তমান থাকা কালে সাধন ভজন দ্বারা এই সকল বীজ নষ্ট করিতে হয়, তবে মানুষ নিরাপদ হয়; নতুবা তাহার অব্যাহতি কোথায়?

আত্মা ত্রিগুণাত্মক দেহে আবদ্ধ হইয়া নিজেই গুণত্রয়ের অধীন হইয়াছে। এই ত্রিগুণের অতীত অবস্থা লাভ না হইলে কখনই সিদ্ধদেহ লাভ হইবে না। দুস্তর মায়া বর্ত্তমান থাকিতে সিদ্ধদেহের আশা ভরসা কোথায়? জীব যদি মায়াপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় তবে-ইত সিদ্ধদেহ লাভের আশা।

মায়া ভগবানের এক প্রধান শক্তি, সামান্য জীবশক্তি দ্বারা মায়াশক্তি কি বিধ্বস্ত হওয়া সম্ভব? যতই সাধন ভজন কর না কেন, মায়া কিছুতেই যাইবে না, সিদ্ধদেহও লাভ হইবে না।

যে মায়ায় ব্রহ্মাদি দেবতাগণও মুগ্ধ, সেই মায়াকে পরাস্ত করা, তাঁহার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করা মানুষের পক্ষে কি সম্ভব? মানুষের কতটুকু শক্তি যে সে এই দুস্তর দৈবী মায়ার সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করিবে?

কেবল সাধন দ্বারা সিদ্ধদেহ অথবা ভাগবতী তনু লাভটা কথার কথা জানিবেন, ফলত ইহা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

মায়া যেমন ভগবৎশক্তি, তেমনি ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে ভগবৎশক্তি লাভ করা প্রয়োজন। ভগবৎশক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই মায়াশক্তির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই।

মনুষ্যমাত্রেরই অন্তরে ভগবৎশক্তি নিহিত আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই শক্তি কিছুতেই উদ্বুদ্ধ হয় না। মানুষের এমন সাধ্য নাই যে সে

নিজের চেষ্টায় এই শক্তিকে জাগরুক করিতে পারে। হাজার সাধন করুন, হাজার ভজন করুন কিছুতেই ইহা জাগ্রত হইবে না। বুদ্ধদেবের ন্যায় সাধন করিতে সমর্থ হইলেও এই শক্তি উদ্বুদ্ধ হইবে না।

প্রদীপে তেল শলিতা থাকা সত্বেও উহা যেমন আপনা আপনি প্রজ্জ্বলিত হয় না ;-উহাকে প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য কোন জলন্ত অগ্নির সংস্পর্শে লইয়া যাইতে হয়, তেমনি অন্তর্নিহিত ভগবৎশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য, যে মহাপুরুষের মধ্যে এই শক্তি জাগ্রত হইয়া প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, সেই মহাপুরুষের প্রজ্জ্বলিত ভগবৎশক্তির সংস্পর্শে লইয়া যাইতে হয়।

মহাপুরুষের জাগ্রত ভগবৎশক্তির সংস্পর্শমাত্রই মনুষ্যের অন্তর্নিহিত ভগবৎশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিবে। ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। মনুষ্যের অন্তর্নিহত ভগবৎশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেওয়ারই নাম শক্তি সঞ্চার।

শক্তিসঞ্চার কালে কোন কোন ব্যক্তি শক্তির ক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করে, কেহ সাধন করিতে করিতে কিছুকাল পরে অনুভব করে।

সাধনভজন দ্বারা এই শক্তিকে জাগাইয়া রাখিতে হয় ; নতুবা ইহার আবার আলস্য হয়। এইটি সাধকের পক্ষে বড়ই বিপদের অবস্থা। ভগবৎশক্তি অলস হইলে ধর্ম্মলাভ সুকঠিন হইয়া পড়ে।

মনুষ্যের ভগবৎশক্তি একবার প্রজ্জ্বলিত হইলে যতই সাধন করিতে থাকিবেন ততই উহা প্রবল হইতে থাকিবে। ক্রমে বিষম দাবানলে পরিণত হইয়া কাম ক্রোধাদি রিপুগণ, সর্ব্ব প্রকার অভিলাষ, সর্ব্বপ্রকার দুষ্প্রবৃত্তি, সত্ব রজ তম এই গুণত্রয়, ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে। তখন মায়া অন্তরিত হইবেন তখন সিদ্ধদেহ লাভ হইবে। নতুবা সিদ্ধদেহ লাভ করা কি মুখের কথা ?

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে এই ভগবৎ শক্তির অভাবই বৈষ্ণবগণের উচ্চ ধর্ম্মলাভের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় হইয়াছে।

যাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের উন্নতি দেখিতে চান, যাহাতে এই বিলুপ্ত ভগবৎ-শক্তি বৈষ্ণবসমাজ লাভ করিতে সমর্থ হয় তৎপক্ষে তাঁহাদের যত্নবান হওয়া উচিত। নতুবা সভাসমিতি করিয়াই বা কি হইবে? আর বড় বড় বক্তৃতা করিয়াই বা কি হইবে? রোগের উপযুক্ত ঔষধ ব্যতীত কি রোগের উপশম হয়?

আপনারা মহাপ্রভুর এই শক্তি লাভ করুন, মহাপ্রভুর পন্থায় সাধন ভজন করুন, নিশ্চয়ই সিদ্ধদেহ লাভ হইবে।

পাঠকমহাশয়গণ সিদ্ধদেহের কথা শুনিলেন, এখন সাধনের কথা শুনুন।

স্মরণ মনন করা বৈষ্ণবগণের প্রধান সাধন। এজন্য বৈষ্ণবগণের মধ্যে কেহ কেহ সাধন করেন, গোপালকে ক্ষীর সর নবনী প্রভৃতি খাওয়াইতেছেন, তাঁহার ধড়া চূড়া বাঁধিয়া দিতেছেন, কোলে লইয়া আদর করিতেছেন, শত শত চুমো খাইতেছেন। মুরলী হাতে দিয়া ভগ্নহৃদয়ে গোপালকে গোষ্ঠে পাঠাইতেছেন ইত্যাদি।

আবার কেহ কেহ সাধন করেন যে, তিনি শ্রীমতীর কোন সখীর দাসী হইয়াছেন। সখীর আজ্ঞানুসারে রাধাকৃষ্ণের সেবার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের জন্য জল আনিতেছেন, মালা গাঁথিতেছেন, শয্যা প্রস্তুত করিতেছেন, পান সাজিতেছেন ও আর আর আবশ্যকীয় কাজকর্ম্ম করিতেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাঁহাদের ধারণা যে মরণান্তে তাঁহারা সিদ্ধদেহ লাভ করিবেন ও এই সকল অবস্থা সম্ভোগ করিবেন।

রাধাকৃষ্ণ, গোপাল, বা সখীগণ সকলই অপ্রাকৃত বস্তু, মানুষের চিন্তা

বিচারের অতীত। মানুষ যাহা ভাবনা করিবেন তাহাই মিথ্যা। মিথ্যা ভাবনা দ্বারা কদাচ সত্য বস্তু লাভ হয় না; আর মনে মনে ভাবনা করিয়া এইসকল উচ্চ অধিকার লাভ করা যায় না।

বৃথা কল্পনায় কেবল সত্যে বঞ্চিত হইতে হয়। মানুষের পক্ষে কি কল্যাণকর, কি অকল্যাণকর মায়ান্ধ মানুষ তাহা বুঝে না সুতরাং তাহার একটা কাল্পনিক আকাঙ্ক্ষা করিতে যাওয়াই অনুচিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পন্থায় এ সব জল্পনা কল্পনা নাই। সাধককে ভেবে চিন্তে কিছু করিতে হইবে না। ভ্রান্ত মানুষ কি ভাবিতে কি ভাবিবে? মানুষ জানে না তাহার পক্ষে কি ভাল, কি মন্দ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পন্থায় একমাত্র গুরুদত্ত নাম সাধন ব্যতীত আর কিছু নাই। যাঁহারা সর্ব্বদা নাম করিতে পারেন না, তাঁহাদের পক্ষে বৃথা কাজে সময় নষ্ট না করিয়া পূজা, অর্চ্চনা, স্তবপাঠ, সাধুসঙ্গ সদালোচনা, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদিতে কালযাপন করাই ব্যবস্থা। নাম করিতে পারিলে এ সকল কিছুরই প্রয়োজন নাই। এগুলিতে চিত্ত নির্ম্মল হয়, তাহাতে নাম সাধনের অনেকটা সাহায্য হইয়া থাকে।

নামসাধনের সাহায্য ব্যতীত, ইহা দ্বারা মানুষের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইবে না, দুষ্প্রবৃত্তি নির্ম্মূল হইবে না, আসক্তি নষ্ট হইবে না। এবং স্থায়ী কোন বিশেষ ফল লাভ হইবে না।

একমাত্র নামেই ভগবৎশক্তি আছে এই নাম ব্যতীত আর কিছুতেই শক্তি নাই, আর কিছুতেই অবস্থা লাভ হইবে না। সুতরাং নামের শরণাপন্ন হইয়া নামসাধনে প্রবৃত্ত হউন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শক্তি বৈষ্ণবসমাজ হইতে অন্তরিত হইয়াছে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত সাধনপ্রণালীও প্রচলিত নাই। তাঁহার সাধনপ্রণালীর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী যে সাধনপ্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন বৈষ্ণবেরা সেই প্রণালীতেই সাধন ভজন করিয়া আসিতেছেন। ইহার ফলেই তাঁহার শক্তি এত শীঘ্র বৈষ্ণবসমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে।

আপনারা নিশ্চয় জানিবেন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের বর্ণিত সাধনপ্রণালী শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রণালী নহে, উহা জল্পনা কল্পনায় পরিপূর্ণ। এই জল্পনা কল্পনা হইতেই বৈষ্ণবসমাজের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

আমি বৈষ্ণবসমাজের নিন্দা করিতেছি না, ইহাতে যে সব মলিনতা উপস্থিত হইয়াছে, সংশোধনের জন্য তাহাই প্রদর্শন করিতেছি মাত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আচার্য্যের অভাব

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে উপযুক্ত আচার্য্যের অভাব হইয়াছে। এই সমাজে অনেক পণ্ডিত লোক আছেন, সাধনশীল লোক আছেন, ধর্ম্মপ্রাণ লোক আছেন, কিন্তু একটীও শক্তিশালী লোক আছেন কিনা সন্দেহ। যদি পাহাড় পর্ব্বত বন জঙ্গলের মধ্যে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, কোন শক্তিশালী লোক থাকেন তাঁহার সহিত গৌড়ীয় সমাজের কোন সংস্রব নাই।

শক্তিশালী আচার্য্যের অভাবপ্রযুক্ত, শিষ্যগণ শক্তিলাভ করিতে পারে না, তাহাদের ভিতরের ভগবৎশক্তি জাগ্রত হয় না। শক্তিসঞ্চার কথাটা চলিত আছে বটে, শক্তিসঞ্চার দূরে থাকুক, এই ব্যাপারটা কি বৈষ্ণব আচার্য্যগণ তাহা আদৌ জানেন না।

ভগবৎশক্তি জাগ্রত না হইলে মানুষ ভজনপথে অগ্রসর হইতে পারে না। উচ্চধর্ম্ম লাভ হয় না। সাধন ভজনে হয়ত কিছুদিন সরস অবস্থা

লাভ হইয়া থাকে কিন্তু কিছুদিন পরেই সে অবস্থা থাকে না, প্রাণ শুকাইয়া যায়। ভগবৎশক্তি লাভ হইলে মানুষ দিন দিন ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে থাকে, নূতন নূতন অবস্থা লাভ করিতে থাকে, জীবনে প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। মানুষ যতই ভজন করিবে ততই তাহার মধ্যে ভগবৎশক্তি পরিবর্দ্ধিত হইবে ও অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

শক্তিশালী গুরুর অভাবে শিষ্যগণ শক্তিশালী নাম পায় না। নামে ভগবৎশক্তি অর্থাৎ নামী বর্ত্তমান না থাকায় নাম কেবল মাত্র শব্দে পরিণত হয়। আবার নামাপরাধ বশতঃ নামের ফল পাইবার পক্ষে বাধা উপস্থিত হয়।

শক্তিশালী নামে নামাপরাধ নাই হেলায় শ্রদ্ধায় নাম করিলেই নামের ফল লাভ হইয়া থাকে, কারণ বস্তুশক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না।

শক্তিশালী আচার্য্যের অভাবে বৈষ্ণবগণ এখন বলিয়া থাকেন গুরু যেমন তেমন একজন হইলেই হইল, শিষ্যের সাধনই প্রয়োজন। সাধন করিতে পারিলেই অবস্থা লাভ হইবে এই জন্য তাঁহারা বিরূপাক্ষের উদাহরণ দিয়া থাকেন।

এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আমি বিরূপাক্ষের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহাতে পাঠকগণ বেশ বুঝিতে পারিবেন, অযোগ্য গুরুগণ নিজেদের ব্যবসায় বজায় রাখিবার ও শিষ্যের মনস্তুষ্টি করিবার জন্য এই কাল্পনিক গল্পটির সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই গল্পটিতেই শিষ্যগণ প্রবোধ পাইয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন সাধন করিতে পারিলেই ধর্ম্ম লাভ হইবে। সাধনই প্রয়োজন, আচার্য্য যেমন তেমন হইলেই হইল।

অনেক পদস্থ সুশিক্ষিত চিন্তাশীল লোক গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের গোস্বামী বংশীয় সুপণ্ডিত সাধনশীল, সুবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট বহুকাল

দীক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রাণপণে সাধনভজন করিয়া আসিতেছেন, তাহাদের গুরুভক্তি অতুলনীয়।

তাঁহারা বৈষ্ণবসমাজের সাধনপ্রণালীমত নিষ্কপটে, সরলভাবে, সুদীর্ঘকাল সাধনভজন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এত সাধনেও কোন ফল পাইতেছেন না, জীবন পরিবর্ত্তিত হইতেছে না।

সাধনে ফল না পাওয়ায় ও জীবন পরিবর্ত্তিত না হওয়ায় আমাকে পত্র লিখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন। সে সব পত্র আমার নিকট আছে।

একটা লোক নিষ্ঠাপূর্ব্বক ভজন করিয়া আসিতেছেন, গুরুতে তাঁহার অচলা ভক্তি, আমি তাঁহাকে এ কথার উত্তর কি দিব? নিষ্ঠা ভাঙ্গিয়া দেওয়া মানুষের কর্ত্তব্য নয়। ভগবান মালিক, ধর্ম্মজগৎ তাঁহার হাতে। যাহা করিতে হয় তিনি করিবেন। আমি কি করিব? আমার কথা শুনেই বা কে? বলিলেই কি কথা শুনিতে পারিবে?

আমি উঁহাদের পত্রের এইমাত্র উত্তর দিয়াছি। "আমার নূতন পুস্তক 'সদ্‌গুরু ও সাধনতত্ত্ব' প্রকাশ হইতেছে, তাহা পাঠ করিলেই কোথায় ত্রুটি বুঝিতে পারিবেন।"

উপযুক্ত আচার্য্যের পদাশ্রয় ব্যতিরেকে সাধনভজনে যে বিশেষ ফল হয় না ইহা সুনিশ্চিত। এই কথাটি বুঝিতে না পারিয়া বৈষ্ণবগণ অনুষ্ঠানকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি অনুষ্ঠান করিতে পারে তাহারই ধর্ম্মলাভ হইয়াছে মনে করে, আর অনুষ্ঠানের ত্রুটি দেখিলেই বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। আচার্য্যের গুরুত্ব বুঝিতে পারেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গুরুত্যাগ

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের আর একটি মহৎ অপরাধ যে তাঁহারা দীক্ষা-গুরুর সহিত সম্বন্ধ রাখেন না। বৈষ্ণবগণের দীক্ষা গ্রহণ পর্য্যন্তই তাহার সহিত সম্বন্ধ। শিক্ষাগুরু গ্রহণ করা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে একটি বিশেষ প্রচলিত নিয়ম। তাঁহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। দীক্ষাগুরু জ্ঞানবান ও সুপণ্ডিত হইলেও এক শিক্ষাগুরু করা চাই।

কুলগুরুর অযোগ্যতা বশতঃ শিক্ষাগুরু করিবার প্রথা বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত হইয়াছে। লোকের একটা ধারণা আছে কুলগুরু পরিত্যাগ করিতে নাই। এইজন্য তাঁহার বংশে উপযুক্ত লোক না থাকিলেও যেমন তেমন লোকের নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবেরা পছন্দমত লোককে উক্ত পদে বরণ করিয়া থাকেন।

শিক্ষাগুরুর সহিত বৈষ্ণবগণের যতকিছু সম্বন্ধ। তিনিই শিষ্য-গণকে ভজন প্রণালী শিক্ষা দেন, তাঁহাদিগকে উপদেশ দেন। বৈষ্ণব-গণ তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকেন।

শিক্ষাগুরু শিক্ষক, ইংরাজিতে যাঁহাকে teacher বলে, তিনি তাহাই। কখনও ভবকর্ণধার হইতে পারেন না। দীক্ষাগুরুই ভগবানের একরূপ। তিনিই ভবকর্ণধার। তাঁহাকে মনুষ্য বোধ করিতে নাই। কুলগুরু অযোগ্য হইলেও তাঁহার নিকট যে দীক্ষাগ্রহণ করিতেই হইবে একথা কোন শাস্ত্রে নাই। তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ একটা যেন কুটুম্বিতা রক্ষা। তাঁহার কুলে উপযুক্ত লোক না থাকিলে, বিবেচনা-পূর্ব্বক উপযুক্ত তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির নিকট দীক্ষাগ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

শিক্ষাগুরু শিক্ষক মাত্র। ঘরে পড়িয়া যেমন লেখাপড়া শেখা যায়;

শিক্ষাগুরু না করিয়াও তেমনি সাধনপ্রণালী পুস্তক পড়িয়া ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সহিত আলোচনা করিয়া জানা যায়। সাধনপদ্ধতি জানিবার জন্য পৃথক ব্যক্তি নিযুক্ত করিবার আবশ্যক হয় না। শিক্ষাগুরু করিবার প্রথা থাকাতেই দীক্ষাগুরুর প্রতি বৈষ্ণবগণের অনাস্থা জন্মিয়াছে। তাঁহার প্রতি অনাস্থা মহাপরাধ। এত অপরাধে কি আর ধর্ম্ম লাভ হয়?

বৈষ্ণবগণের মধ্যে এখন অনেকেই মনে করেন দীক্ষাগুরু যেমন তেমন একজন হইলেই হইল। শিষ্যের সাধনই প্রয়োজন। শিষ্যের সাধন ভজন থাকিলেই সে ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হইবে।

বৈষ্ণবগণ এখন বলিয়া থাকেন, দীক্ষা দেওয়া দীক্ষাগুরুর কার্য্য, সাধন প্রণালী শিক্ষা দেওয়া শিক্ষাগুরুর কার্য্য। দীক্ষাগুরু নিজের মহত্ত্ব নিজ মুখে ব্যক্ত করেন না, শিক্ষাগুরুই তাহা শিষ্যকে শিক্ষা দেন। সুতরাং শিক্ষাগুরুর একান্ত প্রয়োজন।

বৈষ্ণব সমাজে যেমন উপযুক্ত গুরুর অভাব হইয়াছে, তেমনি দীক্ষার গাম্ভীর্য্য চলিয়া গিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইষ্টমন্ত্র ত্যাগ

বৈষ্ণবগণ যে কেবল দীক্ষাগুরু পরিত্যাগ করিয়া নিরস্ত হইয়াছেন তাহা নহে, তাঁহারা দীক্ষামন্ত্র পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছেন। দীক্ষা-মন্ত্রের প্রতিও তাঁহাদের আস্থা নাই। তাঁহারা দীক্ষামন্ত্র সাধন করেন না। যাঁহারা সাধনশীল তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ একবার, কেহ বা তিন বার, কেহ বা সাতবার, যিনি খুব বেশী করিলেন তিনি ঊর্দ্ধসংখ্যা একশত আটবার দীক্ষামন্ত্র জপ করিয়া থাকেন। যদি দীক্ষামন্ত্র সাধন না করিবেন

তবে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণের প্রয়োজন কি? কন্যার আইবুড় নাম ঘুচাইবার জন্য যেমন বিবাহ, এটাও কি তাই?

শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন নামের উল্লেখ আছে। গুরু শিষ্যের অবস্থা ও প্রকৃতি বুঝিয়া যাহার পক্ষে যে নাম উপযুক্ত তাহাকে সেই নাম দিয়া থাকেন। এক নাম অন্যের উপযোগী নহে। নামের বিচার করিয়া নাম দিবার ও সেই নামই জপ করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। ভারতবর্ষে এমন কোন সম্প্রদায় নাই, যাঁহারা ইষ্টমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নাম সাধন করেন। একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই ইষ্টমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ইষ্টমন্ত্রের পরিবর্ত্তে "হরেকৃষ্ণ" নাম অর্থাৎ ষোল আনা বত্রিশ অক্ষর জপ করিয়া থাকেন। অনেকে এই নাম দিবারজনী জপ করিয়া থাকেন। কেহ এক লক্ষ, কেহ দুই লক্ষ, কেহ কেহ তিন লক্ষ পর্য্যন্ত প্রত্যহ এই নাম জপ করিয়া থাকেন। এতাধিক নাম সাধন করিয়াও যে বিশেষ ফললাভ হয় না, জীবনের পরিবর্ত্তন ঘটে না, ইহার কারণ আর কিছুই নহে; নামে শক্তির অভাব অর্থাৎ নামীর অবর্ত্তমানতা।

শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ নামের অপার মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিত স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি,
দুর্দ্দৈবমিদৃশ মিহাজনি নানুরাগঃ॥"

এই সব পাঠ করিয়া বৈষ্ণবগণ ইষ্টমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া "হরেকৃষ্ণ" নাম জপ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন ভগবানের প্রত্যেক

নামেই ভগবান স্বতঃই সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়া রাখিয়াছেন, নাম করিলেই নামের ফল পাওয়া যাইবে।

প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কোন নাম নাই। তিনি নাম-রূপের অতীত। ভক্তগণ স্বীয় স্বীয় রুচি অনুসারে বিবিধ নামে তাঁহাকে অভিহিত করেন এবং বিবিধরূপে তাঁহাকে ভজনা করেন। নামে আদৌ কোন শক্তি থাকে না। গুরু কৃপা করিয়া নামে শক্তি অর্পণ করিয়া থাকেন। এইজন্যই গুরুকরণ ব্যতীত উচ্চ ধর্ম্মলাভ হয় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরীর নিকট শক্তিশালী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই জন্যই তিনি দৈন্য করিয়া বলিয়াছিলেন

"নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিত স্মরণে ন কালঃ ইত্যাদি

এই শ্লোক পাঠ করিয়া এমন মনে করিতে হইবে না যে ভগবান তাঁহার সমস্ত নামেই সর্ব্বশক্তি স্বতঃই অর্পণ করিয়া রাখিয়াছেন। এই শ্লোকই বৈষ্ণবগণের ভ্রম জন্মাইয়াছে। এবং তাঁহারা ইষ্টমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া 'হরেকৃষ্ণ' নাম সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

যদি নামে স্বতঃই সর্ব্বশক্তি দেওয়া থাকিত, তাহা হইলে গুরুকরণের আদৌ প্রয়োজন হইত না। ঘরে বসিয়া কেবল নাম সাধন করিলেই লোকে ধর্ম্মলাভ করিতে পারিত।

শ্রীমহাপ্রভুর উপরি উক্ত শ্লোকই বৈষ্ণবগণের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তাঁহারা শ্লোকার্থ বুঝিতে না পারিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন এবং দীক্ষাগুরু ও দীক্ষামন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছেন। গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ ও ইষ্টমন্ত্র জপের ব্যবস্থা আছে বলিয়াই ইঁহারা নাম মাত্র গুরু সন্নিধানে গমন করেন এবং নাম মাত্র ইষ্টমন্ত্র জপ করেন। এটা যেন উপরোধে ঢেঁকি গেলা। প্রকৃতপক্ষে ইষ্টদেব বা ইষ্টমন্ত্রের উপর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আদৌ

শ্রদ্ধা নাই। এমত অবস্থায় উচ্চ ধর্ম্ম লাভ করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব।

আমি এই গ্রন্থের "গোস্বামী মহাশয়ের সাধন-প্রণালী" প্রবন্ধে এ সকল কথার সমালোচনা করিয়াছে, একারণ এ বিষয়ে আর অধিক লিখিলাম না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ উপাসনা।

হিন্দুর বেদ উপনিষৎ বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে ভক্তি ধর্ম্ম পরিস্ফুট নহে। ভক্তি ঐ সকল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। ঐ সকল শাস্ত্র ব্রহ্মনির্ণয় লইয়াই ব্যস্ত। পরবর্ত্তী সময়ে সনৎকুমার সংহিতা শ্রীমদ্ভগবত গীতা, বিবিধ পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে আমরা ভক্তির বিষয় জানিতে পারি। এই সকল শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া পূজনীয় গোস্বামীপাদেরা বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনাই যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ উপাসনা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং কৃষ্ণভক্তির অপার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই সকল শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা করিয়া থাকেন এবং ভক্তি অঙ্গ সকল প্রাণপণে যাজন করিয়া থাকেন। অন্য দেবদেবীর পূজায় বীতশ্রদ্ধ।

দেশের নিতান্ত দুরবস্থা দেখিয়া কলিহত জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবার শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা হিন্দুর জীবনে এক অত্যদ্ভুত এবং অভিনব লীলা। এই লীলায় যে প্রেম প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা কোন শাস্ত্রে নাই,

কেহ কখনও দেখে নাই, কেহ কখনও শুনে নাই। গোস্বামীপাদেরা শ্রীমন্মহাপ্রভুতে এই অভিনব অত্যদ্ভুত প্রেম দেখিয়াছিলেন মাত্র কিন্তু এই প্রেমতত্ত্ব অবধারণে অসমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-অবতারে রাধাশ্যাম পৃথক পৃথক ছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারে উভয়ে একাধারে অবতীর্ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তপ্রবর রায় রামানন্দ মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

এক সংশয় মোর আছে যে হৃদয়ে।
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে॥
পহিলে দেখিনু তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুই শ্যাম গোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা'।
তার গৌর কান্ত্যে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা॥
তাহাতে প্রকট দেখি বংশীবদন।
নানা ভাবে চঞ্চল আছে কমল নয়ন॥
এই মত দেখি তোমা হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার॥
প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়॥
মহা ভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥
"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্রে হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥
রাধাকৃষ্ণে তোমার মহা প্রেম হয়।
যাহা তাহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয়॥

রায় কহে প্রভু তুমি ছাড় ভারি ভুরি।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি॥
রাধিকার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥
নিজ গূঢ়কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
আনুসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর তোমার কোন ব্যবহার॥
তবে হাঁসি তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ॥

চৈ চ ম, ৮ পরিচ্ছেদ

শ্রীপাদস্বরূপ দামোদর আপন কড়চায় লিখিয়াছেন

রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনীশক্তিরস্মা
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকট মধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপং॥
"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঁই।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হইলা একঠাঁই॥

চৈ চ আ ৪ পরিচ্ছেদ

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে রাধাকৃষ্ণ যেমন একাঙ্গ হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, তেমনি আবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণ নাম অপেক্ষা শ্রীগৌরাঙ্গ

নামের মহিমা অধিক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ নাম অপরাধের বিচার করে, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ নামে সে অপরাধের বিচার নাই—

"কৃষ্ণ নাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিতে অপরাধীর না হয় বিকার॥
এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ, কম্প, পুলকাদি, গদ্‌গদাশ্রুধার॥
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ নামের ফল পাই এত ধন॥
হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রধার॥
তবে জানি অপরাধ আছয়ে প্রচুর।
কৃষ্ণ নাম বীজ তাহা না হয় অঙ্কুর॥
চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥

চৈ চ অ ৪ পরিচ্ছেদ

আবার পরিব্রাজক চূড়ামণি শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী লিখিতেছেন—

"ভ্রাতঃ কীর্ত্তয় নাম গোকুলপতেরুদ্দাম নামাবলীং
যদ্বা ভাবয় তস্য দিব্য মধুরং রূপং জগন্মঙ্গলং।
হন্ত প্রেম মহারসোজ্জ্বল পদে নাশাপিতে সম্ভবেৎ
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভো র্যদি কৃপা দৃষ্টিঃ পতেন্ন ত্বয়ি॥"

হে ভ্রাতঃ! তুমি ব্রজরাজনন্দনের পরমপ্রভাববিশিষ্ট নামাবলী উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনই কর অথবা তাঁহার জগন্মঙ্গলস্বরূপ মনোহর মধুর মূর্ত্তি

চিন্তাই কর, কিন্তু যদি তোমাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টি পতিত না হয়, হায়! তাহা হইলে সেই মহাপ্রেম রসোজ্জ্বল বিষয়ে তোমার আশাও সম্ভব নহে।

"সংসার সিন্ধুতরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সংকীর্ত্তনামৃত রসে রমতে যদি মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি
শ্চৈতন্যচন্দ্র চরণে শরণং প্রজাতু॥"

সংসারসাগর তরণে, সঙ্কীর্ত্তন রূপ সুধারসের আস্বাদনে এবং প্রেম-সমুদ্রবিহারে যদি তোমাদিগের মন হয়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যের চরণে শরণ গ্রহণ কর—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত অষ্টম বিভাগ

এইরূপ ভক্তিগ্রন্থের বিবিধ পাঠ দেখিয়া কতকগুলি বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা অপেক্ষা শ্রীগৌরাঙ্গ-উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন। ইঁহারা সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গ উপাসক। ইঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের পূজাপদ্ধতি, গায়ত্রী ধ্যান, মন্ত্র, সমস্তই ঠিক করিয়াছেন; যাঁহারা কেবল কৃষ্ণ উপাসনার পক্ষপাতী বৈষ্ণবসমাজে তাঁহারা গৌরবাদী বলিয়া অভিহিত। গৌরবাদী কৃষ্ণ উপাসকগণ বলিয়া থাকেন, শ্রীগৌরাঙ্গ উপাসনার পৃথক মন্ত্র, ধ্যান, পূজা পদ্ধতি বা গায়ত্রী নাই। কৃষ্ণ মন্ত্রেই পূজা হওয়া বিধেয়। এই মত ভেদ বশতঃ বহুকাল হইতে উভয় দলের মধ্যে মনোমালিন্য ও দলাদলি চলিয়া আসিতেছে।

আবার কতকগুলি বৈষ্ণব কি ভাল কি মন্দ ঠিক করিতে না পারিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনা যুগপৎ করিয়া থাকেন।

মতের ধর্ম্মের দশাই এইরূপ। যেখানেই মতের ধর্ম্ম, সেইখানেই অন্ধতা, সেইখানেই সাম্প্রদায়িক বিরোধ, সেইখানেই দলাদলি। এই

ধর্ম্মসাধনের ফলও একরূপ। মানুষ আপন আপন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম যাজন করিয়া যায়, মনে করে যাজন করিলেই ধর্ম্মলাভ হইল, প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না। মতের ধর্ম্ম যাজনে যাহার মধ্যে যতটুকু ধর্ম্মভাব বর্ত্তমান তাহার অধিক লাভ হয় না; বরং বয়োবৃদ্ধি সহকারে ধর্ম্মভাব কমিয়া যায়, ধর্ম্মসাধন একটা অভ্যস্ত কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হয়। জীবনের উন্নতি লাভ হয় না। উচ্চ ধর্ম্মলাভ হয় না। তাই বলি শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনাই কর, আর শ্রীগৌরাঙ্গ-উপাসনাই কর, আর উভয় উপাসনাই কর, ফল সমান হইবে। একটুও বেশি কমি হইবে না।

মহাপ্রভুর শুদ্ধাভক্তি বা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম ধর্ম্মজগতের এক অভিনব বস্তু। ইহা জনসমাজে প্রকাশিত ছিল না। যুগযুগান্তর হইতে লোকে ইহার তত্ত্ব অবগত ছিল না। মহাপ্রভু ইহা স্বয়ং আস্বাদন করিয়াছিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় অল্প সংখ্যক ভক্তগণকে তিনি আস্বাদন করাইয়াছিলেন। পরিব্রাজক চূড়ামণি শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী আপন গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যাস্মিন ক্ষমামণ্ডলে
কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণা যদ্বেদ নো বা শুকঃ॥
যন্ন কাপি কৃপাময়েন চ নিজেপ্যুদ্‌ঘাটিতং শৌরিণা
তস্মিন্নুজ্জ্বলভক্তি বর্ত্মসি সুখং খেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ॥

যে মধুর ভক্তিপথে ব্যাস প্রভৃতি মুনীন্দ্রগণও ভ্রান্ত হইয়াছেন, যাহাতে পূর্ব্বে পৃথিবীতলে কাহারও বুদ্ধি প্রবেশ করে নাই, যাহা শুকদেবও অবগত ছিলেন না এবং যাহা কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভক্তের প্রতিও প্রকাশ করেন নাই তাহাতে এক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ সুখে ক্রীড়া করিতেছেন।

"যন্নাপ্তং কর্ম্মনিষ্ঠৈচ সমাধিগতং যত্তপোধ্যানযোগৈ
বৈরাগ্যৈ স্ত্যাগতত্ত্বস্তুতিভিরপি ন যত্তার্কিতঞ্চাপি কৈশ্চিৎ।

গোবিন্দপ্রেমভাজামপি নচ কলিতং যদ্রহস্তং স্বয়ং ত
ন্নাম্নৈব প্রাদুরাসীদবতরতি পরে যত্রতং নৌমি গৌরং ॥

যাহা কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ প্রাপ্ত হয় না, যাহা তপস্তা ধ্যান অর্থাৎ ভগবানের রূপ চিন্তন তথা অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা জানা যায় না, যাহা বৈরাগ্য অর্থ্যাৎ কোন ভগবদ্ভজন বিঘ্নিনী ইচ্ছা, ত্যাগ অর্থাৎ শুদ্ধ ভজনতত্ত্ব (ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান) স্তুতি অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়ক স্তবাদি পাঠ দ্বারাও লভ্য হয় না এবং যাহা শ্রীগোবিন্দপরায়ণ ব্যক্তিদিগেরও অলভ্য, সেই গূঢ় প্রেম যাঁহার অবতার হইলে স্বয়ং নাম মাত্রেই প্রকাশ হইয়াছিল, সেই গৌর-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে আমি নমস্কার করি।

"প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরম করুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার ॥"

প্রেম নামক পরম পুরুষার্থ, যাহা পূর্ব্বে কাহারও শ্রবণপথে গমন করে নাই, নামমহিমা যাহা পূর্ব্বে কেহই জানিতেন না, শ্রীবৃন্দাবনের পরম মাধুরী যাহাতে কেহই প্রবেশ করিতে পারেন নাই এবং পরমাশ্চর্য্য মাধুর্য্য-রসের পরাকাষ্ঠা স্বরূপা শ্রীরাধা, যাহা পূর্ব্বে কেহই অবগত ছিলেন না, কেবল এক চৈতন্যচন্দ্র প্রকটিত হইয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন।

পাঠক মহাশয়গণ, শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর এই সকল উক্তি যে রঞ্জিত ইহা কদাচ মনে করিবেন না; তিনি যে প্রেমের কথা বলিয়াছেন, বাস্তবিকই ঋষিগণ তাহা অবগত ছিলেন না, এই প্রেম বিদ্যা, বুদ্ধি বৈরাগ্য ত্যাগ, যোগ, বিচার, তপস্যা বা অন্যান্য সাধন দ্বারা লাভ হয় না। ইহা সদ্‌গুরুর বিশেষ দান।

গোস্বামী পাদগণ রাধাকৃষ্ণ প্রেম, তাঁহাদের কেলি বিলাস বর্ণনা করিয়া

বহুগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সমস্তই প্রাকৃত প্রেমের কথাতে পরিপূর্ণ। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেমের বর্ণনা কোথাও নাই।

অনেক সাধনশীল অতি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের মধ্যে এই অপ্রাকৃত শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম দেখিয়া অবাক হইয়া যান। তাঁহারা ভাবেন, "একি! এ প্রেম ত কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না! আমরা বহুকাল যাবৎ প্রাণপণে সাধন করিয়া আসিতেছি, এ প্রেমের কণাও আমাদের মধ্যে নাই! আমরা বহু বৈষ্ণব দর্শন করিয়াছি কোথাও ত এরূপ প্রেম দেখি নাই! ইহারা ছেলেমানুষ, স্ত্রীলোক, ইহারা ভজনতত্ত্ব কিছু জানেও না, বুঝেও না, সাধন ভজনও করে নাই। মেয়েগুলা ঘর গৃহস্থালী করে ও পুরুষগুলো চাকরী বাকরী করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, ইহাদের একটা বৈষ্ণব বেশ পর্য্যন্ত নাই। এ প্রেম ইহাদের মধ্যে কোথা হইতে আসিল!'

ভক্ত বৈষ্ণবগণ এইরূপ ভাবেন বটে কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারেন না। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেম চিন্তা বিচারের অতীত। চিন্তাবিচার দ্বারায় ইহা কেহই বুঝিতে পারে না। যে ব্যক্তি গুরুকৃপায় ইহা লাভ করিয়াছেন কেবল তিনিই বুঝিতে পারেন। ইহা বুঝাইয়া দিবার বিষয় নহে। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম লাভ করিয়াছেন তাঁহারা বুঝাইয়া দিতে গেলেও যে লোকে বুঝিবে এমত নহে। কারণ ইহা অপ্রাকৃত বস্তু। অপ্রাকৃত বস্তু বুঝা যায় না, বুঝাইবারও উপায় নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম যদি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত থাকিত, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম যদি বৈষ্ণবগণ বুঝিতেন, যদি বৈষ্ণব সমাজে শক্তিশালী গুরু থাকিত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা কর্ত্তব্য বা উভয় উপাসনা কর্ত্তব্য এ বিষয় লইয়া বৈষ্ণবগণের মধ্যে মতভেদ দেনাদেনি উপস্থিত হইত না।

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলিয়া গিয়াছেন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম একমাত্র নাম দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। কথাটি ধ্রুব সত্য। একমাত্র নাম সাধন দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম লাভ হইয়া থাকে। ইহা লাভ করিবার অন্য উপায় নাই। এই নামের তুলনায় পূজা, পাঠ, পরিক্রমা, লীলাগান ইত্যাদি কিছুই কিছু নয়। এসকল নামের সহায় মাত্র। মানুষ যখন নাম করিতে অসমর্থ হয়, তখন অন্য কায না করিয়া এইসব লইয়া থাকে মাত্র।

এই যে নামের কথা বলা হইল, ইহা যে-সে নাম হইলে চলিবে না। শক্তিশালী নাম হওয়া আবশ্যক। যে নামে শক্তি নাই, সে নাম জপ করিলে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমলাভ হইবে না। অনেক ভক্ত বৈষ্ণব প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ নাম জপ করিয়াও যে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমলাভ করিতে পারিতেছেন না, ইহার কারণ আর কিছুই নহে, নামে শক্তি নাই, নামী বর্ত্তমান নাই।

শক্তিশালী নাম ও নামী অভিন্ন। শক্তিশালী নাম জপ করিলেই নামীর পূজা হইল। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ, কালী, দুর্গা, শিব, গণেশ ইত্যাদি সমস্তই এক ব্রহ্মেরই সগুণরূপ। এক ভগবানেরই বিভিন্ন প্রকাশ মূর্ত্তি। সুতরাং একমাত্র শক্তিশালী নাম জপ করিলে সকলেরই পূজা করা হইল, সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। সকলেরই আশীর্ব্বাদ সাধকের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। এই বিশ্ব ভগবানে স্থিতি করিতেছে, ভগবান ব্যতীত এই বিশ্বে কিছুই নাই। তাঁহার পূজা হইলে সমস্ত বিশ্বের পূজা হইল। সমস্ত বিশ্ব পরিতৃপ্ত হইল।

"তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ"।

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ মধ্যে অধিকাংশ লোকই কুচনেহি-মাস্তার দলভুক্ত ছিলেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহার শিষ্যগণকে উপাস্য দেবতার

পরিচয় পর্য্যন্ত দেন নাই। একমাত্র নাম জপ দ্বারা তাঁহারা সাধ্য বস্তু টের পাইতেছেন, সাধ্য সাধন তত্ত্ব তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হইতেছে।

ভারতে পঞ্চোপাসনা প্রচলিত আছে। শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, ও বৈষ্ণবগণের উপাস্য দেবতা ও উপাসনা দেবতা পৃথক পৃথক। শাক্ত ও বৈষ্ণবগণের উপাসনা সম্পূর্ণ বিপরীত। শাক্তগণ মদ্যমাংসে দেবীর পূজা করিয়া থাকেন, ইহা বৈষ্ণবগণের অস্পৃশ্য। আবার বৈষ্ণবগণের গঙ্গাজল তুলসী পত্র শাক্তগণের অস্পৃশ্য। শক্তির উপাসনাকে সাধারণতঃ বামাচার ও বৈষ্ণব উপাসনাকে লোকে দক্ষিণাচার বলিয়া থাকে। বামাচারীগণকে অশুচি অবস্থায় থাকিতে হয়, বৈষ্ণবগণকে শুদ্ধাচারে থাকিতে হয়। উভয়ের সাধনপ্রণালী বিপরীত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধা ভক্তি জগতে এক অত্যাশ্চর্য্য অভিনব ব্যাপার। এই যে পঞ্চোপাসনা, এবং এই পৃথিবীতে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রভৃতি আর যে যে ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তৎসমস্তই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধা ভক্তির অন্তর্গত। এই সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক আপন আপন ধর্ম্ম সাধন দ্বারা যাহা কিছু লাভ করেন, মহাপ্রভুর শুদ্ধা ভক্তিতে তৎসমুদয় অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে। কিছুই বাকী থাকে না।

যীশুখৃষ্টের নামে ও তাঁহার গুণকীর্ত্তনে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের যে প্রেম পুলকাদি প্রকাশ পায় তাহা দেখিয়া খৃষ্টানগণ অবাক হইয়া যান। শ্যামাবিষয়ক গানে তাঁহাদের যে আর্ত্তি ও প্রেম পুলক প্রকাশ পায়, তাহা দেখিয়া শাক্তগণ আশ্চর্য্যান্বিত হন। ঐরূপ মুসলমান শৈব প্রভৃতি নানা ধর্ম্মাক্রান্ত ও নানা সম্প্রদায়ের লোক তাঁহাদের উপাস্য দেবতার নামে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের অবস্থা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যান।

আমার কতকগুলি বৈষ্ণব বিদ্বেষী শাক্ত মক্কেল ছিল। আমি বৈষ্ণব, একারণ আমার প্রতি তাঁহাদের আদৌ শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহারা সময়ে সময়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ পর্য্যন্ত করিতেন। একবার কোন শাক্ত ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আমার নিকট ভিক্ষার্থী হইয়া আসিয়া কবির একটা শ্যামাবিষয়ক গান করিলেন। এই গান শুনিয়া আমার যে অবস্থা প্রকাশ পাইল তাহা দেখিয়া আমার ঐ শাক্ত মক্কেলগণ অবাক হইয়া গেলেন। তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিলেন "আমরা উকিল বাবুকে বৈষ্ণব বলিয়াই জানি কিন্তু কালী নামে তাঁহার যে প্রেম পুলক দেখিলাম, এরূপ প্রেম-পুলক কোন শাক্তের মধ্যে জীবনে দেখি নাই। ইনি কেবল যে বৈষ্ণব, তাহা নহেন ইনি শাক্তও বটেন। ইঁহার মত শাক্ত জীবনে কখনও দেখি নাই।" এই বৈষ্ণব বিদ্বেষী মক্কেলগণ তদবধি আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। আর বৈষ্ণব বলিয়া উপহাস করিতেন না।

সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম অর্থাৎ মতের ধর্ম্ম মৃত। ইহা অন্ধকারময়; জল্পনা কল্পনায় পরিপূর্ণ। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মযাজন করিয়া কেহ সত্য বস্তু লাভ করিতে পারে না। মহাপ্রভুর শুদ্ধা ভক্তি অসাম্প্রদায়িক। ইহাতে জল্পনা কল্পনার লেশমাত্র নাই। ইহা দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল এবং অতি সহজসাধ্য। ইহাতে কোন আড়ম্বর নাই, কোন অনুষ্ঠান নাই, কেবল নাম করিলেই হইল।

এই নাম হইতে সমস্ত তত্ত্ব সাধকের অন্তরে প্রস্ফুটিত হইবে, প্রতি-নিয়ত জীবনে পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকিবে। সর্ব্বপ্রকার বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে; সংসারাসক্তি নষ্ট হইবে, বৈরাগ্যের উদয় হইবে। কামক্রোধাদি রিপুগণ বিদূরিত হইবে। হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, অহঙ্কার, অভিমান, নিন্দা, প্রশংসা, প্রতিহিংসা প্রভৃতি যাবতীয় দুষ্প্রবৃত্তি নির্ম্মূল হইবে। দয়া;

পরোপকার, সেবা, লোকমর্য্যাদা পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল পরিবর্দ্ধিত হইবে। সংশয় বিনষ্ট হইবে, ভগবানে বিশ্বাস ও নির্ভর আসিবে। তাঁহার নামে, তাঁহার কথায়, তাঁহার লীলাগুণ শ্রবণে, প্রাণ দ্রবীভূত হইবে, জল্পনা কল্পনা তিরোহিত হইবে, আর যাহা যাহা হইবার তৎসমুদয় হইবে। অবশেষে ভগবানের এই যে দুরতিক্রমণীয় মায়া তাহার হস্ত হইতেও পরিত্রাণ লাভ হইবে।

মহাপ্রভুর শুদ্ধাভক্তিতে সাধককে ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু করিতে হইবে না। নামই তাহাকে অজ্ঞাতসারে এই সকল অবস্থা আনিয়া দিবেন, সাধককে নূতন ছাঁচে গড়িয়া তুলিবেন এবং তাহাকে যে অধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য তাহাই দিবেন।

মহাপ্রভুর এমন যে নির্ম্মল ধর্ম্ম, ইহাতে বৈষ্ণব কবিগণ ক্রমাগত এতই খাইদ মিশাইতে লাগিলেন যে, বৈষ্ণবসমাজে ইঁহার আর স্থান হইল না; ইনি অতি অল্পদিন মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইলেন।

বৈষ্ণবেরা মনে করেন, তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম যাজন করিয়া আসিতেছেন কিন্তু আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে আদৌ নাই। যতদিন মহাপ্রভুর নির্ম্মল ধর্ম্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে পুনরায় প্রবর্ত্তিত না হইয়াছে, ততদিন বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নতির আশা নাই।

কথাগুলি বড় লম্বা চওড়া হইল। আমি বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার বাটীতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষগণের আমল হইতে বৈষ্ণব উপাসনা চলিয়া আসিতেছে। বৈষ্ণবগণ গোস্বামী-পাদগণকে ভগবানের নিত্য পরিচর বলিয়া জানেন, তাঁহারা সমস্ত বৈষ্ণবের পূজনীয়। তাঁহাদের বন্দনা না করিয়া ভক্ত বৈষ্ণবগণ জলগ্রহণ করেন না। এমত অবস্থায়

তাঁহাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমার কোন কথা বলা উচিত নয়, ইহা আমি বেশ বুঝি।

কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা উচিত নয়। কাহারও প্রাণে আঘাত দেওয়া মানুষের কর্ত্তব্য নয়। "অমানিনা মানদেন" আমার ধর্ম্ম। মানুষ দূরের কথা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ বৃক্ষ লতাদিরও উপযুক্ত মর্য্যাদা দেওয়া, আমার ধর্ম্ম। মনে মনেও মর্য্যাদা হানি করিলে ধর্ম্মে বঞ্চিত হইতে হয়। ধর্ম্মের পথ অতি সূক্ষ্ম।

গোস্বামী-পাদগণ আমার যে সম্পূজনীয় নহেন এমত নহে। আমিও তাঁহাদিগকে ভজনা করিয়া থাকি। তাঁহাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমি কীটস্য কীট, ধর্ম্ম ভগবানের হাতে। এই প্রাকৃত জগৎ তিনি যেমন পরিচালিত করিতেছেন, তেমনি ধর্ম্ম জগৎও তাঁহার হাতে। ধর্ম্ম জগতের নিয়ন্তাও তিনি ; যাহা করিবার তিনি করিবেন, আমার এত মাথা ব্যাথা কেন ?

আমি লেখক নহি, ভাষার উপর আমার আধিপত্য নাই। আমি পণ্ডিত নহি, আমি শাস্ত্রজ্ঞ নহি।

ভগবান কাহার দ্বারায় কি কাজ করাইবেন তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আমার নিত্য পাঠ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাগুণ উহাতে বর্ণিত হওয়ায় উহা আমার বড়ই আদর ও ভক্তির জিনিষ। কিন্তু উহার কবিত্বপূর্ণ হৃদয়স্পর্শী বর্ণনায় শ্রীমন্মহাপ্রভুতে প্রাকৃত প্রেম ভক্তির আরোপ হওয়ায় ও প্রেমের পরাকাষ্ঠা বর্ণন করিতে গিয়া প্রকারান্তরে প্রেমভক্তির অপকারিতা প্রচারিত হওয়ায় আমার প্রাণে একটা দারুণ ব্যথা লাগে।

শিক্ষিত সমাজের সহিত আলোচনা করিয়া বুঝিলাম, তাঁহারা প্রেম ভক্তির উপর বীতশ্রদ্ধ। তাঁহারা বলেন, মহাপ্রভুর প্রেমভক্তিই দেশের

একটা মহা অনর্থের মূল। প্রেমভক্তি ভাবুকতা মাত্র। ইহাতে মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া যায়। প্রেমভক্তির আধিক্যে মানুষের স্বাস্থ্য হানি হয়, ভ্রান্তি জন্মে। মানুষকে ইহা অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ করিয়া ফেলে।

প্রেমভক্তির আধিক্যে দুশ্চিন্তা ও নানাপ্রকার দুঃখ ব্যতীত আদৌ সুখ নাই। ইহার আধিক্য বশতঃই মহাপ্রভুকে বহু দুঃখ ভোগ করিতে ও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করিয়া শিক্ষিত সমাজের এই ধারণা হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত সমাজই সমাজের নেতা। তাঁহারা যে পথে যাইবেন, অন্যান্য লোকও সেই পথে চলিবে।

শিক্ষিত সমাজের এই ভুল ধারণাটা দূর করা একান্ত আবশ্যক হওয়ায় এই গ্রন্থ প্রণয়ণের প্রেরণা আমার মধ্যে বলবতী হইয়া উঠে।

আবার দেখিলাম আমার সতীর্থগণ ক্রমশই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহাদের জানা উচিত গোস্বামী মহাশয় তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়া কোন ধর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন।

এই সকল কারণে দুর্ণিবার প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়াও আমি অনেক দিন চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম।

গ্রন্থ প্রণয়ণ না করিলে পাছে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয়, পাছে ভগবানের নিকট আমাকে অপরাধী হইতে হয়, কেবল এই আশঙ্কায় আমি আপনাকে সম্পূর্ণ অযোগ্য জানিয়াও অতি গভীর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলাম।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মের সহিত বৈষ্ণবধর্ম্ম জড়িত। মহাপ্রভুর নামে ধর্ম্মের কথা বলিতে গেলেই বৈষ্ণবধর্ম্মের আলোচনা আসিয়া পড়ে।

সুতরাং আমাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বাধ্য হইয়া বলিতে হইয়াছে।

যে দুই চারিটি সিদ্ধান্ত খণ্ডন না করিলে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম বলা যায় না, কেবল সেই সিদ্ধান্তগুলি খণ্ডন করিতে হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করি নাই।

ভক্ত বৈষ্ণবগণের নিকট আমার করজোড়ে প্রার্থনা, তাঁহারা যেন আমাকে ক্ষমা করেন, আমার অপরাধ গ্রহণ না করেন।

তাঁহারা অদোষদর্শী। আমি তাঁহাদের মধ্যেরই একজন। আমি পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণবের দাসানুদাস। আমার বাসায়, আমার সমক্ষে, প্রতিদিন বৈষ্ণববন্দনা পাঠ হইয়া থাকে। আমি সপরিবারে তাঁহাদের কৃপার ভিখারী।

আমার পুস্তক পাঠ করিয়া আমাকে কেহ যেন বৈষ্ণবদ্বেষী মনে না করেন। গুরু আমাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম দিয়াছেন বৈষ্ণব উপাসনাই আমার উপাসনা।

পাঠক মহাশয়গণ আমার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। আমি এইখানেই আপনাদের নিকট বিদায় লইতেছি। কর্ত্তব্যের অনুরোধে অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম। যে সকল কথা বলিবার নহে, তাহাও বলিলাম। অপ্রিয় হইলেও লিখিতে হইল।

পাশ্চাত্য লেখক অলিভার গ্রেণ্ড স্মিথ বলিয়া গিয়াছেন, মনের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য ভাষার সৃষ্টি হয় নাই, ফলতঃ মনের ভাব গোপন করিবার জন্যই ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে জানিতে হইবে।

এখন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শাসনপ্রণালী আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য লেখকের কথানুসারে আমাদের চলাই কর্ত্তব্য। আমরা হিন্দুজাতি, পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হইলেও

আমরা এখনও সম্পূর্ণভাবে উহাতে অভ্যস্ত হই নাই। মনের কথা চাপিয়া রাখিতে পারি না। প্রকাশ করিয়া ফেলি।

প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে কথা কহিলে লোকে চটিয়া যায়। আপনার হৃদয়বন্ধুও পর হয়। এইজন্য প্রভু যীশুকে শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল; মহাত্মা সক্রেটিস্‌কে তীব্র বিষপানে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল, আমার প্রভুকেও বারম্বার বিষ দেওয়া হইয়াছিল। এ সব জানিয়া শুনিয়াও আমাকে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ কথা বাধ্য হইয়া লিখিতে হইল।

ইহাতে বন্ধুবিচ্ছেদ, আত্মকলহ, নিন্দাপ্রচার যে উপস্থিত হইবে না, এ কথা আমি বলিতে পারি না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনর্পিত ধর্ম্ম চাপা পড়িয়া রহিয়াছে, তাঁহার প্রেম-ভক্তির অপকারিতা দেশ মধ্যে প্রচার হইতেছে ও শিক্ষিত সমাজের ভুল ধারণাটা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া দারুণ কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে লেখনি ধারণ করিতে হইল। এখন লোকে যাহাই বলুক ভবিষ্যতে সত্য যে জয়যুক্ত হইবে ইহা স্থির নিশ্চিয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্বপ্নবৃত্তান্ত

পাঠকমহাশয়গণ, আপনারা গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের প্রকৃতি টের পাইয়াছেন, তাঁহারা কুচনেহি-মস্তার দল ছিলেন। একারণ গোস্বামী-মহাশয় তাঁহাদিগকে কেবলমাত্র একটি নাম দিয়া চুপ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে আপনা হইতে কোন কথা বলিতেন না।

তিনি বেশ জানিতেন, মুখের কথায় কিছু হইবে না, বরং বিপরীত

ফল হইবে। শিষ্যগণের যেমন অধিকার তাহার বহির্ভূত কথা হইলে তাহারা একেবারে অগ্রাহ্য করিবে, গুরুভক্তিটুকু পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইবে। গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন বশতঃ কেবল তাহাদিগকে অপরাধী করা হইবে। এ-কারণ তিনি শিষ্যগণকে তাহাদের মনোমত কথা ভিন্ন আর কোন কথা বলিতেন না। অনধিকারী বা অশ্রদ্ধাবান ব্যক্তির নিকট কোন কথা বলিতে নাই।

গোস্বামী মহাশয় নিজের আচরণ দ্বারা শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতেন, আর সময় সময় স্বপ্ন দ্বারা শিক্ষা দিতেন। ক্রমে শিষ্যগণ স্বপ্নের কথাও বিশ্বাস করিতে পারিতেন না, একারণ স্বপ্ন দেওয়াটাও কমাইয়া দিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয়কে ধর্ম্মস্থাপন করিবার জন্য বহু প্রয়াস পাইতে হইয়াছে। কুছনেহি-মাস্তার দলকে কেবলমাত্র একটি নাম দিয়া, একেবারে নির্ব্বাক হইয়া থাকিয়া তাহাদের ধর্ম্মজীবন প্রস্তুত করিয়া দেওয়া কি দুরূহ ব্যাপার আপনারা অনুমান করিয়া দেখুন। যাহা একেবারে অসম্ভব, গোস্বামী মহাশয় তাহাই সুসিদ্ধ করিয়াছেন। সদ্গুরুর যে কি অপার মহিমা তাহা আপনারা বুঝিয়া লউন।

গোস্বামী মহাশয় যদিও স্বপ্ন দ্বারা উপদেশ দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন, তথাপি যে ব্যক্তি স্বপ্নের কথা বিশ্বাস করে তাহাকে ইহা দ্বারা বহু উপদেশ দিয়া থাকেন।

মানুষের রিপু, ও দুষ্প্রবৃত্তি সহজ পাত্র নহে, ইহারা সাধকের সর্ব্বনাশ করিবার সময় এমনভাবে লুক্কায়িত হইয়া থাকে যে, সাধক ইহাদের খোঁজ খবর আদৌ পান্ না। তারপর সুযোগ পাইলেই ইহারা অতর্কিতভাবে এমন প্রবলবেগে তাঁহাকে আক্রমণ করে যে তখন আর আত্মরক্ষার উপায় থাকে না। গোস্বামী মহাশয় স্বপ্নযোগে পরোক্ষভাবে আমাকে এই সব অবস্থা দেখাইয়া দিয়া আমাকে বিবিধ উপদেশ দেন।

ইহাতে আমি যে কোন্ অধিকারে আছি, তাহা বুঝিতে পারি ও সতর্ক হইয়া চলি এবং প্রতিবিধান করিবার জন্য সচেষ্ট হই।

গোস্বামী মহাশয় আমাকে শত-শত স্বপ্ন দ্বারা আমার নিজের অবস্থাটা দেখাইয়া দেন, আমাকে বহু উপদেশ দেন, এবং বিলক্ষণ শাসন করেন।

স্বপ্নযোগে প্রকাশিত হইয়া তিনি যে মুখে কোন কথা বলেন বা উপদেশ দেন অথবা শাসন করেন তাহা নহে, তিনি যেমন প্রচ্ছন্ন আছেন সেইরূপ প্রচ্ছন্নই থাকেন, কেবল স্বপ্নের ঘটনাই এ সমস্ত জানাইয়া দেয়।

আমি আপন ঘরে একাকী শয়ন করিয়া থাকি। আমার নিকট কেহ থাকে না। রাত্রিকালে কোমরে কাপড় রাখিতে পারি না, এজন্য প্রায়ই কাপড় খুলিয়া দিই, সুতরাং নিদ্রিত অবস্থায় উলঙ্গ হইয়া পড়ি।

নিদ্রিত অবস্থায় উলঙ্গ থাকা নিষিদ্ধ, আমার এই কুঅভ্যাসটা দূর করিবার জন্য গোস্বামী মহাশয় আমাকে স্বপ্ন দ্বারা যথেষ্ট শাসন করিয়া থাকেন। তাঁহার শাসনের ভয়ে আমি আর নগ্নাবস্থায় নিদ্রা যাই না, কিন্তু অভ্যাস বশতঃ যে দিন নগ্নাবস্থা হইয়া পড়ে; সেই দিনই আমার শাসন হইয়া থাকে। একটি দিনও ফাঁক যায় না। আমি তাঁহার শাসনে জর্জ্জরিত হইয়া শয়নের পূর্ব্বে এরূপভাবে কাপড় পরি যাহাতে নিদ্রিত অবস্থায় আর আমাকে উলঙ্গ থাকিতে না হয়। সুতরাং এ বিষয়ে শাসনের দুর্ভোগটা আর আমাকে ভোগ করিতে হয় না।

শাসনটা কিরূপ আপনাদিগকে একটু বুঝাইয়া বলি। যে দিন নিদ্রাবস্থায় পরণে কাপড় থাকে না, সেই দিন স্বপ্ন দেখি যে শ্বশুরবাটি গিয়াছি, শালী শালজ, শ্বাশুড়ী বর্ত্তমানে কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় দেখিলাম যে আমি একেবারে উলঙ্গ, এ অবস্থায় কতদূর লজ্জা হইতে পারে আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন। কথনও বা ভদ্রসমাজে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছি, সেখানে গিয়া দেখি, আমি একেবারে বিবস্ত্র, তখন লজ্জায় মরিয়া যাই।

এইরূপ বিবিধপ্রকারে আমাকে লজ্জা দেওয়ায় আমি এখন সাবধান হইয়াছি। রাত্রিকালে আর নগ্নাবস্থায় থাকি না, দুঃস্বপ্নও দেখি না। আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, যেদিন আমার আবার ত্রুটি হইবে, সেইদিনই কোন না কোন রকমে আমার শাসন হইবে।

কুসঙ্গ, কদালাপ, কুচিন্তা, কুকার্য্য অথবা অন্য কোনপ্রকার ত্রুটি হইলেই গোস্বামী মহাশয় স্বপ্নযোগে আমাকে বিলক্ষণ শাসন করিয়া থাকেন।

তিনি যে স্বপ্ন দ্বারা কেবল আমাকে শাসন করেন তাহা নহে; স্বপ্ন ছলে পরোক্ষভাবে নানা উপদেশ দিয়া থাকেন এবং আমার ত্রুটি দেখাইয়া দেন।

মানুষ জাগ্রত অবস্থায় সাবধানে চলে, অনেক সময় জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক আপনাকে একটা আবরণ দিয়া চলে। একারণ নিজের প্রকৃত অবস্থা টের পায় না।

স্বপ্নাবস্থায় সে আবরণ থাকে না, যাহা প্রকৃতি তাহা গোপন রাখা যায় না, প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন মানুষ বুঝিতে পারে যে সে কি অবস্থায় আছে।

কামক্রোধাদি রিপুগণ, হিংসা দ্বেষাদি দুষ্প্রবৃত্তি সকল, অনেক সময় লুকাইয়া থাকে। সাধক মনে করে ইহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া গিয়াছে, সে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে।

শিষ্যের কল্যাণের জন্য গোস্বামী মহাশয় যে এইরূপে উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হন তাহা নহে, শিষ্যগণ কি অবস্থায় ছিল, সাধন দ্বারা তাহাদের ক্রমশঃ কি অবস্থা লাভ হইতেছে, জীবনে কতদূর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে ইহা দেখাইয়া দিয়া শিষ্যের মনে আশার সঞ্চার করিয়া দেন এবং ভজনে উৎসাহিত করেন।

ভজন করিয়া যদি উন্নতি লাভ না হয়, তাহা হইলে সাধকের অন্তরে নৈরাশ্য আসিয়া উপস্থিত হয়, সাধকের আর ভজনে প্রবৃত্তি থাকে না, ক্রমে সে সাধনভজন ছাড়িয়া দেয়।

এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য গোস্বামী মহাশয় শিষ্যের জীবনের পরিবর্ত্তন ও উন্নতি পুনঃ পুনঃ দেখাইয়া দিয়া তাহাদের মনের মধ্যে ধৈর্য্য আনিয়া দেন এবং ভজনপথে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে থাকেন।

পাঠকমহাশয়গণ, সমস্ত স্বপ্নই যে অমূলক, মানসিক চিন্তার ফলমাত্র একথাটা আপনারা মনে করিবেন না। অনেক সময় ইহা সত্যও হইয়া থাকে। সদ্‌গুরু সর্ব্বশক্তিমান, তিনি করিতে না পারেন এমন কিছুই নাই, তিনি যে স্বপ্নযোগে শিষ্যকে উপদেশ দিতে সমর্থ হইবেন ইহা আর বিচিত্র কি?

অমার শত শত স্বপ্ন মধ্যে দুইটি মাত্র অপনাদিগকে শুনাইব বলিয়াছি। এইবার একে একে বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

আমি একদিন একটা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইতেছি। শুনিলাম ঐ প্রান্তরে একটা কালসর্প বাস করে। সেই সর্পের ভয়ে রাখালেরা ঐ প্রান্তরে পশুচারণ করে না, কৃষকেরা ভূমিকর্ষণ করে না, লোকে ঐ প্রান্তর দিয়া যাতায়াত করে না, উহা একেবারে পতিত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

এই প্রান্তরের উপর দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম তিনজন লোক এক স্থানের মাটি খুঁড়িতেছে। তাহারা মাটি খুঁড়িয়া সাপটাকে গর্ত্ত হইতে বাহির করিয়া বধ করিবে। আমি ক্ষণকালের জন্য তাহাদিগের নিকট দাঁড়াইলাম এবং সাপ বাহিরের বিলম্ব দেখিয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলাম।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে আমি দেখিতেছি, একটা বিষধর সর্প আমাকে দংশন করিবার জন্য আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

আমার হাতে এক গাছা ছড়ি ছিল, আমি ছড়ির দ্বারা ঐ সাপের গতিরোধ করিলাম। সাপটা ঘুরিয়া আমার দিকে আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি আবার ছড়ির দ্বারা সে দিকটা আটকাইলাম। সাপ পুনরায় অন্যদিকে ঘুরিয়া আমার দিকে আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, আমি আবার ছড়ির দ্বারা আটক করিলাম। এইরূপে আমার দিকে সাপের পুনঃপুনঃ আগমনের চেষ্টা দেখিয়া আমার মনে হইল, এই সাপটা আমাকে দংশন করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছে। এ নিশ্চয়ই আমাকে দংশন করিবে, আর সর্পাঘাতে আমার মৃত্যু হইবে।

তখন আমি সাপকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম—

—আপনি সর্পরাজ। আমি নিরপরাধ, আমার প্রতি এত নির্দ্দয় হইলেন কেন?

সর্প—নিষ্ঠুর, হিংস্রক, তুই আবার নিরপরাধ কিসে? তোকে আজ উচিত শাস্তি দিব। তোকে দংশন করিয়া বিনাশ করিব।

তখন সর্পাবাস প্রান্তর মধ্যে আমি যে তিনজন লোকের নিকট ক্ষণকাল দাঁড়াইয়াছিলাম, আমার সেই কথাটা মনে পড়িল। আমি সর্পকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম—

—আমি ত আপনাকে হত্যা করি নাই এবং কাহাকেও ত হত্যা করিতে বলি নাই; তবে আমি কিপ্রকারে অপরাধী হইলাম?

সর্প—তুই হত্যা করিস নাই বা হত্যা করিতে বলিস্ নাই সত্য, কিন্তু মজা দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলি। লোকগুলা আমাকে হত্যা করিবে, আর তুই দাঁড়াইয়া মজা দেখ্‌বি। তুই আবার অপরাধী নই বলছিস্।

অতঃপর আমি ছড়ি গাছটা ফেলিয়া দিয়া সর্পের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলাম।

—আমি অতি নির্ব্বোধ। আমার হিতাহিত জ্ঞান নাই, না বুঝিয়া কুকর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছি, এমন কাজ আর আমি কখন করিব না। আপনি সর্পমহারাজ আমাকে আজ আপনি বহু শিক্ষা দিলেন। আপনার কথা জীবনে ভুলিব না এবং কখনও লঙ্ঘন করিব না। আপনি আমার প্রতি সদয় হউন এবং নিজ-গুণে আমাকে ক্ষমা করুন।

সর্পরাজ আমার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে ক্ষমা করিলেন এবং বলিলেন, এবার তোকে ক্ষমা করিলাম দেখিস্ এমন কাজ আর কখনও করিস্ না।

এইবার আশ্বস্ত হইয়া সর্পরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম—

—আপনি আমাকে বহু শিক্ষা দিলেন আমি কৃতার্থ হইলাম। আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব, এখন কিছু আহার করিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

সর্প—তুই আমাকে কি খাওয়াইবি ?

আমি—আমি আর আপনার আহার্য্য অন্য কিছু (ব্যাঙ ইত্যাদি জীব) দিতে পারিব না, কেবল দুধ কলা দিব।

সর্প—আচ্ছা তাই দে।

সর্পরাজের অনুমতি পাইয়া আমি একটা বাটি করিয়া দুধকলা আনিয়া দিলাম। সর্পরাজ আনন্দে ভোজন করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। এমন সময় আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

আমি গুরুকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া স্বপ্নের বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। আমি ইহাতে বুঝিলাম, আমার মধ্যে মৃত্যুভয় বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এখনও মৃত্যুভয়টা যায় নাই। আর প্রাণিবধ না করিলে দয়া করিলেই যে অহিংসাধর্ম্ম পালন করা হয় তাহা নহে। হিংসার বীজ যতক্ষণ অন্তরে আছে ততক্ষণই হিংসা আছে বুঝিতে হইবে। হিংসার বীজ নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত নিস্তার নাই। সাধন দ্বারা এই বীজকে একেবারে নষ্ট করিতে হইবে।

এই ঘটনার পর হইতে আমি কোন জীবের প্রতি কায়মনোবাক্যে আর হিংসার ভাব পোষণ করি না। গাছের ডালপালা ভাঙ্গি না, পাতা পর্য্যন্ত ছিঁড়ি না। যদি ভগবানের পূজার জন্য পুষ্পচয়নের আবশ্যক হয়, আমি বৃক্ষকে প্রণাম করিয়া, আমায় আবশ্যক জানাইয়া তাঁহার নিকট আবশ্যক মত পুষ্প ভিক্ষা করিয়া লই, অসংযতভাবে পুষ্প চয়ন করিতে আর প্রবৃত্তি হয় না।

এই রূপ নানা স্বপ্ন দ্বারা গোস্বামী মহাশয় আমাকে নানা শিক্ষা দিয়া থাকেন ও আমার অবস্থাটাও আমাকে জানাইয়া দেন।

সাধনপন্থায় কামিনী কাঞ্চন বড়ই বিঘ্নকর। ইহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সুকঠিন।

শরীরযন্ত্র শিথিল ও কন্দর্পের বেগ কমিয়া গেলেও মানসিক কাম কিছুতেই যাইতে চায় না। ইহা মনোরাজ্যে স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্বদা বিহার করিতে থাকে।

পূর্ব্বে এক সময়ে আমার ধারণা হইয়াছিল, যেরূপ শরীর ও মনের অবস্থা তাহাতে স্ত্রীলোকঘটিত পতনের আর আমার সম্ভাবনা নাই।

এই ধারণাটা দূর করিবার জন্য গোস্বামী মহাশয় পুনঃ পুনঃ স্বপ্ন দিয়া দেখাইলেন, আমি কেবল যে ব্যভিচারে লিপ্ত হইতে পারি তাহা নহে, অগম্য-গমনে ও আমার প্রবৃত্তি ও সম্ভাবনা আছে।

এই সকল স্বপ্ন দেখিয়া আমি মহাভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলাম।

আমার অহঙ্কার চূর্ণ হইল, আমার ভুল ধারণাটা দূরীভূত হইল। এখন আত্মরক্ষার জন্য চিন্তিত হইয়া গুরুকৃপার উপর নির্ভর করিয়া সাধনভজনে অধিকতর মনোযোগী হইলাম।

ইহার পর যখন যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, গোস্বামী মহাশয় পুনঃ পুনঃ স্বপ্ন দিয়া তাহা আমাকে জানাইয়া দিয়াছেন। শেষের স্বপ্নটা আপনাদিগকে বলিতেছি শ্রবণ করুন।

কোন ধনীর কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে। আমি যুবক, আমার স্ত্রীও যুবতী। আমি সর্ব্ব প্রথম শ্বশুরবাড়ী গিয়াছি। এইবার আমাদের উভয়ের প্রথম মিলন হইবে।

আমি শ্বশুরবাড়ী গিয়া শ্বশুর মহাশয়ের প্রাসাদের শোভা ও সাজসজ্জা দর্শন করিতেছি। বাড়ীখানা ইন্দ্রালয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমি দক্ষিণ দিকের দালানের বারান্দা হইতে দেখিলাম, উত্তরদিকের দালানের বারান্দায় একটা বিছানা পাতা রহিয়াছে ও তাহার পার্শ্বে গৃহিণী একাকী অন্যমনস্ক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। লোকজন কেহ নাই।

শয্যার শোভা ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। বিছানার চাদরখানি অতি শুভ্র সুচিক্কণ কার্পাস বস্ত্রে নির্ম্মিত। অর্দ্ধহস্ত পরিমাণে ইহার চতুর্দ্দিকে উৎকৃষ্ট সুবর্ণের অতি মনোহর কারুকার্য্য। ইহাতে বিছানাটা ঝক্ঝক্ করিতেছে। মাথার তাকিয়া ও উভয় পার্শ্বের পাশ বালিশের ওয়াড়ও ঐরূপ সুচিক্কণ অতি শুভ্র কার্পাস বস্ত্রে নির্ম্মিত এবং তাহাদের উভয় পার্শ্ব ঐরূপ অত্যুজ্জ্বল সুবর্ণের কারুকার্য্যে সুশোভিত।

মাথার তাকিয়ার দুই পার্শ্বের থোপনায় ঐরূপ সুবর্ণের কারুকার্য্য, এবং এরূপভাবে নির্ম্মিত যে দেখিলে শিল্পীর অলৌকিক শিল্পীচাতুর্য্যে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়।

এই সকল দেখিয়া আমার প্রাণটা একেবারে উদাস হইয়া গেল।

আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, হায়! ধনীর অর্থ এইরূপেই ব্যয় হইয়া থাকে। ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুন্নিবারণে, বিবস্ত্রের লজ্জানিবারণে, বিপন্নের বিপদ-উদ্ধারে, ধনীর অর্থ কখনও ব্যয় হয় না। প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া দরিদ্রের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া যে বিপুল অর্থ সঞ্চিত হয় তাহা নাচ, তামাসা, বিলাস বৈভব এবং পরপীড়নেই ব্যয় হইয়া থাকে।

আহা! ধনীর সন্তানগণ কি হতভাগ্য! কোন সাধুলোক ইহাদের ছায়া সংস্পর্শ করেন না। কোন স্বাধীনচেতা লোক ইহাদের সংসর্গে আসেন না, ইহারা কেবল ধূর্ত্ত, স্বার্থপর, তোষামোদকারী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকে।

স্বার্থপর স্তাবকগণের চাটুবাক্যে মোহিত হইয়া বৃথা আমোদ আহ্লাদ ও ইন্দ্রিয়সেবায় ইহারা দুর্ল্লভ সময় নষ্ট করিয়া ফেলে। মনুষ্যজীবন যে কি মূল্যবান জিনিষ তাহা ইহারা একবার ভাবিয়াও দেখে না।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গৃহিণীর দিকে দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম এক অপরূপ স্ত্রীমূর্ত্তি শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এমন রূপ কেহ কখনও দেখে নাই। রম্ভা তিলোত্তমা আদি দেবকন্যা ও গন্ধর্ব্ব কন্যাদির রূপের বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এরূপের কাছে সে সব রূপ কিছুই নয়।

আমি অনিমেষ লোচনে গৃহিণীর এই অসামান্য রূপরাশি দর্শন করিতে লাগিলাম এবং তজ্জন্য বিধাতার নির্ম্মাণকৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলাম। বিধাতা যেন ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সৌন্দর্য্য একাধারে এই মূর্ত্তিতে ঢালিয়া দিয়া মনের সাধে ইহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

গৃহিণী যেরূপ ধনীর কন্যা ও যেরূপ তাঁহার রূপরাশি, সেইরূপ সাজ সজ্জা নয়। গাত্রে দুই একখানি সামান্য অলঙ্কার পরিধানে একখানি কালাপেড়ে সাড়ি। মাথায় কাপড় আছে কিন্তু ঘোমটা নাই,

কপালের টিপটি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। গৃহিণী কিন্তু আমাকে দেখিতে পায় নাই।

আমি দক্ষিণদিকের যে দালানের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছি, ঐ বারান্দা দিয়া উত্তরের দালানের বারান্দায় যাওয়া যায়।

কিছুক্ষণ ধরিয়া গৃহিণী রূপরাশি দর্শন করিয়া আমি নিজের দিকে দৃষ্টি-পাত করিলাম। আমার নিজের মনের অবস্থাটা কি রূপ সেইটা পরীক্ষা করিতে লাগিলাম।

আমি দেখিলাম, আমার মনে কোন অভিলাষ নাই, মনোমধ্যে কোন প্রকার চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় নাই। মন সুস্নিগ্ধ ও শান্ত।

আমি গৃহিণীর কাছে উপস্থিত হইয়া কি ভাবে আলাপ করিব, সেই সেই বিষয়টা ভাবিতে ভাবিতে গৃহিণীর দিকে অগ্রসর হইলাম।

গৃহিণী আমাকে দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন, কিন্তু লজ্জা বশতঃ কোন কথা বলিতে না পারিয়া কেবল অবনতমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আমি ভাবিলাম গৃহিণী নবযুবতী, স্বামীর সহিত তাঁহার এই প্রথম মিলন, আমার সহিত প্রথমে কথা কহিতে নিশ্চয়ই তাঁহার লজ্জা বোধ হইবে। আমি পুরুষ প্রথমে আমারই কথা কহা কর্ত্তব্য।

আবার ভাবিলাম, এখন গৃহিণীর সহিত কি কথা কহিব? যাহা মনে হইয়াছে তাহা তাহার পক্ষে সাজ্যাতিক। আমার কথা শুনিলে তাঁহার আর দুঃখের সীমা থাকিবে না।

প্রথম মিলনেই স্ত্রীর নিকট কি সর্ব্বনেশে কথা বলা উচিত? তাঁহার জীবনের সমস্ত আশা ভরসা যে একেবারে ফুরাইয়া যাইবে। মর্ম্মবেদনায় তাঁহার বুকটা যে ভাঙ্গিয়া যাইবে। যে নিদারুণ কথা বলিবার মনস্থ করিয়াছি, তাহা এখন আর প্রকাশ করিব না।

আবার ভাবিলাম, মনে এক রকম, মুখে একরকম, কাযে আর এক রকম এত কপটতার প্রয়োজন কি? কপটতার আবরণ দিয়া যতই চলিব ততই অশান্তি ভোগ হইবে। সোজা পথে চলাই কর্ত্তব্য। যাহা মনোগত ভাব তাহা ব্যক্ত করাই কর্ত্তব্য। যাহা ঘটিবার তাহা ঘটুক।

আমার মধ্যে এইরূপ তোলাপাড়া হইতে থাকায় আমি কিছুক্ষণ আত্মসম্বরণ করিয়া গৃহিণীর শারীরিক পারিবারিক ও মানসিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলাম। গৃহিণীর লজ্জাটা ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি স্বাধীনভাবে আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

এতক্ষণ বাজে কথা কহিতেছিলাম, এখন কিন্তু আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। মনের কথা ব্যক্ত করিবার জন্য গৃহিণীকে বলিলাম।

আমি—তুমি আমার স্ত্রী, আমি তোমার স্বামী, তোমার জীবনের সমস্ত ভার আমি গ্রহণ করিয়াছি। তোমার জীবনের সহিত আমার জীবন জড়িত, স্বামীস্ত্রী একই অঙ্গ। আমি যাহা বলিব তাহা শুনিবে? আমার অনুগত হইয়া চলিতে পারিবে?

গৃহিনী—আপনি স্বামী, পরমগুরু। স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর কে আছে? স্বামীই গুরু, স্বামীই গতি। আপনি যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিব। পতির আনুগত্যই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। আমাকে কি করিতে হইবে বলুন।

আমি—তোমাকে বলিতে আমার বড় সঙ্কোচ আসিতেছে, পাছে তোমার প্রাণে আঘাত লাগে এই ভাবনাই ভাবিতেছি।

গৃহিনী—আপনার কোন চিন্তা নাই, নিঃসঙ্কোচে বলুন। শ্রীরামচন্দ্র নিরাপরাধা জানকীকেও বনবাস দিয়াছিলেন, তিনিও তাহাতে দ্বিরুক্তি করেন নাই, রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া বনবাসের ক্লেশও সহ্য করিয়াছিলেন। নিজের জীবনরক্ষার জন্য একটি

কথাও মুখে উচ্চারণ করেন নাই, কেবল স্বামীর কুশল চিন্তাই করিয়াছিলেন। আমিত সেই নারীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হিন্দুনারী কোন্ ক্লেশ সহ্য করিতে অসমর্থ? যাহা বলিবার বলুন, আমার প্রাণে আঘাত লাগিবে না।

আমি স্ত্রীর কথা শুনিয়া বিমোহিত হইলাম। মনে মনে তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিলাম। প্রাচীন কালের হিন্দু স্ত্রীর মহত্ত্ব ও পবিত্রতা এবং বর্ত্তমান কুশিক্ষার বিষময় ফল ভাবিতে লাগিলাম।

আমার মনে হইল, পূর্ব্বকালের হিন্দু স্ত্রীগণ কি ছিলেন, এখন আবার কি হইতেছেন। এখন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিলাসিতা, হিন্দুনারীগণের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। তাঁহারা পূর্ব্বকালের সংযম ধর্ম্মনিষ্ঠা ও পবিত্রতা ভুলিয়া গিয়া বিলাসিতা সাংসারিক সুখভোগ ও ইন্দ্রিয়-সেবায় গা ঢালিয়া দিতেছেন।

স্ত্রীলোকই গৃহের লক্ষ্মী, মানুষের যাবতীয় সুখ স্ত্রীলোকের উপর নির্ভর করে। স্ত্রীলোকের ধর্ম্মনিষ্ঠা ও পবিত্রতাতেই গৃহের পবিত্রতা ও শান্তি রক্ষা পায়। এখন যে তাঁহাদের বিকৃতি হইতেছে, ইহার জন্য তাঁহাদিগকে দোষ দিবার কিছু নাই, পুরুষেরাই তজ্জন্য দায়ী।

স্ত্রীলোকের শিক্ষার ভার পুরুষের হাতে। পুরুষেরা যদি তাঁহাদিগকে কুশিক্ষা দিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা কি করিবেন? নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে কুপথগামী হইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক সুখও জন্মের মত বিদায় লইবে।

আমি স্থিরভাবে এই সকল কথা চিন্তা করিতেছি। এমন সময় গৃহিণী বলিলেন—

—আপনি চুপ করিয়া রহিলেন কেন? আমাকে কি বলিতে চাহিয়াছিলেন বলুন না।

গৃহিণীর কথায় আমার চমক ভাঙ্গিয়া গেল, আমি তাঁহাকে বলিলাম—
—আমার পরম সৌভাগ্য যে আমি তোমার ন্যায় স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়াছি। তোমার ন্যায় স্ত্রীরত্ন জগতে সুদুর্লভ। যে গৃহে পতিব্রতা সতী বর্ত্তমান সে গৃহে লক্ষ্মী নারায়ণ বিরাজিত। সে গৃহ সর্ব্ব সুখের আকর। সংসার মরুভূমে একমাত্র সাধ্বী স্ত্রীই সুশীতল মন্দাকিনী।

স্ত্রীর গুণের কথা বলিতেছি এমন সময়ে তিনি আমাকে বাধা দিয়া বলিলেন, এখন ওসব কথা ছাড়ুন, যাহা বলিতে মনস্থ করিয়াছেন, বলিয়া ফেলুন। আমার জন্য কোন চিন্তা করিবেন না।

আমি—তুমি ধনীর কন্যা, পরম রূপবতী, তোমার যৌবন কাল উপস্থিত। চিরকাল সুখে স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিতা হইয়া আসিয়াছ, কখন কোন ক্লেশ ভোগ কর নাই। আমি তোমার স্বামী, আমিও রূপবান এবং যুবক। এখন যদি তোমার মনে হইয়া থাকে, বিষয় বৈভব লইয়া স্বামীসহ কেলিকৌতুকে, আমোদ আহ্লাদে, সুখে স্বচ্ছন্দে ভোগবিলাসে জীবন অতিবাহিত করিব, তাহা হইলে তোমার বড়ই ভুল হইয়াছে। এরূপ মনে করিয়া থাকিলে আমার সহিত তোমার আর সম্বন্ধ থাকিবে না। সংসার অনিত্য, রূপযৌবন ক্ষণভঙ্গুর। সংসারে সুখের আশা কেবল মরীচিকায় জলভ্রম মাত্র। যে ব্যক্তি নিজের কল্যাণ পরিত্যাগ করিয়া সংসারসুখে মগ্ন হয়, সে নিশ্চয় আত্মঘাতী। আমি তোমার পতি সত্য, কিন্তু তোমার আরও একটি পতি আছেন।

এতক্ষণ গৃহিণী আমার কথাগুলি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেছিলেন। "তোমার আর একটি পতি আছেন" এই কথা বলাতে তিনি আমার কথায় বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন,—

গৃহিণী—এতক্ষণ আমায় কত প্রশংসা করিতেছিলেন। এখন আবার কি বলিতেছেন ; আমার আর একটা পতি আছে। আমি কি কুলটা ? এ বিশ্বাস আপনার কি প্রকারে হইল ?

আমি—আমি তোমাকে কুলটা বলি নাই ; তুমি পরম সাধ্বী। তোমার ডাহিন দিকে কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, দেখ।

গৃহিণীর দক্ষিণ পার্শ্বে এক শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি বংশীহস্তে ত্রিভঙ্গীম ঠামে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গৃহিণীকে দেখাইয়া দিলাম।

তৎপর আমরা উভয়ে ঠাকুরের সম্মুখীন হইয়া সসম্ভ্রমে নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সাষ্টাঙ্গ দিলাম।

নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে
প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ দেওয়ার পর আমি এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলাম।

হে কৃষ্ণ! হে বাসুদেব! হে পরমাত্মন্! আপনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর। ভক্তগণকে কেবল কৃপা করিবার জন্য আপনি মায়া মনুষ্যরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

আপনি দীনহীন পতিতগণকে উদ্ধার করেন বলিয়াই আপনার পতিত-পাবন নাম হইয়াছে। আমি কর্ম্মবিপাকে অনাদিকাল হইতে বৃক্ষ, লতা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি নানা যোনীতে ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছি ও পুনঃ পুনঃ গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি এবং ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত হইতেছি, আমার পরিত্রাণের কোন উপায় নাই।

এবার ভাগ্যক্রমে যদিও মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছি কিন্তু জানি না কোন্ দুর্দৈববশতঃ আপনার ভজনা করিতে পারিলাম না। সংসার-মোহেই মুগ্ধ হইয়া রহিলাম। আমার গতি কি হইবে?

যদি আপনি কৃপাকণা বিতরণ করিয়া আমাকে পদাশ্রয় দেন, তবেই রক্ষা, নতুবা আমার আর আশাভরসা কিছুই নাই।

এইরূপ কিছুক্ষণ স্তব করিয়া গৃহিণীকে বলিলাম,

—তোমার আর একটি যে পতির কথা বলিয়াছিলাম, তিনিই ইনি। ইনি যে কেবল তোমার পতি তাহা নহে, ইনি আমারও পতি, ইনি জগতের পতি। আমি যে কেবল পুরুষ তাহা নহি, আমি স্ত্রীও বটি। পতির মনস্তুষ্টি করাই পত্নীর কার্য্য। এস আমরা উভয়ে ইঁহার মনস্তুষ্টি করি। আমরা ক্ষুদ্র জীব। যিনি জগৎ-ব্রাহ্মাণ্ডের অধিশ্বর, যাঁহার প্রতি লোমকূপে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিরাজিত, আমাদের এমন কি আছে, যদ্দারা তাঁহার মনস্তুষ্টি করিব।

এমন সময় দেখিলাম অদূরে পুষ্পপাত্রে ফুল, তুলসী, চন্দনপিঁড়ি, চন্দন কাঠ এবং পঞ্চপাত্রে জল রহিয়াছে।

এইগুলি দেখিয়া আমরা হর্ষান্বিত হইয়া মালা গাঁথিতে বসিলাম। দুইজনে দুই গাছা মালা গাঁথিয়া ঠাকুরের গলায় পরাইয়া দিলাম এবং চন্দন ঘসিয়া সচন্দন ফুলতুলসী ঠাকুরের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া নমো গোপীজনবল্লভায় বলিয়া প্রণাম করিলাম।

অতঃপর গৃহিণীকে বলিলাম,

—এস আমরা ঠাকুরকে গান শুনাই এবং তাঁহার কাছে নৃত্য করি। তুমি পারবে ত?

গৃহিণী—কেন পারব না? খুব পারব। তুমি গান ধর আমি, তোমার সহিত গাহিতেছি।

আমি গান ধরিলাম,

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দরাম শ্রীমধুসূদন॥

আমার সঙ্গে গৃহিণী মধুর কণ্ঠে গান ধরিলেন। আমরা গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলাম।

কিছুক্ষণ নৃত্য করিয়া ভাবিলাম গৃহিণী ত কখনও নাচেন নাই, আমার সঙ্গে কেমন নাচিতেছেন একবার দেখা যাউক।

আমি গৃহিণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, আমি যেমন নাচিতেছি গৃহিণীও তালে তালে ঠিক তেমনি নাচিতেছেন। আমার হাত পা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যখন যেভাবে সঞ্চালিত হইতেছে গৃহিণীর হাত পা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠিক সেই সময়ে সেইভাবে সঞ্চালিত হইতেছে। আমার প্রাণে যেমন আনন্দ, তাঁহার প্রাণেও তেমনি আনন্দ, আমার যেমন উৎসাহ, তাঁহারও তেমনি উৎসাহ।

গৃহিণীর এই অবস্থা দেখিয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইলাম। তৎপর নৃত্যগীতের বিরাম হইলে উভয়ে উভয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মহানন্দে হাসিতে লাগিলাম।

এই নৃত্যগীতে শরীরের মধ্যে একটা উত্তেজনা উপস্থিত হইয়াছিল। এই উত্তেজনাবশতঃ সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। আমি জাগরিত হইয়া উঠিয়া বসিলাম, তখন দেখিলাম উত্তেজনা বশতঃ হৃদপিণ্ডটা জোরে স্পন্দিত হইতেছে।

আমি বিছানায় বসিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া স্বপ্নের বিষয় ভাবিতে

লাগিলাম এবং গুরুকে বলিলাম, ঠাকুর, স্বপ্ন ত বেশ দেখিলাম। জাগ্রত অবস্থায় মনের এরূপ বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা থাকে না কেন? কতদিন আর নরকের মধ্যে পড়িয়া থাকিব! আমার সাধনভজন সমস্ত মিথ্যা, তোমার কৃপাই আমার একমাত্র ভরসা। আমার অন্তরের কালিমা ধৌত করিয়া আমাকে আত্মসাৎ কর। নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কেবল নৈরাশ্যতাই উপস্থিত হয়।

পাঠক মহাশয়গণ, এইবার আমি আপনাদের নিকট হইতে বিদায় লইতেছি। এইখানেই গ্রন্থ শেষ করিলাম। অনেক কথা লিখিবার ছিল, অপ্রিয় সত্য লিখিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। লিখিয়াও কোন ফল নাই। যাহা বাধ্য হইয়া লিখিতে হইয়াছে, তজ্জন্যই আমি দুঃখিত।

আমার কথায় যদি আপনাদের কাহারও মনে কোন ক্লেশ হইয়া থাকে, আমাকে নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। আপনাদের সেবা করাই আমার ধর্ম্ম ও উদ্দেশ্য। আপনাদের অন্তরে ক্লেশ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে। সকলের চিত্ত সমান নহে, সকলের মনস্তুষ্টি করা মানুষের অসাধ্য—এই ভাবিয়া আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রী

১৩২৬। ২৬ কার্ত্তিক

সমাপ্ত